নেহরু বাল পুস্তকালয়

সমুদ্রতীরের গ্রাম

একটি ভারতীয় পরিবারের কাহিনী

অনীতা দেশাই

অনুবাদ
সৈয়দ কওসর জামাল

ছবি
মিকি প্যাটেল

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

লীনা, অদিতি ও রঞ্জিৎ মায়াদাসকে

যাদের থালের বাড়িতে অনেক অবকাশের দিন কাটিয়েছি
এবং পেয়েছি এই কাহিনীর অনেক উপাদান।

এই কাহিনী পুরোপুরি বাস্তবনির্ভর। ভারতের পশ্চিম উপকূলে থাল নামে সত্যিই এক গ্রাম আছে এবং কাহিনীর সব চরিত্রগুলোই এখানে যারা বাস করে তাদের ওপর ভিত্তি করে — নামগুলো শুধু পাল্টে দিয়েছি।

অনীতা দেশাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাক-ভোরে লীলা যখন সমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছল, তখন আর কেউ সেখানে ছিল না। গতরাতের জোয়ারে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আছে তীরের বালি, মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি — শুধু গাঙচিল, বক ও কাদাখোঁচা জাতীয় পাখিরা মাছের খোঁজে জলের ধারে ঘুরে বেড়িয়েছে। হাতের ছোট সাজিটা নিয়ে লীলা নেমে গেল। তাদের বাড়ির চারপাশের বাগান থেকে তুলে আনা অজস্র ফুল তার ওই সাজিতে — লালরঙের জবা, মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো লিলি ও ফিকে হলুদ রঙের কিছু অলকানন্দা ফুল।

জলের কাছে পৌঁছে সে শাড়ির কোঁচাটা ধরে কিছুটা তুলে কোমরের কাছে গুঁজে নিল, তারপর ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। ঢেউগুলো ছুটে এসে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ছিল আর ফেনাগুলো ঘুরছিল তার গোড়ালির চারপাশে। তিনটে শিলাখণ্ড যেখানে একজায়গায় জড়ো করা রয়েছে, লীলা এসে সেখানে দাঁড়াল। একটি শিলাখণ্ডে লাল ও সাদা রঙের গুঁড়ো মাখানো ছিল, এটা পবিত্র শিলা, সমুদ্রে মন্দিরের মত। প্রবল জোয়ারের সময় এটা ডুবে যায়, কিন্তু এখন ভাটার সময় এটাকে নতুন করে পবিত্র করে নেওয়া যায়। লীলা সাজি থেকে ফুল নিয়ে শিলার ওপর ছড়িয়ে দেয়, তারপর হাত জোড় করে মাথা নোয়ায়।

ঠিক তখনই তীর বরাবর সার দিয়ে দাঁড়ানো নারকেল গাছগুলির মাথার ওপর দিয়ে সূর্য উঠল এবং তার আলো বাঁকা হয়ে রুপালি বালির ওপর পড়ে লীলার মাথার পিছন দিক স্পর্শ করলো। আলোর উষ্ণতা ভালো লাগল লীলার। সে আরো কিছুক্ষণ মাথাটা নুইয়ে রাখল, তার পা তখনও শীতল জলস্রোতের ভিতর। গোলাপী আর বেগুনী ঢেউগুলো সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে উঠল। অতি দূর চক্রবালে দেখা গেল মাছধরার নৌকোগুলো, সারারাত সমুদ্রে কাটিয়েছে, এখন তাদের পালগুলো সাদা ডানা বা পাখনার মত জেগে উঠেছে সাগরের বুক থেকে। নৌকোগুলো নোঙর করা, দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, সূর্যাস্তের আগে তারা ফিরে আসবে না তীরে।

বেলা বাড়লে আরো অনেক মেয়ে এই পবিত্র শিলায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসবে। সমুদ্রে জেলেদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে কেউ কেউ কেননা তারা সবাই জেলেদের স্ত্রী ও কন্যা। কেউ লীলার মত এমনি করেই দেবতার উদ্দেশে মাথা নোয়াবে। দিন শুরু করার পক্ষে এটা একটা ভালো ব্যাপার মনে হয় তাদের। অন্য শিলাখণ্ডের বদলে শুধু এই শিলাটিতেই কেন তারা প্রার্থনা করে, তা তারা জানেনা, কিন্তু একটা কিছু তাদের দরকার যেখানে তারা পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারে, লাল আবিরের গুঁড়ো ছড়াতে পারে কিছু প্রার্থনা করার সঙ্গেসঙ্গে। এই শিলাটির সুবিধে হল, এটি বেশ বড়ো কিন্তু মাথার দিকটা চ্যাপটা, জল এখানে কম, ফলে সহজেই এটির কাছে পৌঁছনো যায়। তটের অন্যদিকে গ্রামে একটি মন্দির আছে, কিন্তু তা বেশ দূরে, আর সেখানকার পুজারীকে টাকাও দিতে হয় পুজো দেবার জন্য। মেয়েরা তাই এই শিলাখণ্ডটির ওপর নিজেরাই পুজো দিতে ভালবাসে।

যখন লীলার বাবার নিজের নৌকো ছিল ও তাতে করে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত, তখন তার মা এখানে এসে ফুল ছড়িয়ে প্রার্থনা করে যেত। লীলার বাবা এখন মাছ ধরতে যায় না, দেনার দায়ে তাকে তার নৌকোটা বেচতে হয়েছে। মা-ও এত অসুস্থ ও দুর্বল যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। একমাত্র লীলাই পারে সমুদ্রে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে দিন শুরু করতে। প্রায়ই তার মনে হয়েছে এটাই তার কাছে দিনের সবচেয়ে ভালো সময়, অপার সুখশান্তিময়। তার সাজি থেকে শেষ পাপড়িটা ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়ে সে পিছন ফিরল ও তীরে উঠে এল। নারকেল গাছের সারি এখন রোদে ভেসে যাচ্ছে। এখনই দিনের কাজ শুরু করার সময়।

বেলাভূমির বেগুনী রঙের কলমি ফুলে ছাওয়া বালিয়াড়ি পেরিয়ে নারকেল বীথির ভিতর দিয়ে সাদা রঙের বাংলো বাড়িটা পেরোল সে। বাংলোর দরজা জানালা এখন বন্ধ। এটি বোম্বাইয়ের কোনো ধনীলোকের বাড়ি। কখনো-সখনো তারা এখানে ছুটি কাটাতে আসে। একটুকরো টিনের ওপর লিখে নারকেল গাছের গায়ে লটকে দেওয়া আছে বাড়ির নাম — 'মন রিপোজ'। কথাটার মানে কি? লীলা আজও জানতে পারেনি, নারকেল কুঞ্জের ভিতর দিয়ে, এ-পথে যখনই সে গেছে, তখনই এ-নিয়ে ভেবেছে কিন্তু কিনারা করতে পারেনি।

সকালের নরম রোদ এখনও নারকেল ও তালগাছের পাতার ভিতর দিয়ে চুইয়ে এসে পড়ছে, এর সঙ্গে মিশছে ঝোপের আড়ালে লুকনো কোনো কুটিরে কাঠ পোড়ানোর নীলচে ধোঁয়া। এলোমেলো ঘাসের ওপর তখনও বিন্দু বিন্দু শিশির, আলো পড়ে চকচক করছে মাকড়সার জাল। মাকড়সার জালগুলো ছোট ছোট, কিন্তু খুব ঘন ঘন ছড়িয়ে আছে ঘাসের ওপরে। এদের মাঝখানে রয়েছে একটা করে গর্ত, যা দিয়ে পোকামাকড়কে আটকে ফেলা যায়। বুনোফুলের ঝোপ থেকে উড়ে যাচ্ছে প্রজাপতিরা, এদের মধ্যে যেগুলির গায়ে ডোরাকাটা দাগ আছে, তাদের ডানাগুলি ফিকে নীল রঙে রাঙানো। যেগুলো কালোরঙের, তাদের ডানা লাল।

এছাড়া আছে হালকা হলুদ কিছু প্রজাপতিও। এরা দুটো কি তিনটে করে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর আছে অসংখ্য পাখি — ছায়াঘেরা, ছুঁচলো ঝাউগাছ আর কেতকীর ঘন ঝোপ থেকে উড়ে যাচ্ছে, গান গাইছে, শিস দিচ্ছে, আর এত জোরে চিৎকার করছে যা দিনের অন্য সময় তারা করে না। ঝকমকে ছুরির ফলার মত রোদের কিরণ ভেদ করে উড়ে বেড়াচ্ছে ফিঙের দল, গলায় তাদের বাঁশির সুর। চপল দোয়েলরা শিশিরভেজা ঘাসে লেজ নাচিয়ে লাফাচ্ছে তিড়িংবিড়িং করে, মাকড়সার জালে আটকে পড়ার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে টপাটপ পোকামাকড় ধরছে। গাছের ডালে বসে গান গাইছে একজোড়া ঝুঁটিবাঁধা বুলবুলি। ঝোপের আড়ালে কোথায় যেন

লুকিয়ে বসে গম্ভীর গলায় ডেকে চলেছে কুবো পাখি ঃ কুপ-কুপ-কুপ। অবিরাম বকম বকম করে চলেছে একটা পায়রা। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের মত, তালগাছের পাতায় বাতাসের মর্মরের মত পাখিদের এই কলকাকলিও 'থাল'-গ্রামেরই। এরা যেন লীলাকে বলছে, শান্ত হও, আনন্দে থাক, সকলের কল্যাণ হবে, আবার সবকিছু আগের মত হবে।

ছোট একটা নালা পেরিয়ে লীলাদের বাড়ি যেতে হয়। নালার ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে সেতু বানানো হয়েছে। লীলা যখন সেই গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তাদের কুটিরের দিকে তাকালো, সে বুঝতে পারল কোনকিছুই আর আগের মত নেই, কিছুই ঠিক মত চলছে না। কুটিরের চালাটি কয়েক বছর আগেই নতুন করে তৈরি করা উচিত ছিল — তালগাছের পুরনো পাতাগুলোর খুবই জীর্ণদশা, খুঁটি থেকে সরে গেছে। মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ছে। পাল্লা ছাড়া জানলাগুলো হা হা করছে। নারকেল ও কলাগাছ ঘেরা অন্যান্য কুটিরের মত তাদের কুটিরের উনুন থেকে রান্নার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে না।

লীলার দুই বোন বেলা ও কমল বাড়ির পেছনের নিমগাছের ডাল ভেঙে তা দিয়ে দাঁত মাজছিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে — মুখ ধোওয়া হয়নি এবং স্কুল যাওয়ার পোষাকও পরেনি। লীলা ওদের জিগ্যেস করল, 'তোরা জামা কাপড় পরছিস না কেন? স্কুলে যে দেরি হয়ে যাবে?'- ওরা উত্তর দিল, 'কিন্তু তুমি তো এখনও আমাদের চা তৈরিই করোনি। দেরি তো তুমিই করেছ।'

লীলা দরজার কাছে ফুলের সাজিটা ছুঁড়ে দিয়ে উনুনে আঁচ দিতে গেল। সে জানে সাগরকূলে যাবার আগেই তার এটা করা উচিত ছিল, তা হলে সে জলের পাত্রটা বসিয়ে যেতে পারত, আর এখন ফিরে এসে ফুটন্ত গরম জলটা পেত। কিন্তু তা সে করে যেতে পারেনি। ঘুম থেকে উঠেই তার মনে হয়েছিল এখনই সমুদ্রের ধারে যাওয়া দরকার, সমুদ্র না দেখে, পবিত্র শিলায় পুষ্পাঞ্জলি না দিয়ে রাতের রান্নার বাসন ও উনুনের মরা ছাই সে ছোঁবে না। এখন সে ফিরে এসেছে, তাই এবার কাঠ জোগাড় করবে, উনুনে আগুন দেবে ও সবার জন্যে চা বানাবে। সে ভাবল, বেলা ও কমল নিশ্চয় এটা বুঝবে।

ধোঁয়া ওঠা আগুনের ওপর বসানো পাত্রের জলে একটু চা পাতা ও কিছুটা চিনি ঢেলে দিয়ে নিঃশব্দে চা বানাল লীলা। তারপর তিন বোনে মিলে বসে রইল, ভাই এখন দুধ নিয়ে আসবে। একসময় তাদের একটা মহিষ ছিল, কিন্তু দেনা মেটাতে গিয়ে সেটিকে বিক্রি করতে হয়েছিল। তাই এখন দুধ কিনতে হয়।

দরজার চৌকাঠে বসে ওরা তাকিয়ে ছিল নীচে রাস্তার দিকে, দেখল নারকেল গাছের মধ্যে দিয়ে পথ ধরে হরি এগিয়ে আসছে, তার হাতে পিতলের ছোট একটা দুধের পাত্র। বোনেরা না করলেও হরি এরমধ্যেই মুখ ধুয়ে খাকি প্যান্ট ও জামা পরে নিয়েছে। ছোট বোন দুটি দৌড়ে গিয়ে তার হাত থেকে দুধের জায়গাটা নিয়ে

নিল। কিছুটা দুধ লীলা চায়ের মধ্যে ঢালল, চা এবার তৈরি। একে একে সবার দিকে চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিলে সবাই মিলে চায়ে চুমুক দিল।

'মা আর বাবার চা কি হবে?' হরি জিগ্যেস করে।

'মা-র চা আমি নিয়ে যাচ্ছি', লীলা জবাব দেয়।

'কিন্তু বাবা তো এখনও ঘুমিয়ে আছে', বেলা ও কমল একসঙ্গে বলে ওঠে।

খালি গ্লাসের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করে বসেছিল হরি। লীলা তাড়া লাগাল বোনেদের। তারপর সে গ্রামের স্কুলের অন্যান্য মেয়েদের মত তাদের পরিয়ে দিল তুঁতেনীল রঙের স্কার্ট ও সাদা ব্লাউজ। ওদের ছেঁড়া বইগুলোর দিকে চোখ গেল লীলার, ওই বইগুলো নিয়েই ওরা স্কুলের দিকে রওনা হল। হরি এবার উঠে দাঁড়াল, বলল, বোনদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে সে জমিতে যাবে, মাটি খুঁড়বে ও জল দেবে।

মা-র জন্য চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে লীলা ভেতরে গেল ও চায়ে আরো একটু দুধ মিশিয়ে নিল। তারপর সে দরজার পর্দা সরিয়ে মা-র ঘরে গেল। পুরনো মলিন চাদর পাতা দড়ির বিছানায় মা শুয়ে আছে। তাকেই মনে হচ্ছে দলানো মোচড়ানো কিছু জীর্ণ কাপড়ের মত। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ সে। কেউ জানে না কি হয়েছে তার। ব্যথা নেই, জ্বর নেই কিন্তু দিনে দিনে শুধুই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এখন যে উঠে বসে চা-টুকু খাবে সেই শক্তিও নেই। লীলা তার মাথাটা তুলে ধরে গ্লাস থেকে একটু একটু করে চুমুক দিয়ে চা খেতে সাহায্য করল। কাজটা লীলা করছিল খুব ধীরে, সন্তর্পণে, কেননা মা-র শরীর এত দুর্বল যে ছুঁতেও ভয় করে।

আবছা অন্ধকার ঘরের কোণে মাদুরের ওপর যে শরীরটি পড়েছিল, সেদিক থেকেও লীলা তার মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। শরীরটা নড়ছিল না কিন্তু নিঃশ্বাসের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল, গন্ধও ছড়াচ্ছিল। দূর থেকেও লীলা গ্যাঁজানো তাড়ির গন্ধ পেল — এই গন্ধ সে ছোট্টবেলা থেকে চেনে ও ঘেন্না করে। নাকটা সে কুঁচকে রাখল ওপরের দিকে। তার ইচ্ছে, এবার থেকে বাবা যেন অন্য কোথাও শোয়, মদের গন্ধ ছড়িয়ে মা-র ঘর যেন নোংরা না করে। কিন্তু এ কথা তাকে বলার সাহস কারো নেই, তার মার তো নয়ই।

'মেয়েরা স্কুলে গেছে, লীলা?' মা বলল।

'হ্যাঁ'।

'হরি জমিতে গেছে?'

'হ্যাঁ, গেছে'।

'তাহলে তুমি এবার ঘরটায় ঝাড়ু দিয়ে বাজারে যাও, ফিরে এসে রান্নাটা কোরো।'

'তাই করব মা', লীলা বলল। যদিও তাকে এসব কথা মনে করিয়ে দেওয়ার

দরকার হয় না। অনেকদিন আগেই সে স্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে ঘরে থেকে রান্নাবান্না করা, কাপড় কাচা ও অন্যদের দেখাশোনা করতে পারে।

কাজ শুরু করার জন্য এবার সে উঠে দাঁড়ায়।

সঙ্গে বই নিয়ে বেলা ও কমল গ্রামের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, পেছন পেছন হরি আসছে গাড়ি চালিয়ে ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে।

গ্রামের পথ সরু ও ধুলোয় ভরা। এটা শুরু হয়েছে লম্বা খেজুর গাছগুলো থেকে, শেষ হয়েছে আরো লম্বা সরু সরু সবুজ সুপারিগাছগুলোর কাছে। পথের দুধারের বাড়িগুলো সমুদ্রধারের মত মাটির কুঁড়েঘর নয়, ইঁটের তৈরি বাংলো বাড়ি সব, কাঠের দরজা আছে, আর জানলায় লোহার গ্রীল বসানো। অনেক বাড়ির

বারান্দায় ঝুলছে দোলনা, কোনটিতে বৃদ্ধ লোকেরা বসে সকালের রোদে ঝিমিয়ে নিচ্ছে, মেঝেতে ঘুমোচ্ছে সাদা বিড়াল, আর মেয়েরা সিঁড়িতে বসে চাল বাছছে। উঠোনের গাছে জবাফুল ফুটে আছে, আর নোংরা দেখতে মুরগির ছানারা মাটি আঁচড়াচ্ছে। গ্রামের পোস্টঅফিস এখনো খোলেনি, তবে খুলেছে একমাত্র দোকান যেখানে চাল, গম, চিনি ও কেরোসিন বিক্রি হয়। বেলা ও কমল এই দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়।

'চল, চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে', হরি পেছন থেকে তাড়া দেয়।

'হরিদা, মিষ্টি কিনে দেবে?' ওরা বায়না করে, 'দাও না মিষ্টি কিনে।'

'না, হবে না, আমার কাছে টাকা নেই।'

'ও হরিদা, মাত্র তিনটে মিষ্টি', ওরা অনুনয় করে। 'ঠিক আছে দুটো দাও, না হলে একটা?'

হরি মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দেয়, হবে না। ওরা বোঝে, হরি আজ কিছুতেই মিষ্টি কিনে দেবে না, তাই তারা হতাশ হয়ে হাঁটতে থাকে।

গ্রামের শেষে একটা বড় পুকুর। এখানে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে মহিষগুলো জল খাচ্ছে বা গা ধুচ্ছে। জলে পদ্মফুল ফুটে আছে — লাল পদ্মগুলির পাতা ও ডাঁটি দুই-ই লাল, আর সাদা পদ্মের পাতা ও ডাঁটি সবুজ। বড়, চ্যাটানো, গোল পদ্মপাতার গা-ঘেঁষে ঘুরছে হাঁসেরা। সাদা বক মাছ ধরছে অল্প জলে। অন্যদিকের ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, চওড়া পাথরের ওপর কাপড় আছড়াতে আছড়াতে নিজেদের মধ্যে হাসছে ও কথা বলছে। কোমরের ওপর তারা গুঁজে রেখেছে তাদের গোলাপী কমলা ও কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি। এতে জলে হাঁটার সুবিধে হয়, কাদার ওপরও দাঁড়ানো যায়। বোঝা যায় মেয়েরা তাদের ঘাটের কাজে বেশ আনন্দ পাচ্ছে।

রাস্তায় এবার বেশ ধুলো, তার ওপর গাড়ির চাকার দাগ। অনেক ছেলেমেয়ে দ্রুত স্কুলের দিকে এগোচ্ছে — খাকি প্যান্ট ও সাদা জামা পরে ছেলেরা যাচ্ছে ছেলেদের স্কুলের দিকে, ডানদিকে যেখানে রাস্তাটা পাকা-সড়কে পড়েছে। মেয়েরা পরে আছে তুঁতেনীল রঙের স্কার্ট ও সাদা ব্লাউস — তাদের স্কুল বাঁ দিকে, চূড়োয় একটি মন্দির নিয়ে যে ছোট পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে, তার নীচে। হরি — বয়েজ স্কুলে পড়ত, কিন্তু কিছুদিন হল সে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। তাকে এখন তাদের জমিতে কাজ করতে হয় কেননা তাদের বাবা আর ওমুখো হয় না। কাজেই এখন সে কেবল পাহাড়ের নীচ পর্যন্ত আসে, তারপর বেলা ও কমল খোলা, ধুলোভরা মাঠের মাঝখানে তাদের টিনের ছাদ দেওয়া স্কুলের দিকে বাঁক নিলে হরি ফিরে যায়।

ফেরার জন্য পেছন ফিরতেই চকচকে নতুন টিনের একটা স্তূপ দেখতে পেল হরি, এটা আগে কোনদিন তার চোখে পড়েনি। পাহাড়ের নিচে স্কুল থেকে সামান্য দূরে — টিনের তৈরি চারদিকে চারটি বেড়া, চালা ছাওয়া হয়েছে খড় দিয়ে। স্টিলের পাইপভর্তি একটা হলুদ রঙের লরিও দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

গ্রামে কদাচিৎ নতুন কিছু হয়, তাই নতুন কিছু ঘটলে সবার যেমন আগ্রহ হয়, হরিরও তেমনি হল। একটা নুড়ি তুলে নিয়ে এক হাত থেকে অন্য হাতে দোলাতে দোলাতে সে ওদিকে এগিয়ে গেল। পাশে কুঁড়ে ঘরের দরজা খোলা, উনুন জ্বলছে

আর কিছু পাত্র মাটির মেঝেতে ছড়ানো — কিন্তু কাছেপিঠে কাউকে সে দেখতে পেল না। সে লরিটির দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, সামনের সীটে ড্রাইভার ঘুমিয়ে আছে, আর তার খালি-পা দুটো জানলা দিয়ে বাইরে বের করা, মৃদু নাকডাকার শব্দও শোনা যাচ্ছিল। কে এই স্টিলের পাইপগুলো পাঠাতে পারে আর কেনই বা পাঠিয়েছে, এইসব ভাবতে ভাবতে হরি চেয়ে রইল লরিটির দিকে।

ফিরে আসার পথে গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হল হরির, ধুলোর মধ্যে দিয়ে সে সাইকেল চালিয়ে আসছিল।

'এই রামু, এখানে বাড়ি বানাবে কে রে।' হরি জিগ্যেস করে।

রামু থামল, হরি তার কাছে এলে বলল, 'সে কি, তুই শুনিস নি? গাঁয়ের সবাই তো এ-নিয়েই এখন কথা বলছে।'

'আমি গাঁয়ে যাই না', হরি বলে, 'সবাই তো ওখানে শুধু মদ খায়।' সেখানে তাড়ির দোকানে তার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার যে ভয় আছে হরি তা বলল না। তাছাড়া গাঁয়ের দোকানে গিয়ে খরচ করার মতো পয়সাও তার নেই।

'তুই নিশ্চয়ই শুনেছিস।' রামু বলে, 'সরকার ওখানে বড় বড় কারখানা বানাবে। অনেক কারখানা হবে, কয়েক'শ হতে পারে।'

'ওখানে কারখানা হবে?' হরি টিনগুলো ও চালাঘরটির দিকে আঙুল দেখিয়ে অবজ্ঞা-ভ'রে হাসল।

'আরে না, ওটা তো পাহারাদারের ঘর। প্রথমে একজন পাহারাদার পাঠিয়েছে, এবার জিনিসপত্র পাঠাবে, সে ওগুলো পাহারা দেবে। শীগগীর বুলডজার পাঠাবে, মাটি সরানোর গাড়ি আসবে, স্টিমরোলার আসবে। বড় রাস্তাটাকে দ্বিগুন চওড়া করা হবে, তবেই না মেসিনপত্র সব আনা যাবে। তারপর যারা এখানে কাজ করবে তাদের জন্যে বাড়ি বানানো হবে। শ্রমিকরা সব আসবে, কারখানা বানানো হবে।' ভবিষ্যতে আর কী কী হতে যাচ্ছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে চলে রামু।

হরি বিশ্বাস করতে পারে না এসব কথা। টিনের স্তূপ আর হলুদ রঙের লরি, ঘুমন্ত ড্রাইভার দেখে মনেই হয় না এতসব বিশাল পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। তাই সে রামুর কথায় অবিশ্বাসের সুরে বলে, 'ওই পাহাড় ও পাহাড়টার ওপরের মন্দিরের কী হবে?'

রামু সাইকেলে বসেই তার একটা হাত দিয়ে কেটে ফেলার ভঙ্গি করে। এটা যেন একগোছা ঘাস কাটার মতো ব্যাপার। বলে, 'ওটাকে কেটে ফেলা হবে। সমান করে তার ওপর কারখানা হবে।'

'যাঃ', হরি হাসে। একটা কথাও তার বিশ্বাস হয় না। ওই পাহাড় ও মন্দিরটা থাকবে না তা কী করে হয়। পাহাড়টা ওখানে তার দাদুর আমলেও ছিল, তার সময়েও আছে। রামু নিশ্চয় সব বানিয়ে বলছে। 'দেখা যাবে', সে বলে, 'তা তোর আশ্চর্যের ওই কারখানায় কী জিনিস তৈরি হবে?'

'কারখানা আমার নয়, তবে ওরা আমাকে ওখানে কাজ দেবে। ওখানে কাজ করার জন্যে লোকের দরকার হবে, তাই আমরা কাজ পাবো।' রামুকে খুব উত্তেজিত দেখাল।

কথা বলতে বলতে ওরা গাঁয়ের পুকুরের কাছে এসে পৌঁছল। পথটাও এখানে সমান ও মসৃণ। রামু লাফিয়ে সাইকেলে উঠে পড়ে। যাওয়ার আগে চেঁচিয়ে বলে, 'আমরা কাজ পাব, হরি, আমরা নিশ্চয় কাজ পাব, তুই দেখে নিস।'

সারাটা সকাল হরি তাদের জমিতে কাজ করতে করতে এই নিয়ে ভাবতে থাকল। যখনই সে কোদাল দিয়ে মাটি কাটছিল ও মাটি থেকে পাথরের টুকরো ও আগাছা তুলে ফেলে শীতের সব্জির জন্যে তাদের ছোট জমিটাকে তৈরি করছিল, রামুর কথা তার কানে বাজছিল — 'কাজ, কারখানা, অনেক কাজ, অনেক কারখানা — অনেক কারখানা, কাজ, কারখানা — কারখানা, কাজ ...।' রোদের মধ্যে ঝুঁকে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটু পরেই সে ঘামতে শুরু করল। একসময় একটা ধারালো পাথরের গায়ে লেগে বুড়ো আঙুল কেটে যাওয়ায় খুব কষ্ট পেল। একবার একটা কাঁটাঝোপ কাটবে বলে যেই কাছে গেছে, দেখে একটা সাপ নীচে গড়াচ্ছে — তাকে ফিরে আসতে হয়। তা সত্ত্বেও হরির মাথায় কারখানা ও কাজের কথা ঘোরে — সে কী কোন কাজ পাবে? সেও কি কারখানায় কাজ করে টাকা রোজগার করতে পারবে? হয়ত ও পাবেনা, কেননা স্কুলের পড়া শেষ করেনি। সে লিখতে, পড়তে ও যোগের অঙ্ক করতে পারে, কিন্তু পরীক্ষায় বসেনি, কোন ডিগ্রি নেই তার, কী করে চাকরি হবে তার? কারখানায় কাজ করতে গেলে ডিগ্রি কি থাকতেই হবে? তার হাতদুটো তো বেশ সমর্থ, তা দিয়ে তো সে মেসিন চালাতে ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারবে সহজেই।

ভাবতে ভাবতে হরি নিজের হাতদুটোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকল। এ হাতদুটো শ্রমিকেরই — চওড়া, বাদামী রং, আর বেশ শক্ত। এ কথা সত্যি যে এই হাত দিয়ে মাটি কোপানো, বীজ বোনা, গাছ থেকে নারকেল পাড়া ও সমুদ্রে মাছধরার জাল টানা ছাড়া অন্য কোন কাজ সে করেনি। কিন্তু হাতদুটোকে মেশিন চালানোর কাজ শিখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। — ও নিশ্চয়ই পারবে। পারবে কি? না, অতটা নিশ্চিত সে হতে পারে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন হাতের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাদের বাড়ি থেকে নীচের রাস্তা ধরে লীলা এসে পৌঁছয়। তার এক হাতে একটা জলের জায়গা, অন্য হাতে হরির জন্যে কয়েকখানা শুকনো রুটি কাপড়ে জড়ানো। তার পেছন পেছন এসেছে পিন্টো নামে তাদের সাদা-কালো রঙের ছোট কুকুরটা। হরিকে দেখে পিন্টো দ্রুত তার কাছে যায়, লীলা পেছনে পেছনে আসে। এমনিতেই ক্লান্ত সে, তাছাড়া জমিতে হরির অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার পছন্দ হল না। সে শুধু বলল, 'এই নে, খেয়ে নে।' খাবারটা হাতে ধরিয়ে দিয়েই জল আনতে গেল কুয়োর দিকে।

হরিও লীলার সঙ্গে গেল। লীলা দড়ি-বাঁধা বালতিটা কুয়োর স্থির, সবুজ জলে ফেলে দিল, ভয় পেয়ে দু'একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পালাল, বালতিটা ধীরে ধীরে ভরে উঠল, দড়ির এমাথা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। হরি দড়ি টেনে বালতি তুলতে লীলাকে সাহায্য করল। তারপর কুয়োর পাশে বসেই খেতে শুরু করল। রুটির সঙ্গে খাওয়ার মত তেমন কিছু ছিল না, শুধু একটু নুন আর কয়েকটা কাঁচালঙ্কা। কাঁচালঙ্কাগুলো লীলা তাদের বাড়ির কাছের একটা জমি থেকে তুলে এনেছিল।

কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে লীলা হরির খাওয়া দেখছিল।

হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমরা কী করবো, হরি?'

এ কথার ঠিক কী মানে, হরি তা জানে, কিন্তু কিছু উত্তর দিল না, কথা বলতে তার এখন ইচ্ছে করছিল না। এমনিতেই সে বেশি কথা বলে না, আস্তে আস্তে সতর্ক হয়ে কোন বিষয়ে কিছু বলার আগে ভাবতে থাকে। তাই সে শুকনো রুটি ও লঙ্কা চিবোতে থাকল।

'বাবা এখনো শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সারাদিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় উঠবে, তারপর আবার সোজা চলে যাবে তাড়ির দোকানে।' লীলার গলা কান্নার মতো শোনায়।

'তাই করুক', হরি বলল।

'হরি, ওই বদমাস লোকগুলোর সঙ্গে তাড়ি খেয়ে বাবা যে মরে যাবে?'

'যাক', হরি রুটি চিবোতে চিবোতে বলে।

'আর মা? মার কী হবে?' লীলা কেঁদে ফেলে। 'আর আমরা? আমাদের কী হবে? কে দেখবে আমাদের?'

'ও তো এখনও আমাদের দেখে না', লঙ্কার ডগাটা মুখ থেকে থু করে ফেলে দিয়ে হরি উত্তর দেয়। 'আমরাই তো আমাদের দেখছি, তাই না?'

'কিন্তু কী করে?' লীলা কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'তুই আমি কেউ আর স্কুলে যাই না। বেলা ও কমল এখন গেলেও সামনের বছর আর ওদের নতুন বই কিনে দিতে পারব না। দিনের পর দিন শুধু শুকনো রুটি বা ভাত ছাড়া কিছু জুটছে না, বাজার থেকে কিছু যে কিনে আনবো সে পয়সাও নেই — সামান্য কিছু পয়সা আসে শুধু মালাবারীদের কাছে নারকেল বেচে। তুই যখন মাছ ধরতে যাস তখনই শুধু মাছ খেতে পাই। বাবা কখনো মাছ ধরতে যায় না। তারপর আছে মা — ওষুধ না খেলে কী করে ভালো হয়ে উঠবে মা?'

হরি এবার কাঁধদুটো ঝাঁকায়। এ সব কথা সে জানে, সারাক্ষণ এই নিয়েই ভাবে, তবু লীলা যে কেঁদে কেঁদে এসব কথা তাকে বলছে, এটা তার ভাল লাগেনি। কীই বা করতে পারে সে? মাঠে কাজ করে, গাছ থেকে নারকেল পেড়ে এনে বিক্রি করে, যখনই সময় পায় সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাছ ধরে — আর কী করবে সে? সে জানে — এই সব কাজ যথেষ্ট নয়, কিন্তু এর বেশি করার সাধ্য তো তার নেই।

'আমি কী করব, যা পারি তাই তো আমি করছি', মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে সে।

লীলার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, 'সে তো জানি, কিন্তু আমাদের যে এখন আরো কিছু করা দরকার হরি তাই না?' এবার অনুনয়ের সুর লীলার গলায়।

এ কথায় হরি রুটি চিবোনো বন্ধ করে, বাকিটুকু সরিয়ে রাখে, লীলাকে আশ্বস্ত করার মত কিছু কথা খুঁজতে খুঁজতে সে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। 'কিছু একটা হয়ে যাবে লীলা, ভাবিস না'। অবশেষে সে বলতে পারে, 'গাঁয়ের ছেলেরা বলছিল থালে নাকি কারখানা হবে, সবাই কাজ পাবে সেখানে। আমারও নিশ্চয় একটা কিছু জুটে যাবে।'

'কবে হবে?'

'আমি জানিনা। ঠিক এখন নয়, দেরি আছে অনেক। তার আগে — তার আগে — অবশ্য আমি কাজ খুঁজব। এরপরে ডি সিলভারা যখন বোম্বাই থেকে আসবে, তখন ওদের জিগ্যেস করব ওরা যদি আমাকে ওদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কোন কাজ দেয়।' এই চিন্তাটা হরির মাথায় আগেই এসেছিল, কিন্তু বলেনি। জোরে জোরে বলা কথাগুলো নিজের কানেই তার আশ্চর্য ঠেকলো। অবাক হলো লীলাও।

'বোম্বাইয়ে? তাহলে তো তুই আমাদের ছেড়ে যাবি, হরি?' সে চেঁচিয়ে বলে।

'তা সত্যি। কিন্তু এখানেই যদি থাকতে হয়, তবে মাছধরা নৌকোয় আমাকে কাজ চাইতে হবে। দেখা যাক, কী হয়।'

লীলা মাথা নাড়ে। সে স্বস্তি পায় এই ভেবে যে হরি বড় হচ্ছে, শীগগীর সে কোন কাজ করে টাকা রোজগার করবে। এটা সত্যি যে ও এখনও নেহাৎই ছোট, এমনকি তার চেয়েও এক বছরের ছোট, সে কাজ করে বড়দের মত টাকা রোজগার করবে এটা আশা করেনি লীলা। তাদের বাড়ি ও পরিবারে হঠাৎ করে বা খুব দ্রুত কোন পরিবর্তন আসবেনা। তবে পরিবর্তন একটা আসবেই। এই বিশ্বাস তাকে রাখতেই হবে।

লীলা উঠে দাঁড়ায়। ঝুঁকে পড়ে জলের ভারি কলসিটা তোলার চেষ্টা করে। হরিও ঝুঁকে তাকে সাহায্য করে ওটা মাথায় তুলতে। একটুক্ষণ সামলে নিয়ে লীলা হাঁটতে থাকে তাদের বাড়ির দিকে। পিন্টো সব সময়ের মত এখনও তার অনুগত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যায়।

হরি আর কাজে মন বসাতে পারে না। লীলার সঙ্গে কথা বলার সময় যতটা আশা নিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভেবেছিল, ততটা এখন ভাবতে পারে না। তার মনে সংশয় জাগে, সত্যিই কি সে কিছু করে উঠতে পারবে? শুকনো, পাথুরে জমিটার দিকে তাকায়, এখানেই তাকে সব্জির চাষ করতে হবে। জমিটা সাফ করে, মাটি কুপিয়ে বেগুন আর মটর লাগালে কেমন হয়? সব্জি যেটুকু হবে তা তো একসময় খাওয়া হয়ে যাবে। তারপর আর কিছু থাকবে না। কেবল সব্জিতে কুলোবে না।

সমুদ্রের দিকে হাঁটল সে। শান্ত ভারী জলের ওপর ভরদুপুরের রোদ চকচক করছে। জোয়ার চলে গেছে। দূরে দিকচক্রবালে সার বেঁধে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

মাছধরার নৌকাগুলো, মনে হয় ওখানেই যেন পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে, তার ওপারে আর যাওয়ার যেন উপায় নেই। এখন বাতাস নেই, নৌকোর পালগুলো ঢিলে হয়ে ঝুলে আছে। অনেক ওপরে, নীল আকাশের গম্বুজ ছুঁয়ে, গাঙচিলেরা ঘুরপাক খাচ্ছে, অনেক উঁচু আর বহু দূর থেকে দেখছে সমুদ্রের ঢেউ আর পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রাণীদের। মাঝে মাঝেই তারা তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করছে। এদিকের বটগাছের ডালে বসে ঘুঘু ডাকছে 'ঘু' 'ঘু' শব্দ করে, গাঙচিলের কান্নায় যেন সান্ত্বনা জোগাচ্ছে।

ঝাউগাছের ঝোপের নীচে হরি গিয়ে বসল। এই জায়গাটা সব সময়েই ছায়াছায়া, পুরনো ঝুপড়ি গাছের ছুঁচলো ধূসর মোলায়েম পাতার মধ্য দিয়ে মৃদু বাতাস বইলেও মর্মর ধ্বনি শোনা যায়। সারা সমুদ্রতীরে এই জায়গাটাই সবচেয়ে শীতল, ছায়াঘন। দুপুরবেলা হরি একা নয়, অনেকেই এখানে এসে বসে। একরাশ ঝাউপাতার ওপর মাথা রেখে একজন বুড়ো লোক ঘুমোচ্ছে, তার মাথার ফেট্টিটা চোখের ওপর রাখা। হরিদের জমির পাশেই বুড়োটির নারকেল বাগান। লোকটি বদমেজাজী আর মদ্যপ। হরি সতর্ক হলো যাতে লোকটি জেগে না যায়।

মাথার পিছনে হাতদুটো রেখে সে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিল, সমুদ্রের দিক থেকে আসা চোখ ধাঁধানো আলো ঠেকাতে চোখদুটো অর্ধেক মুদে রাখল। সাদা গনগনে আকাশে উড়তে উড়তে একটা চিল হঠাৎ নীচে নেমে এসে তীর থেকে কিছু একটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আবার ওপরে উঠে যায়। তার ঠোঁটে কী ঝুলছে দেখার জন্য হরি চোখ খোলে। ওই চিলটাকে অন্য একজোড়া চিল ধাওয়া করে, ফলে ঠোঁট থেকে তার শিকার পড়ে যায়। হরি দেখল, ওটা একটা মরা সাপ।

কাছে গিয়ে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াতেই সেখানে সাইকেল চালিয়ে রামু এসে হাজির হয়। ওর সঙ্গে দুটো অন্য ছেলে — ওরাও স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, যদিও ওদের স্কুল ছাড়ার কারণ হরির মত নয়। সে স্কুলের ফি দিতে পারেনি, বইপত্রও কিনতে পারেনি। কিন্তু ওদের সে সমস্যা ছিল না, কেননা ওদের নিজেদের মাছধরা নৌকো আছে। ওদের বাবারা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে ফড়েদের কাছে বিক্রি করে, যারা ওই মাছ লরি করে বোম্বাই নিয়ে যায়। আসলে ওদের স্কুল আর ভাল লাগছিল না, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কখন ওদের টাকা হবে ও ভালোভাবে সময় কাটাবে। মাছধরার কাজে সহায়তা করার মত বয়স হয়েছে তাদের, কিন্তু তা ওদের পছন্দ নয়, — ওদের ধারণা, মাছধরার পেশা শুধুমাত্র লেখাপড়া না জানা মানুষদের জন্যে।

হরি, রামু, ভোলা, ও মহেশ একসঙ্গে সমুদ্রতীরে খেলেছে, কুকুর সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পাখি শিকার করেছে, গাছে উঠে নারকেল পেড়েছে এবং কোন উৎসবের রাতে গ্রামে কখনো যাত্রা-থিয়েটার হলে একসঙ্গে দেখতে গেছে। এখন আর বীচে খেলা করার বয়স তাদের নেই, তাই তারা ঝাউ গাছের নীচে এমনি বসে থাকে, শুয়ে থাকে, আর গল্প করে।

কী নিয়ে ওরা কথা বলে?

'আমরা চাকরি পাব, তখন আমাদের অনেক টাকা হবে।'

'আমরা চাকরি পাব কী করে?' হঠাৎ উঠে বসে হরি জিগ্যেস করে। তার হাতে মুঠোভর্তি বালি। 'দেখিস, ওরা কারখানাতে কাজ করার জন্য শহর থেকে লোক আনবে।'

'না, তা করবেনা', বাকি তিনজন একসঙ্গে প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে। সবাই চুপচাপ রইল কিছুক্ষণ। তারপর একজন বলল, 'কী করে লোক আনবে শহর থেকে? শহরের লোক গ্রামে বাস করতে আসবে না। আর থাকবেই বা কোথায়? ওদের থাকার মত বাড়ি নেই, দোকানপাট নেই, সিনেমা নেই। ওরা এখানে আসতে চাইবে না। আমরা এখানে থাকি, আমরাই কাজ করব কারখানায়।'

'আমরা তো কারখানার কাজ জানি না', হরি বলে।

'জানিনা বলে যেন শিখতেও পারব না।'

'যে-কেউ শিখতে পারে।'

'মেশিনে যে কেউ কাজ করতে পারে। ওরা আমাদের দেখিয়ে দেবে, তারপর থেকে আমরাই করব।'

হরি এবার প্রতিবাদ করে, 'আমরা তো মেশিন সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা শুধু জানি মাছ ধরতে ও নারকেল গাছ লাগাতে।'

'আমরা শিখব।' অন্যরা বেশ চেঁচিয়ে বলল।

'কী করে শিখব? আমরা স্কুলের পড়াটাও শেষ করিনি, আমরা তো জানিনা কিছুই।' চোখে মুখে প্রচণ্ড হতাশা দেখা দেয় হরির। 'এসব শিখতে গেলে কলেজে যেতে হবে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে।'

'কলেজ?' বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে ওরা বলে, 'স্কুলকলেজে কোনও শিক্ষাই হয় না। বই পড়ে মেশিন চালানো শেখা যায় না। আমরা কারখানাতে শিখব।'

'কিসের কারখানা রে ওগুলো? কী তৈরি হবে?' হরি চেষ্টা করে ওদের মত আশাবাদী হতে, যাতে তার দুশ্চিন্তা আর ভয় কেটে যায়।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না।

'হয়তো — আমার মনে হয় — সাইকেল।'

'কে যেন বলছিল মোটর গাড়ি?'

'তাহলে দ্যাখ, তোরাই জানিস না', হরি রাগত স্বরে বলে, 'তোরা কিছুই জানিস না।'

রামু ওর দিকে একটা নারকেলের খোলা ছোঁড়ে। হরি লুফে নেয়, তারপর আবার ছুঁড়ে দেয় রামুর দিকে। ওটা গিয়ে রামুর হাঁটুতে লাগে, ও চেঁচিয়ে ওঠে। যে লোকটি ঘুমোচ্ছিল তার ঘুম ভেঙে যায়, চিৎকার করতে শুরু করে। রামু দৌড়ে

পালায়, পেছন পেছন হরি ছোটে কিছুক্ষণ, তারপর দাঁড়ায় — এত রোদে দৌড়ানো যায় না। সে আস্তে আস্তে একাই বেলাভূমির দিকে যায়।

বেলা ও কমলকে সৈকতের দিকে যেতে সে আগেই দেখেছিল। ওরা স্কুল থেকে ফেরার পর হাতে একটা পিতলের বাটি আর একটা ছোট কাটারি নিয়ে যাচ্ছিল। হরি জানে ওরা পাথরের গা থেকে শামুক গুগলি খুঁচিয়ে বের করবে। লীলা নিশ্চয় পাঠিয়েছে ওদের — আজ গুগলি দিয়ে রাতের খাবার হবে। হরি ওদের সঙ্গে যাবে না, কারণ ইতিমধ্যেই অনেক মেয়ে গুগলি ধরার কাজে লেগে গেছে। ওটা মেয়েদেরই কাজ। হরি ফিরতে থাকে, ও এখন জাল নিয়ে এসে মাছ ধরবে।

বেলা ও কমলের পরনে তখনও স্কুলের জামা, ওরা কাটারি দিয়ে শক্ত গোঁড়ি খুঁড়ে ছোট ছোট গুগলি বের করছিল আর সেগুলোকে পেতলের বাটিটার ভেতর ঢুকিয়ে রাখছিল। ওদের স্কুলের অনেক মেয়েই আশেপাশে একইভাবে গুগলি ধরছিল। মা ও ঠাকুরমার বয়সী মহিলারাও ছিল। কেউ কেউ ঝুড়ির মধ্যে তালপাতার শিরগুলোকে রেখে বালিতে ঢেকে রাখছিল — সমুদ্রের জল ওদের ঢেকে রাখবে বালির নীচে, অনেকদিন পর বালি খুঁড়ে ওগুলো যখন তোলা হবে তখন বেশ নরম হয়ে গেছে, আর তখন ওগুলো দিয়ে দড়ি বানানো হবে। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা হওয়ায় রোদে কাজ করতে ভালো লাগছিল। দেখে মনে হয় ওরা যেন শঙ্খচিল, ক্রৌঞ্চ এবং বকের মত অল্পজলে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরছে। তবে পাখিরা নীরবে মাছ ধরে আর ওরা অনবরত কথা বলছে, গালগল্প করছে।

'ওই দ্যাখ, হেমা যাচ্ছে ওর মার সঙ্গে।' বেলা আঙুল দেখিয়ে বলে। মা-মেয়ে দুজনেরই পরনে রংচঙে পোশাক - মা পরেছে বেগুনী গোলাপী ও কমলা রঙের ফুল আঁকা একটা শাড়ি, আর মেয়ের পোশাক বেগুনী রঙের, নীচেটা রুপোলি।

প্রায় সব মেয়েরাই ঘুরে দেখে ও চাপা হাসি হাসে।

'মাছ কিনতে আলিবাগ যাচ্ছে।'

'নিজের হাতে মাছ ধরতে শরম লাগে বুঝি?' আর একজন ফোড়ন কাটে।

'না না, ওরা মাছ কিনবে কি? বিজুকে চেনো তো?— বিজু যখন মাছ ধরে ফিরে আসে, ওর নৌকোয় টনটন মাছ থাকে — চিংড়ি, পমফ্রেট, সুরমাই, আরো কত মাছ। ওদের মাছ কিনতে হয় না।'

'ঠিক বলেছিস, ওরা এত মাছ ধরে যে বিক্রি করে দেয়।'

'বোম্বাইয়ে বিক্রি করে, ওখানে জানিস তো থাল বা আলিবাগে যে দাম ওঠে, তার ডবল দাম পাওয়া যায়।'

'ডবল কি বলছিস? তিনগুন দাম হয়।'

'এই জন্যেই তো ওরা এত সোনার চুড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়।'

কিছুক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলে না। শুধু পাথরের গায়ে গোঁড়িতে কাটারি চালানোর শব্দ শোনা যায়, আর মেয়েদের হাতে কাঁচের চুড়ির আওয়াজ। থালের

মেয়েরা চুড়ি পরতে খুব ভালবাসে। সোনা-রুপোর চুড়ি অবশ্য বিশেষ কেউ পরে না, বেশির ভাগই পরে কাঁচের চুড়ি, অনেকগুলো করে — কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত। বেলা ও কমলের এক একজনের ছ'টা বা আটটার বেশি চুড়ি নেই, এগুলো তারা কিনেছিল গত দেওয়ালির মেলায়। কাঁচের চুড়ি দামে সস্তা, কিন্তু বেশিদিন টেকেনা, দেখতে ভালো হলে কি হবে, সহজেই ভেঙে যায়।

ঠাকুরমার বয়সী বৃদ্ধা কালীবালা, মাথার সব চুল পাকা, একটা পাথরের ওপর বসেছিল। একসময় বলল, 'শুনেছিস তোরা, বিজু আরো একটা নৌকো বানাচ্ছে?'

'আরো একটা? এতগুলো নৌকো আছে বিজুর, তবু আরো একটা?' প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে।

'এটা খুব বড় হবে আর চলবেও সবচেয়ে জোরে। আমার মরদ সেদিন বলছিল, বিজু ওকে নিজে বলেছে — এই নৌকোয় ইঞ্জিন থাকবে, যে কোন সময় সমুদ্রে যেতে পারবে, যাবেও অনেকদূর, একেবারে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট অব্দি। যত দূরে যাবে মাছও তত বেশি পাবে, এদিকে তো আর তেমন মাছ নেই!'

'ঠিক বলেছ, এদিকে মাছ একদম কমে গেছে।' সবাই সায় দিয়ে বলে।

'যাই বলো, আমাদের মরদরা তো এখান থেকেই মাছ ধরছে?' একজন স্ত্রীলোক বলে।

'ধরছে কিন্তু খুব বেশি কি? ঘরে তো অল্প মাছই আসে।'

বেলা ও কমল চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, 'তোমাদের স্বামীরা তো তাও কিছু মাছ ঘরে নিয়ে আসে কিন্তু আমাদের বাবা তো মাছ ধরতেই যায় না। হরি মাছ ধরার চেষ্টা করে জাল দিয়ে, মাছ পায় না বললেই চলে।' মনে মনে বললেও এসব কথা মুখে উচ্চারণ করে না, কিছুই বলে না ওরা। পাথরের ওপর নীচু হয়ে বসে নিজেদের কাজ করে চলে। গুগলির ছোট ছোট মুখ খুলে শামুক বের করে পিতলের পাত্রে রাখে।

বিকেল বেলার নিস্তব্ধ সমুদ্রতীর। জোয়ারের উচ্ছ্বাস চলে গেছে, বাতাস বইছে মৃদু। এর মধ্যে সবাই শুনতে পায় একটা ফিসফাস কিংবা দীর্ঘশ্বাসের মত ধ্বনি, সমুদ্র যেন নিজেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। তারপর সেই দীর্ঘনিশ্বাস আস্তে আস্তে তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। অনেক দূরের সমুদ্রে এই ধ্বনি সৃষ্টি হয়েছে — নিস্তরঙ্গ জলের ওপর সাদা রেখা ছড়িয়ে লাফিয়ে উঠছে তরঙ্গ, তারপর সেই তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে তীরের দিকে, পাথরের গায়ে লেগে লাফিয়ে ওঠে ফণার আকারে। জোয়ার আসছে, এখনই এসে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে বইছে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ মধুর ঠাণ্ডা বাতাস। জোয়ার ও বাতাস একসঙ্গে ধেয়ে আসছে দেখে মেয়েরা কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'বাড়ি যাওয়ার সময় হল, চল সব। গিয়ে আবার রাতের রান্না করতে হবে,' কেউ বলল। সবাই তাদের নিজের নিজের জিনিসপত্র সঙ্গে করে

দুজন তিনজন করে তীরে ওঠে। কেউ কেউ তখনও গল্প করতে থাকে, হাসে। আর কেউবা নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে।

মাছধরা জাল নিয়ে তীরে নামার সময় হরি ওদের চলে যেতে দেখল। গ্রামের একমাত্র ছেলে সে যার নৌকো নেই, মাছধরার নৌকোয় কাজও করে না, তাই সে মেয়েদের মুখোমুখি হতে চাইল না। তাছাড়া সে জানে তীরে তেমন মাছ ধরার আশাও তার নেই।

তবে তার ভাল লাগে। জালটাকে ফেনার মধ্যে নীচু করে ধরে ও হাঁটতে থাকল — বাদামি রঙের ঢেউগুলো তার জালের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একসময় ও জালটাকে টেনে তীরে তোলে। যা উঠেছে জালে তা ছোট ছোট কিছু মাছ, ওগুলো ধরার মানেই হয় না — তিনচারটে কাঁকড়াও উঠেছিল, কিন্তু এগুলোও এত ছোট যে গায়ে কোন মাংসই নেই। হরি দেখছিল ওগুলো চিৎ হয়ে পড়ে পা ছুঁড়ছে। একটা বড় কালো কাক লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল। কাঁকড়াগুলোকে সোজা করে দিতে ওরা হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের নিরাপত্তায় ফিরে যাচ্ছে — হরি দেখে বেশ মজা পেল। কিন্তু অচিরেই কাকটা গিয়ে ঠোঁট দিয়ে ওগুলোকে আবার উল্টে দেয়। হরি কিচ্ছু করে না। সে খালি জালটা নিয়ে হাঁটতে থাকে।

দলবেঁধে যে নৌকোগুলো করে জেলেরা মাছ ধরতে গিয়েছিল সমুদ্রে, সেগুলো ফিরে আসছে। একটা নৌকো তো তীরের কাছাকাছি এসে গেছে, চিৎকার করলে শোনা যাবে। একজন জেলে জোরে চিৎকার করা মাত্র খাঁড়ির ধারের গ্রাম থেকে মেয়েরা দল বেঁধে ছুটে এল। প্রত্যেকের হাতে ঝুড়ি। কেউ কেউ নৌকো তীরে

পৌঁছনো পযন্ত আর অপেক্ষা করতে পারল না, সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে — শাড়ি কোমর অব্দি উঠে গেলেও তারা নৌকোর দিকে এগোয়। জেলেরা মাছের বড় বড় ঝুড়ি এগিয়ে দেয় তাদের দিকে, ওগুলোকে মাথায় বসিয়ে নিয়ে তারা তীরে ফিরে আসে। তাদের পেছন পেছন দু'তিনজন জেলেও আসে। জোয়ারের জল বেড়ে আরো উঁচু না হলে তাদের নৌকো খাঁড়ির মধ্যে ঢুকবে না।

উপকূলে এতক্ষণ যে শান্তি ও স্তব্ধতা ছিল, সরব কোলাহলে তা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। জেলেরা ঝুড়িশুদ্ধ মাছ দাম হেঁকে বিক্রি করতে লাগল। মেয়েরা ঝুড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, কেউ কেউ মাছ বালির ওপর ঢেলে দিচ্ছে। তাতে ছিল গোলাপী রঙের গাদাগাদা চিংড়ি, তখনও ছটফট করে নড়ছে, আর ছিল সাপের মত 'বোম্বাই ডাক', চ্যাপ্টা ও চকচকে দেখতে ছোট ছোট পমফ্রেটগুলো সমুদ্রে থাকলে বড় হত আরো। উঠেছিল কিছু নীল কালো রঙের 'সুরমাই', এগুলো দারুণ খেতে, আর ছিল কিছু বেশ বড় আকারের কালো কাঁকড়া। দামাদামির সময় মেয়েগুলো ঝুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল আর সমানে চলছিল চিৎকার চেঁচামেঁচি।

বড় বড় পমফ্রেট আর তাজা চিংড়ি মাছের একটা ঝুড়ি দেখে এক স্ত্রীলোক দর হাঁকে, 'পঞ্চাশ টাকা'। সে জানে, পমফ্রেটগুলো এক একটা দশ টাকা দামে বোম্বাইয়ে বিক্রি হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন বলে ওঠে, 'ষাট টাকা'। 'সত্তর টাকা', চেঁচায় তৃতীয় একজন, বেগুনী রঙের শাড়ি পরা বেশ মোটা মহিলা। অন্যরা ইতস্তত করতেই সে কোমরের গাঁট থেকে অনেকগুলো ময়লা নোট বের করে তা থেকে দাম মিটিয়ে দেয়। দাম পেয়ে জেলের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকটি নীচু হয়ে তার ঝুড়িটা ওঠায়, অন্যরা তখন অন্য মাছের ঝুড়ি নিয়ে দরাদরি শুরু করেছে।

স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে ডাকতেই একটা টাঙ্গা ঘড়ঘড় শব্দ করে জলের ধার পর্যন্ত চলে আসে। বাদামী রঙের ঘোটকী তীরবেগে ছুটছে, ভিজে বালির ওপর পাক খাচ্ছে বড় বড় চাকা, টাঙ্গাওয়ালা চাবুক তোলে, শনশন করে ঘোরায় বাতাসে, ফেনার ওপর দিয়ে টাঙ্গা এসে দাঁড়ায় মেয়ের দল আর তাদের ঝুড়িগুলো ঘেঁষে।

আবার শুরু হয় দরাদরি।

যে মেয়েটি এক ঝোলাভর্তি চিংড়ি কিনেছে, সে বলে, 'বড় রাস্তার বাসস্টপ পর্যন্ত দু টাকা দেব।'

'তিন টাকা।'

'পাঁচ টাকা।'

মোটা মহিলাটি পুনরায় তার টাকার জোরে ছ'টাকা হেঁকে টাঙ্গাওয়ালার সম্মতির অপেক্ষা না করেই মাছের ঝুড়ি নিয়ে উঠে বসে। টাঙ্গা ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করল, ঘোটকী টলমল করে, টাঙ্গাওয়ালা তার হাতের চাবুক ঘোরায়, টাঙ্গা চলতে

শুরু করে হাইওয়ের দিকে। মেয়েটি ওখানে গিয়ে ওই মাছ বিক্রি করবে লরিওয়ালাদের কাছে, যারা গ্রাম থেকে মাছ কেনার জন্য বড়রাস্তার ওপর অপেক্ষা করে। তা না হলে সে বাস ধরে যাবে আলিবাগের বাজারে, সেখানে নিজেই বিক্রি করবে।

বাকি মাছ যা পড়েছিল অন্য মেয়েরা সেগুলোই কেনে। এতক্ষণ দেখার পর হরি ফিরে যায় — আর কিছুই দেখার নেই। তার ইচ্ছে করছিল বাড়ির জন্যে কিছু মাছ সে কেনে। কিংবা তারচেয়ে ভাল হতো সে যদি একটা মাছ অন্তত ধরতো। কিন্তু কোন মাছই তার জালে ধরা পড়েনি। জালটাও টানতে টানতে নিয়ে চলে। সূর্য ডুবেছে তখন, গোধূলির বেগুনী আলোয়, সে আপনমনে শিস দিতে দিতে চলতে থাকে।

সকালে লীলা যে শিলায় ফুল ছড়িয়েছিল, এখন তার দিকে ধেয়ে আসছে ঢেউয়ের ফেনা। শীগগির ধুয়ে যাবে শিলার গা থেকে লাল ও সাদা রঙের দাগ, দু একটি ফুলের পাপড়ি যা লেগে আছে তাও থাকবে না। সকালে আবার কেউ-না-কেউ আসবে, ছড়িয়ে দেবে আরো কিছু ফুল।

সমুদ্রতীরের ওপরে যেখানে ওদের বাড়ি থেকে রাস্তাটা এসে মিশেছে, সেখানটা ঘাসে ঢাকা। ওখানে তখনও বেলা ও কমল স্কীপিং করছিল ও খেলছিল। বেলা একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কমলকে ধরার চেষ্টা করছে আর কমল নুড়ি দিয়ে দাগ দেওয়া চারকোনা জায়গার মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। বেলা বোনের জামাটা ধরে ফেলার জন্যে লাফ মারতেই কমল পাশে সরে যায় আর বেলা হাঁটুতে ভর দিয়ে পড়ে যায়।

'চেঁচাস না', হরি কাছে এসে বলে, 'কিছুই হয়নি তোর।'

বেলা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটু ঝাড়তে ঝাড়তে উত্তর দেয়, 'আমি চেঁচাতে গেলাম কখন?'

'দ্যাখ তো জামাটাকে কি নোংরা করেছিস!' হরি বলে।

'লীলা ধুয়ে দেবে।'

'হুঁ, সব তো লীলাই করবে।'

'তুমি মাছ ধরতে পেরেছ?' বেলা অন্য দিকে কথা ঘোরায়।

জালে যে মাছ নেই তা দেখাই যাচ্ছিল। 'তোরা তো কিছু গুগলি তুলে এনেছিস, তাই না?' হরি বলে।

এইসময় পিন্টো ছুটতে ছুটতে এল। যেন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে দেখে ও ডাকতে এসেছে। নারকেল গাছের ছায়া সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই। তবে সূর্যের কমলা ও গোলাপী রঙের ছটা তখনও মিলিয়ে যায়নি বরং আরো গাঢ় ও স্পষ্ট হয়েছে। আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখা যাচ্ছে, চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল শুকতারা জ্বলজ্বল করছে, নীল কালো আকাশে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে দুধসাদা থালা। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, চাঁদ ও তারা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'পিন্টো। পিন্টো।' ডাকতে ডাকতে কমল পিন্টোর দিকে দৌড়ে যায়।

পিন্টোর নাম দেওয়া হয়েছিল যে লোকটির কাছ থেকে কুকুরছানাটিকে পাওয়া গিয়েছিল তার নাম অনুসারে । লোকটি তাদের গ্রামে 'ব্যবসা' করতে এসেছিল। অবশ্যই কেউই জানতো না কি ব্যবসা করত সে। রেশন দোকানের পিছনে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকত, সঙ্গে থাকত একটা কুকুর। নিজেই রান্না করত, গ্রামে ঘুরে বেড়াত, লোকজনের সঙ্গে কথা বলত। তাড়ির দোকানে বেশ কিছু লোকের সঙ্গে তার দোস্তিও হয়েছিল। একবার ওদের বাবাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, সে ওকে গোয়ায় নিয়ে গিয়ে জাহাজের কাজ জুটিয়ে দেবে। বাবা ভেবেও ছিল গোয়া যাবে, তাছাড়া গোয়ায় দেশী মদও খুব ভালো। গোয়া যাবার জন্যে লোকটিকে বাসভাড়া হিসেবে

পঞ্চাশটা টাকাও দিয়েছিল। তারপর যেদিন গ্রামের আরো সব লোকের সঙ্গে রওনা হবে, তার আগের দিন দেখা গেল লোকটি উধাও। ওদের বাবা বিশ্বাস করতে পারছিল না পিন্টো চলে গেছে। মনখারাপ করে সারাদিন সে তাড়ির দোকানে বসে কাটিয়েছে। স্কুল থেকে ফেরার সময় পরিত্যক্ত কুটিরের কাছে কমল কুকুরের চিৎকার ও তার বাচ্চাগুলোর কান্না শুনতে পায়। সে গিয়ে সবচেয়ে ছোট ও দুর্বল বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে আসে বাড়িতে। বাবার পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে একমাত্র এটাই পেয়েছিল তারা। পরে তারা জানতে পেরেছিল বাবার মত আরো অনেক লোককে ঠকিয়েছিল পিন্টো নামে লোকটি।

অবশ্য এই কারণে কুকুরটি ও তার বাচ্চাদের ওপর কোন রাগ হয়নি কারো। পিন্টো ছিল খুব ছোট, গায়ে ধূসর ও সাদা রঙের লোম, কিন্তু তাকে সিংহের মতো সাহসী মনে হত। কমল তাকে নিয়ে এসেছিল বলে ওকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অনুগত ছিল লীলার, কারণ লীলা সারাদিন ওর সঙ্গে বাড়িতে থাকত, ওকে ছেড়ে যেত না। ওকে ছুঁতো না কেবল হরি, এমন ভাবে তাকাত ওর দিকে যেন সব দোষ ওরই। যখনই পিন্টোকে দেখত, মনে পড়ত তার বাবার বোকামির কথা। অবশ্য তার বাবাই তো একমাত্র বোকা বনেনি। গ্রামের আরো অনেকেই ঠকেছিল। আসলে এরকম তো আগেও ঘটেছে — শহর থেকে শঠ লোকেরা এসে গ্রামের অজ্ঞ লোকেদের ঠকিয়েছে। এটা ভাবলেই হরি রেগে ওঠে। খুব চালাক হয়তো সে নয়, কিন্তু কোনদিন ওইভাবে বোকা বনবে না।

দু'বোন ও কুকুরটির পিছন পিছন আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে হরি। একসময় 'মন রিপোজ' নামে ভুতুড়ে বাড়িটার সাদা দেওয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে নিজেদের ঘরের সামনে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে আলো জ্বলছে, আর লীলা তাদের রাতের খাবার তৈরি করছে।

খাবার বলতে লঙ্কা ও গুগলি দিয়ে তৈরী একটা তরকারি, আর সঙ্গে মোটা চালের ভাত। গুগলি তো মেয়েরা সমুদ্রের ধার থেকে জোগাড় করেছে, আর সস্তা চাল কেনা হয়েছিল গাঁয়ের দোকান থেকে।

থালায় করে খাবার নিয়ে গিয়ে লীলা মাকে ঘরে দিয়ে আসে, তারপর রান্নাঘরের মেঝেয় ভাইবোনদের সঙ্গে বসে নিজে খায়। পিন্টো বসে থাকে উচ্ছিষ্টের আশায়।

'বাবা কোথায়?' হরি নীচু গলায় জিগ্যেস করে, 'বাইরে গেছে?'

লীলা মাথা নেড়ে সায় দেয়। বাবা যে বাইরে গেছে এতে তারা যেমন স্বস্তি পেল তেমনি মনখারাপও হল এই ভেবে যে গাঁয়ের অন্যসব মাতালদের সঙ্গে বাবাও আজ সারারাত মদ খেয়ে তাড়ির দোকানেই কাটাবে।

অনেক রাতে, লীলা ও হরি তখনও ঘুমোয়নি, শুনতে পেল ওরা বাড়ি ফিরছে — বাবা ও প্রতিবেশী তিনভাই, এরা সবাই একসঙ্গে রোজ রাতে মদ খায়। চাঁদ

এখন আকাশে নেই, তাই বাইরে গাঢ় অন্ধকার। তারার আলো নীচে পড়ছিল, কিন্তু সে আলো ঘনবুনোট নারকেল বন ভেদ করে এসে পৌঁছবে না তাদের কুটিরে। লোকগুলো হাতে লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়েছিল গ্রাম থেকে। কিন্তু গাছের গুঁড়িতে, একে অপরের গায়ে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে ভেঙে ফেলেছে। টুকরো টুকরো হয়ে লণ্ঠনের কাচ ভেঙে যেতে দেখে ওরা হেসেছে। নতুন লণ্ঠনের দাম, আরো তেলের চিন্তা এবং ভাঙা লণ্ঠনের শোক করবে ওদের বৌরা। এখন ওরা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাড়ি ফিরছে। নিজেদের চাঙ্গা রাখতে একে অন্যের নাম ধরে ডাকছে, গান গাওয়ার চেষ্টা করছে।

ওরা এত চিৎকার করতে করতে আসছিল যে খালের সমস্ত রাস্তার কুকুররা একযোগে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে প্রতিবাদ করতে লাগল।

লীলা ও হরি জানে, বাবাও ওদের সঙ্গে আছে। তাই তারা ওই শব্দ শুনবে না বলে বালিশে মাথা ঢাকল। চিৎকারকে লীলার এত ভয় ও ঘৃণা যে তার কান্না এসে গেল। হরির কান্না পায়নি তবে সে নিজের ঠোঁট কামড়াল এবং ভাবল, সাপের কামড়ে যেন এখনই তার বাবার মৃত্যু হয়। চারদিকে এত সাপ, তার ওপর অন্ধকার, হয়তো এখুনি একটা বিষধরের গায়ে পা লাগতেই ছোবল মারবে। ভয় পেয়ে সে একথা ভাবেনি, ভেবেছে আশায়, যেন এইরকম একটা ঘটনা ঘটুক তাই সে চায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনের দরজায় ধাক্কার শব্দ। পাল্লাদুটো খুলে যায় হাট হয়ে, দেয়াল কেঁপে ওঠে, যেন তালপাতায় ছাওয়া গোটা বাড়িটাই ভেঙে পড়বে। পিন্টো উঠে পড়েছিল, সেও আর্তস্বরে ডেকে ওঠে। বাবা কোনওরকমে মার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ওরা শুনল, মা কিছু বলছে বাবাকে, আর সে গোঁ গোঁ শব্দে কিছু উত্তর দিয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়।

ইতিমধ্যে চারদিক নিস্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু ওই নিস্তব্ধতা শান্তি ও ভালোলাগার নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভীতি ও দুঃস্বপ্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লীলা আজ থালের বাজারে যাবে। চাল কেনা দরকার, কিছু চিনি আর চা-ও লাগবে। হরি ছয় কাঁদি নারকেল পেড়ে এনেছিল, সেগুলো বিক্রি করেছে মালাবারীদের কাছে, ওরা ট্রাক নিয়ে বোম্বাই থেকে আসে নারকেল কিনতে — তাই লীলার হাতে খরচ করার মত কিছু টাকা এসেছে। বেলা ও কমল স্কুলে চলে গেলে সে সবুজ টিনের বাক্স থেকে তার সবচেয়ে ভাল শাড়িটা বের করে পরে। শাড়িটা গোলাপী রঙের, তার ওপর বাদামী রঙের ফুলের নক্সা আঁকা, আর পাড়টা বেগুনী। শাড়িটা সস্তা সুতোর, কিন্তু এটা এত কম পরা হয়েছে যে এখনও নতুনের মত দেখায়, আর লীলাকেও অন্য আটপৌরে শাড়ির চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ও কমবয়সী দেখাচ্ছে। সাধারণত বাড়িতে সে গাঢ় সবুজ কিংবা গাঢ় বেগুনি একরঙের নক্সাহীন শাড়ি পরে থাকে। আজ লীলার নিজেরও শাড়িটা পরে ভালো লাগল, আনন্দ পেল। রান্নাঘরের দরজার আংটা থেকে বাজারের থলিটা নামিয়ে হাতে নিল, তারপর মার উদ্দেশে বলল, 'আমি বেরোচ্ছি', মা হয়তো ঘুমিয়ে ছিল তাই তার কোন কথা শোনা গেল না। লীলা যখন নীচের দিকে এগোল, সকালের রোদ তখন বেশ চড়া হয়ে উঠেছে।

আরো কিছু মহিলা রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল বাজারের দিকে, ঝাঁ ঝাঁ রোদের হাত থেকে বাঁচতে তাদের মাথায় ছিল বড় কালো রঙের ছাতা। রোদ সমুদ্রের জলে প্রতিফলিত হওয়ায় গোটা সমুদ্রটাই এখন চকচক করছে। যেন একটা বড় আয়না টুকরো টুকরো হয়ে জ্বলজ্বল করছে। শুধু উন্ধেরি ও কুন্ধেরি নামের দুটো ছোট পাথুরে দ্বীপ মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে। একটা দ্বীপে অনেক দিনের পুরনো একটা ছোট দুর্গ আছে, এখন শুধু গিরগিটিদের বাস। বাতাস বইছে মৃদুমন্দ, দূরে দূরে বড় নৌকো আর শালতি পাখির মত দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে — মাল নিয়ে যাচ্ছে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের উপকূল পর্যন্ত।

বেলাভূমিতে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দটি একটি ট্রাকের, সেগুন কাঠ

নামানো হচ্ছিল তা থেকে। কাঠগুলিকে বালির ওপরে থাক করে রাখা হচ্ছিল। ড্রাইভার চেঁচামেচি করছিল। গ্রামের কিছু ছেলে যারা স্কুল যায়নি, তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তারা বলির ওপর তালপাতা বিছিয়ে দিচ্ছিল গাড়ির চাকার নীচে এবং বালি থেকে তুলবে বলে লরিটাকে ঠেলছিল।

লীলা যখন ওদিকটা পেরোচ্ছিল তখন লরির চাকা বালির ওপর ঘুরে যাচ্ছিল, আর বালি ছিটকে উঠছিল। একসময় লরিটি শব্দ করে চলতে শুরু করল।

'পরের বার গরুর গাড়ি করে কাঠ পাঠিও।' ছেলেদের মধ্যে একজন ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল, আর অন্যরা খিক খিক করে হাসতে লাগল।

'তোরা কি ভাবিস আমি গরুর গাড়িও চালাব?' ড্রাইভার চিৎকার করে বলে।

'গরুর গাড়ি কিন্তু তোমার ওই আদরের মোটর গাড়ির মত বালিতে আটবে যাবে না।' ওরা চেঁচিয়ে বলল, অবশ্য ততক্ষণে ড্রাইভার লরি নিয়ে চলে গেছে দূরে।

লীলা আর কিছু শোনার জন্য না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। তপ্ত বালিতে তার পায়ের তলা জ্বালা করছে। একসময় সে বিরাট বটগাছগুলোর নীচে এসে পৌঁছল। গ্রামে একমাত্র এই জায়গাতেই ছায়া রয়েছে। জায়গাটা বেশ শীতল।

বাজারের দিকে যাওয়ার রাস্তার দু'ধারে ঘরবাড়ি। কোন কোন বাড়ি ইটের তৈরী, দেঁয়ালে চুনকাম করা, কোনকোনটির বারান্দার দেওয়ালে ফুলের নক্সা আঁকা। অন্য সব বাড়িই মাটির তৈরী। জীর্ণ তালপাতা দিয়ে বুনানো ছাদ। কিন্তু বাড়ি ছোট হোক বা বড় হোক, ধনীর হোক বা গরীবের হোক, প্রতিটি বাড়ির সদর দরজার সামনে লাগানো আছে পবিত্র তুলসীগাছ। ছেলেমেয়ের দল আর নেড়ী কুকুরগুলো ধুলোয় খেলছে। মহিলারা চাল ধুচ্ছে আর বালতিভরা নোংরা জল রাস্তায় ফেলছে।

গলির শেষে একটা মন্দির। খুব একটা পুরনো বা দেখতেও এমন কিছু আহামরি নয় — চারটে পাকা থাম ধরে রেখেছে টালির ছাদটিকে, জায়গাটিও ঘেরা নয়, একটা বেদী রয়েছে, তার ওপর রাখা হয়েছে মূর্তিটি। ব্যাস, আর কিছু নেই। তবু সিঁড়িতে বেশ কয়েকজন তরুণ বসে ড্রাম বাজাচ্ছে আর গান গাইছে।

লীলা না তাকিয়ে পারল না। রাস্তার ওপারের একটা পাকা বাড়ি থেকে একটি তরুণীও দৃশ্যটি দেখছিল, সে লীলাকে ডেকে বলল, 'লীলা দ্যাখ, অভিনেতারা সব এসে গেছে। ওরা আজ রাতে নাটক অভিনয় করবে।'

লীলা হাসল, তারপর মীনার কাছে এগিয়ে গেল, 'কী নাটক হবে জানো নাকি?' জিগ্যেস করল বন্ধুকে।

'জানি না। তবে বরাবর যা হয় তাই হবে নিশ্চয়।' মীনা উত্তর দিল। মন্দিরের উল্টোদিকেই ওদের বাড়ি, তাই সে সবকটি পালাই দেখেছে। 'হয় রাধা-কৃষ্ণের গল্প, না হয় রাম-সীতা কিংবা নল-দময়ন্তীর আখ্যান। এমনিই কিছু একটা হবে। এগুলোই তো ওরা সবসময় করে।'

লীলা এসবের প্রায় কোনটিই দেখেনি। তাই সে মীনাকে জিগ্যেস করে, 'তুমি যাবে নাকি দেখতে?' তার কথায় ঈর্ষার ছোঁয়া।

'আমি তো বারান্দাতে বসেই দেখতে পাবো।'

'সত্যি, তোমার কি ভাগ্য। বাড়িটা তোমাদের এমন জায়গায়!—'

'তুমিও এসো না, আমার সঙ্গে বসে দেখবে।'

'না ভাই, রাতে আমি এখানে আসতে পারব না।'

'কেন, পারবে না কেন? তুমি হরিকে সঙ্গে করে আসবে।'

'হরি আর আমি একসঙ্গে কোথাও বেরোতে পারি না, তাহলে বাড়িতে ছোট বোন দুটোকে দেখবে কে?'

'কেন, দেখার কী আছে? তোমার মা বাবা তো আছেন।'

লীলা কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে মাথা নাড়ল, 'আমি এখন চাল চিনি কিনতে যাচ্ছি, তুমি যাবে?'

মীনার বোধহয় কোন কাজ ছিল না — এমনিতেই তার বিয়ের জন্য এখন পাত্র খোঁজা হচ্ছে। লীলার সঙ্গে সেও হাঁটতে লাগল। গলিটা ছাড়িয়ে এলো ওরা। রাস্তার দু'ধারে মেয়েরা কলা পাতার ওপর তাদের জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। পসরা বলতে, কারো কাছে গুটিকয়েক বেগুন, কারো কাছে পালং শাক, পাঁচ ছটা কলা, দু'একটা করে ডাব, আর ঝোপ জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনা প্রচুর ফুল। সাদা, গোলাপী ও সবুজ, নানা রঙের।

মীনা অল্পকিছু ফুল কিনলো, মালা গেঁথে খোঁপায় পরবে। আর সামান্য কিছু পয়সা বেশি দিলে একটা তৈরী মালাই কেনা যেত।

কিন্তু এসব ব্যাপারে পয়সা খরচ করতে পারবে না লীলা। সে বাজারের দুটো মুদির দোকানের একটিতে গেল যেখানে চাল, ডিম, আলু, চিনি, তেল, চা ও মিষ্টি পাওয়া যায়। লীলা সেখান থেকে চাল কিনল, তবে নানাধরনের চাল দেখেশুনে, সবচেয়ে সস্তা দামের।

দোকানে দাঁড়িয়ে ছিল আরো অনেকেই — কেউ ঝুড়ি থেকে আলু বাছছে, কেউ আঙুল দিয়ে চাল পরীক্ষা করছে, কিন্তু সবাই কথা বলছিল। এখানেই লীলা ও মীনা জানতে পারল সমুদ্র তীরে কাঠ আনা হয়েছে কেন?

'দেখেছ, আলিবাগ থেকে বিজুর কাঠ এসেছে?'

'ও, ওগুলো বিজু আনিয়েছে বুঝি? নৌকো বানাবে?'

'আর ডিজেল ইঞ্জিন? সেটা আসেনি?' অন্য কেউ বলে।

'দেখবি ঠিক আসবে। বিজু ফালতু কথা বলেনা। ওর যা টাকা আছে তা দিয়ে ঠিক দু'দুটো ডিজেল ইঞ্জিন কিনবে।'

'দেখা যাবে।'

লীলা ও মীনা দোকান থেকে বেরিয়ে এল। লীলার ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেছে সেইসঙ্গে ভারীও হয়েছে।

'বাবা বলছিল, বিজু চোরাচালান করে টাকা করেছে এত', মীনা বলল।

'চোরাচালান?' কথায় যতটা প্রকাশ পেল ততটা অবাক লীলা হয়নি। একথা সে আগেও শুনেছে। 'তোমার বিশ্বাস হয়?' সে জিগ্যেস করে।

'হবে না কেন? তা না হলে ওর বাড়িতে টিভি সেট থাকে কি করে?'

'হরি কিন্তু বলছিল টিভিটা চলে না। বোম্বাইয়ের টিভি ষ্টেশন থেকে আমরা বড্ড দূরে থাকি।'

'আমার মনে হয় আরো টাকা হলে ওরা বোম্বাই চলে যাবে।'

লীলা ও মীনা আলিবাগ পেরিয়ে দূরে আর কোথাও যায়নি। আলিবাগ হল জেলার সদর শহর, এখান থেকে দু'মাইল দূরে। ওরা অনেক লোকের কথা জানে যারা হাইওয়ে থেকে বাস ধরে কিম্বা রেওয়াস থেকে নৌকো করে সমুদ্রের তীর বরাবর এগিয়ে পৌঁছেছে বিখ্যাত বোম্বাই শহরে। ওরা যখন ছোট ছিল তখন 'বোম্বাই যাচ্ছি' বলে একধরনের খেলা খেলত, এখন আর সে খেলা ওরা খেলে না।

লীলা এবার গ্রামের রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছয়। তীর এখন ফাঁকা, শুনশান। রোদ আগের চেয়ে আরো তীব্র হয়েছে।

'রাতে নাটক দেখতে এসো,' পেছন থেকে মীনা চেঁচিয়ে বলে।

'দেখা যাক,' উত্তর দেয় লীলা, যদিও সে জানে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বিজুর নৌকো তৈরী হচ্ছিল। গ্রামের ছেলেরা যাদের মধ্যে হরিও থাকে প্রায়ই, এসে দাঁড়ায় দলবেঁধে, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। নৌকো বানানোর জন্যে বিজু আলিবাগ থেকে মিস্ত্রী আনিয়েছে। থাল গ্রামের লোকেরা সারাজীবন ধরে নৌকো বানালেও বিজুর মনে হয়েছে তার নৌকো ওরা বানাতে পারবে না। তাই গ্রামের লোকেদেরও কৌতূহল ছিল দেখার আলিবাগের মিস্ত্রীরা কিভাবে নৌকো বানায়। এত সব লোক ভিড় করায় বিজু খুব রেগে যায়। চিৎকার করে সরে যেতে বলে। এতে হট্টগোল আরো বাড়ে।

বিজু মাঝে মাঝেই দেখতে আসে তার নৌকোর কাজ কতটা এগোলো। দুলকি চালে সে হেঁটে আসে, সঙ্গে ফোল্ডিং চেয়ার বয়ে নিয়ে আসে তার বাড়ি থেকে একটা ছোট ছেলে। চেয়ারটা বালির ওপর রাখা হলে বিজু সেখানে বসবে খুব সাবধানে ধুতিটা গুটিয়ে, যদিও মনে হবে তাতে সে খুব আরাম বোধ করছে না। যেভাবে সবাই বসে, সেও বালির ওপর গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। কিন্তু এখন সে এতবড় একটা জাহাজের মালিক, সবার চেয়ে আলাদা হয়ে চেয়ারে বসাটাই তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়।

মাঝে মাঝে তার স্ত্রীও হেলে-দুলে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে নৌকো বানানো দেখতে। তার বসার জন্যে ফোল্ডিং চেয়ার থাকে না তাই দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একসময় ক্লান্ত বোধ করলে বাড়ি ফিরে যায়। বিশাল জমির ওপর ওদের দোতলা পাকাবাড়ি, পেছনে নারকেল আর সুপুরি বাগান — এত ঘন গাছগুলো যে বাগানের মধ্যে আলো প্রায় ঢোকেই না। বাড়ির সর্বত্র বিত্তের চিহ্ন — অনেকগুলো ডিপ টিউবওয়েল, অনেক গরুর গাড়ি, সারি সারি বলদ, মুর্গি, হাঁস, স্তূপীকৃত জ্বালানি কাঠ, পায়রার ঘর, আর আছে সেই বিখ্যাত টেলিভিশন সেট — নীল টিনের ছাদের ওপর থাল গ্রামের একমাত্র অ্যান্টেনাটি শোভা পাচ্ছে। বাড়ির দেওয়ালে টিনের ওপর বাঁকা অক্ষরে বাড়ির নাম লেখা — 'আনন্দভবন'। যদিও ঘন গাছপালার জন্য আলোর প্রবেশ তেমন না থাকায় এবং অগোছালো চওড়া উঠোনটার জন্য বাড়িটাকে যতটা আনন্দময়, তারা চেয়ে বেশি নিরানন্দময় বলে মনে
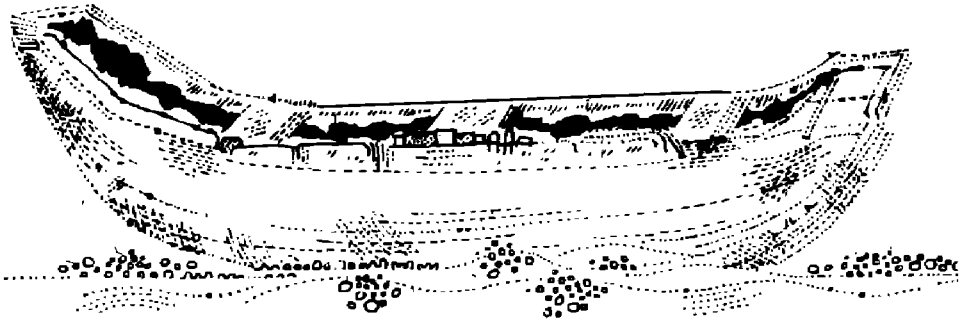
হয়। বিজুর স্ত্রীও গোমড়া মুখেই বাড়ি ফিরে এল। সে জানে, তাদেরকে নিয়ে গ্রামবাসীরা কি ধরনের কথাবার্তা বলে। এসব তার মোটেই ভালো লাগে না।

এত বড় নৌকো তৈরী হচ্ছে — গ্রামের প্রায় সব লোকই কোন-না-কোন সময় অন্তত একবার গিয়ে দেখে এসেছে। এত বড় নৌকো গ্রামে কারো নেই, কেউ কখনও এমন নৌকো বানায়ওনি। এর ফলে একধরনের ঈর্ষাও হয়তো জন্মেছিল তাদের মনে, তাই প্রশংসাসূচক কোন কথা তাদের মুখে আসেনি। কিংবা এমনও হতে পারে যে তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না, এই নৌকো সত্যিসত্যি সমুদ্রে চলবে, কেননা একে তো নৌকোটা বিশাল বড় আর বড্ড জবরজং, তার ওপর বানিয়েছে সেই আলিবাগের মিস্ত্রীরা। আবার একদিক থেকে তাদের গর্বও হচ্ছিল যে থাল গ্রামেরই কেউ এটার মালিক হবে, হোক না সে বিজুর মত অসৎ কিংবা চোরাচালানী।

'স্মাগলার, স্মাগলার, স্মাগলার', ফিসফিস করে ছেলে মেয়েরা বলছিল নৌকো

দেখতে দেখতে, কেউ কেউ শুনে হেসে উঠেছিল। বিজুর চিৎকার করে ওঠায় অবশ্য সবাই থেমে যায়, তারপর দৌড়ে পালায়।

ছুটতে ছুটতে তারা গানের মত সুর করে চলে, 'বিজু যাবে জেলে'! 'বিজু যাবে জেলে!' বিজুর বয়স হয়েছে, তায় মোটা শরীর, তাই ওদের ধরে উচিত শাস্তি দেবে এমন সাধ্য তার নেই।

'আমাদের গ্রামে কি সত্যিই স্মাগলার থাকে, হরি', বেলা ও কমল রাতে ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জিগ্যেস করে।

'থাকেই তো?'

'ওরা কি চোরাচালান করে?'

'সোনা, রুপো।'

'না-না —'

'নিশ্চয় সোনা রুপো — না হলে এত বড়লোক হল কী করে?'

'সোনা রুপো হলে তা পাবে কোথায়? সমুদ্রে কি ওসব পাওয়া যায়?'

'না রে বোকা, এসব বিদেশ থেকে নিয়ে আসে, বিদেশে ওসবের দাম কম, সোনার খনি রুপোর খনিও আছে সেইসব দেশে। জাহাজে করে আনে আফ্রিকা থেকে, তারপর আরব থেকে। একসময় জাহাজ থেকে মাছধরার নৌকোয় চাপিয়ে তীরে নিয়ে আসা হয়। তারপর বেশী দামে বিক্রি করে দেয়।'

'তুমি দেখেছো নাকি?'

'না', হরি স্বীকার করে, 'আমি দেখিনি কোনদিন, কিন্তু শুনেছি। এই যে মেয়েরা এত সোনার গয়না, রুপোর গয়না ভালোবাসে ও কেনে তাতেই তো স্মাগলাররা প্রচুর টাকা কামিয়ে নেয়। বিজুও তো এইভাবে প্রচুর টাকা করেছে।'

'সবাই বলছে, থালের সবচেয়ে বড় মাছধরার নৌকো ও বানাচ্ছে।'

'ওটা সব চেয়ে ভালোও হবে। ওই নৌকোয় যদি একটা কাজ পেতাম।'

'তুমি কাজ নেবে? বিজুর নৌকোয়?'

'কেন নেবো না?'

'না হরি, বিজুর সঙ্গে তুমি কাজ করবে না। তুমিই তো বললে ও একটা স্মাগলার। ও তোমাকেও স্মাগলার বানিয়ে দেবে।'

'তাহলে তো ভালোই, আমিও ওর মত বড়লোক হয়ে যাবো' হরি হাসতে হাসতে বলে, 'তোদের সোনার হার ও রুপোর মল গড়িয়ে দেব।'

'না, হরি, না', একসঙ্গে দুজনেই যেন আর্তনাদের মতো করে কথা বলে ওঠে, 'পুলিশ তোমাকে ধরে জেলে পুরে দেবে।'

'ওরা তো আমাকে বোম্বাই নিয়ে যাবে, তাহলে তো আমি অন্তত বোম্বাই পৌঁছতে পারব।'

'তুমি কি বোম্বাই চলে যেতে চাও?' ওরা ফিসফিস করে বলে। বোঝা যায় ওরা হরির শ্লেষমাখা কথায় ভয় পেয়েছে।

'চাই তো। তোরা চাস না?'

পাশাপাশি শুয়ে বিছানায় ওরা অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। কিছুক্ষণ পর মার ঘর থেকে মৃদু আর্তনাদের শব্দ আসতেই হরি ওদের চুপ করতে বলল। ওরা চুপ করে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। হরি জেগে শুয়েছিল — শুনছিল ওদের গভীর নিশ্বাসের শব্দ, সেই শব্দের চেয়েও গম্ভীর প্রশ্বাসের শব্দ আসছিল সমুদ্র থেকে। হরি ভাবতে থাকল সেইসব নৌকোর কথা যারা সমুদ্রে অবাধে ঘুরে বেড়ায়, ইচ্ছেমত চলে যায় বোম্বাই, আফ্রিকা ও আরবে।

সে যদি এমনই একটা নৌকোয় চড়তে পারত, অন্তত বোম্বাই পর্যন্ত যদি যেতে পারত!

বোম্বাই! ভাবতে গিয়েই ওর চোখ চলে গেল জানলার বাইরে যেখানে তারারা জ্বলছে — শহরের আলো কি তারাদের মত জ্বলে, নাকি আরো উজ্জ্বল? অত বড় শহর, বড়লোকদের বাস। একবার পৌঁছতে পারলে সেও টাকা রোজগার করতে পারবে, তখন বাড়ির জন্যে কত জিনিস কিনে আনবে, সোনা ও রুপোর গয়না পরে সাজবে তার বোনেরা।

'না না' চোখ বন্ধ করে সে নিজেকেই বলল এবার। বোকা বোকা কল্পনা এইসব — স্বপ্ন দেখলে তার চলবে না। তাকে মাটির কাছাকাছি থাকতে হবে, নতুন করে ভাবতে হবে, কিন্তু কিছুই মাথাতে এলো না তার, তাই সে আর ভাবতে পারল না, ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

তীরের কাছে জাল ফেলে মাছ ধরা কিংবা তাদের অনুর্বর জমিতে গিয়ে মাটি কোপানো কোন কাজই করার চেষ্টা করল না হরি। বেশিরভাগ সময়টা সে কাটালো গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৌকো তৈরীর কাজ দেখে। বড়বড় কাঠগুলোকে চিরে সমান করা হচ্ছিল, তক্তাগুলো শুইয়ে রাখা হচ্ছিল বালির ওপর, সূর্যের আলো পড়ে দেখাচ্ছিল লালসোনার রঙ। ওরা যে কাঠ সাধারণত ব্যবহার করে সেই নারকেল গাছের কাঠ নয় এসব, খুবই ভালো জাতের কাঠ। গ্রামের সবকিছুতেই যেমন মাছ ও সমুদ্রের গন্ধ লেগে থাকে, এগুলোতে সে গন্ধ নেই — গন্ধ শুধুই ভালো কাঠের, কাঠের গুঁড়োর, বনের, সুদূর ও সুন্দর জিনিসের ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণে হরির নাকটা জ্বালা করতে লাগল।

বিজু ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আরাম পায়না। তবু বসে। ওইভাবে বসে বসে কাজ দেখে। কেউ ওর কাছে গেলে সে গর্বের সঙ্গে বলে, 'এই নৌকোয় একটা ডিজেল ইঞ্জিন লাগানো হবে, আর একটা ফ্রিজও থাকবে, ডিপ ফ্রিজ।' বেশ আস্তে আস্তে মোহগ্রস্ত গলায় কথাগুলো বলে সে — 'তাহলে নৌকো একটানা ছয়দিন যাবে। মাছ যা ধরা হবে ডিপফ্রিজে রাখা হবে, নষ্ট হবে না। বোম্বাই নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত টাটকা থাকবে।'

'টাটকা থাকবে না, বরফে জমে থাকবে', মৃদুস্বরে হরি বলে, কিন্তু তা বিজুর কানে পৌঁছয় না।

'এটা বানাতে খরচা কত পড়বে?' গ্রামের একজন মানুষ বেশ ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে। লোকটির দুটো ছাগল ও একটা রান্নার পাত্র ছাড়া আর কিছুই নেই, কাজেই তার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয় বিজুর টাকা পয়সা কত আছে।

'কত আর — এই দু'আড়াই লাখ হবে।' বিজু উত্তর দেয় খুব সহজ গলায়, যদিও মনে মনে সেও খরচের বহর দেখে খুবই আতঙ্কিত।

'অ্যা — ত?'

'তাতে কী? একবার এটা সমুদ্রে ভাসলে দিনে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠে আসবে' — বিজুর গলায় এবার গর্ব ফুটে উঠল।

পায়ের আঙুল দিয়ে হরি বালির ওপরে দাগ কেটে ছবি আঁকছিল, সব কথা তার কানে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকবছর স্কুলে পড়লেও ওই লোকটির মত সেও ভাবতে পারছিল না — ওই টাকা বলতে কত বোঝায়। তেমনভাবে বিশ্বাস না হলেও বিজুর চোখ দিয়ে ভবিষ্যতের এমন ছবি দেখতে গিয়ে হরিও মুগ্ধ হল। যদিও সে জানে, সমুদ্রে অনেক বিপদ থাকে, ঝুঁকি থাকে। কত লোকই না সমুদ্রে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। প্রতিটি বর্ষার মরসুমেই কত লোক ডুবে গেছে জলে, কত নৌকো ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি। হরি এসব জানে, তবু সে ভাবল নৌকোয় দূর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার কথা — সে ফিরে আসবে না আর — যদি ফেরে প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করে ফিরবে।

রামু যখন সাইকেলে চেপে তার কাছে এসে বলল, 'এই হরি, আয় আমার সঙ্গে', সে তখন তার সঙ্গে গেল। তপ্ত বালির ওপর দিয়ে যেতে যেতে তখনও সে ভাবছে কোন পক্ষ নেবে সে — বিজুর, না যারা বিজুকে বিশ্বাস করে না তাদের।

রামু বিজুকে আদৌ বিশ্বাস করে না। সে বলে, 'এটা একটা মাছধরার নৌকো বুঝলি, অবশ্য তাতে ডিপফ্রিজও থাকতে পারে। বর্ষাকালের ব্যাপারটা জানিস তো — একটা ঝড়, ব্যাস, দেশলাই বাক্সের মতো চুরমার হয়ে যাবে এই নৌকো, যেভাবে আর সব নৌকো ভেঙে যায়। বর্ষার সময় চালানোর মত তেমন শক্ত হচ্ছে না এটা, সুতরাং কী লাভ? এটা ফালতু হয়ে যাবে দেখিস।'

'যাই বলিস, মাছধরার মরসুমে কিন্তু বিজু অনেক টাকা কামাবে।' হরি বলে। 'ঠিক আছে, কিন্তু মাছধরার সিজন চলে গেলে তখন কী করবে? অন্য সব বুড়ো মানুষদের মতো তীরে বসে পুরনো জাল সারাবে? তার চেয়ে বরং একটা কাজ জোটানো দরকার, দৈনিক মজুরি পাওয়া যাবে। তার উপরে অন্যান্য অনেক সুবিধেও আছে — ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার ফ্রি, অসুখ করলে ডাক্তার দেখবে, মাইনেসহ ছুটি পাবি — এটাই তো জীবন।' রামু মনের আনন্দে জোরে জোরে সাইকেলের বেল বাজাতে লাগল।

'তুই ভাবছিস থালে এমন একটা চাকরি তুই পাবি?' হরির কথায় সংশয় প্রকাশ পায়। এ ব্যাপারে তার সংশয় বিজুর নৌকো সম্পর্কে সংশয়ের চেয়েও বেশী।

'পাবই তো। কারখানাটা একবার তৈরী হোক, দেখবি রামু কাজের জন্য লাইনের প্রথমে দাঁড়িয়ে আছে।'. রামু উত্তেজিত ভাবে বলে, আবার বেল বাজায়। এবার এত জোরে বাজিয়েছে যে মোষের পিঠে বসে-থাকা এক জোড়া বক ভয় পেয়ে উড়ে চলে গেল নারকেল বাগানের দিকে।

'আমাকেও চেষ্টা করতে হবে', হরি বলে, 'আমিও চেষ্টা করব তোর মত।'

এখন চোখের সামনে দু'তিনটে সম্ভাবনা দেখতে পেল হরি। এখন যদিও তাকে মাছধরা ও নারকেল বিক্রির কাজ করতে হচ্ছে, পরে সে কারখানার কাজ কিংবা বিজুর মাছধরা নৌকোয় কাজ, আর কেউ যদি সাহায্য করে তো বোম্বাই গিয়ে কোন কাজে লাগা — এই তিনটির মধ্যে একটাকে বেছে নিতে পারবে। তার জীবনে এতগুলো সম্ভাবনার দিক রয়েছে ভেবে সে উত্তেজনা বোধ করল, আর ভয়ও পেল। থালের লোকেরা কোনদিন কিছু বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়নি — মাছ ধরা ও সমুদ্রের ধারে চাষবাসের বাইরে কোনদিন কোনকিছু ভাবেনি তারা। এখন এসব যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ অন্যধরনের হলেও হরিরও বিজুর মত বাছাই করার সুযোগ থাকবে, যা গ্রামের আর কেউ পায়নি কোনদিন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হবে, কে তাকে সাহায্য করবে — এসব চিন্তা করতে করতে সে হাঁটতে লাগল।

এইসব নিয়ে সে অনবরত চিন্তা করতেই থাকত যদি না একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। একটা গাড়ি রাস্তায় লাফাতে লাফাতে নারকেল গাছের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে 'মন রিপোজ' এর সামনে দাঁড়াল। সাদা বাড়িটা সারা বছরই প্রায় খালি পড়ে থাকে। ডি সিলভা পরিবারের লোকজন কদিনের ছুটি কাটাতে বোম্বাই থেকে আসায় বাড়িটা কদিনের জন্য প্রাণ ফিরে পাবে। ওরা বাড়িটা কিনেছিল বছর খানেক আগে উকিলদের কাছ থেকে। আসলে উকিলরাই অন্যতম প্রথম পরিবার যারা বোম্বাই থেকে এসে থাল বীচে হলিডে কটেজ বানিয়েছিল। কিন্তু পরিবারের লোকেদের বয়স হওয়ায় তারা তেমন একটা আসতে পারত না। বাড়িটা বেশ কয়েকবছর খালি পড়ে থাকার পর ডি সিলভাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এরা তরুণ ও কর্মঠ। মনে হয় বীচে আসাটা বেশ উপভোগ করে। যখনই ওরা আসে, ছোট কুটিরবাসী পরিবারটিতেও পরিবর্তন ঘটে যায়। কর্মব্যস্ততার সঙ্গে উত্তেজনা ও প্রত্যাশা জড়িয়ে থাকে — আর, করার মত কিছু কাজ অবশ্যই জুটে যায় এবং পারিশ্রমিকও।

হরি, বেলা ও কমল তাদের দরজার পাশের গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল, সবার মনে চাপা উত্তেজনা, পিন্টোকেও আটকে রাখতে হচ্ছিল কেননা একটা মোটরগাড়ির অপরিচিত দৃশ্য, কিছু অচেনা লোকের মুখ দেখেই তার চিৎকার শুরু হয়েছিল। যে জলা খালটি তাদের কুটির ও বাড়িটাকে আলাদা করে রেখেছে সেখানেও আলোড়ন হয়েছে — বক, সারস, মাছরাঙা ইত্যাদি খাল থেকে উড়ে যাচ্ছে ঝাউবন ও ভিন্দিগাছের দিকে আশ্রয়ের খোঁজে।

'ওরা এখানে পাকাপাকি থাকবে বলে এসেছে নাকি রে?' বেলা নিচু গলায় বলে।

'ধ্যুর, বোম্বাইয়ে যাদের বাড়ি আছে তারা এখানে এসে থাকবে কেন?' পরিহাসের সুরে হরি উত্তর দেয়।

'কিন্তু দ্যাখ কত মালপত্র সঙ্গে এনেছে — নিশ্চয় অল্পদিনের জন্য আসেনি', বেলা বলল। বেলা একটুও বাড়িয়ে বলে নি, এত বেশি সংখ্যার বাক্স, ব্যাগ, ঝুড়ি নামানো হচ্ছিল গাড়ির ভিতর থেকে ও পেছনের ডিকি থেকে, যে দেখে যে-কেউ ভাবতে পারত যে ওরা এখানে একেবারে চলে এসেছে।

এতসব মালপত্র টেনে বাড়িতে নিয়ে যেতে ওদের বেশ অসুবিধে হচ্ছে দেখে হরি এগিয়ে গেল। সমস্ত জিনিসপত্র বারান্দায় তোলা হলে সে ফিরে এল। কিন্তু ও-বাড়ি থেকে একটি ছেলে ছুটে এসে হরিকে আবার ডেকে নিয়ে গেল।

হরি বারান্দার সিঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়াতে মিসেস ডি সিলভাকে দেখতে পেল — থালের কোন মহিলাকে হরি পরতে দেখেনি এমন নতুন একটা পোষাক তার পরনে, হরি সরাসরি তাকিয়ে দেখতেও পারছিল না। তিনি একটা ঝুড়ি আর কিছু টাকা হরির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন বাজার থেকে মাছ কিনে আনতে। 'খুব টাটকা দেখে এনো' — বার বার এই কথাটা বললেন। 'আর শোনো, কাল সকালে আমাদের দুধ লাগবে, আর ডিম — তুমি টাটকা দেখে কিনে আনতে পারবে?' এই বছরেই সপ্তাহান্তিক ছুটিতে ওরা যখনই এখানে এসেছে, হরি ওদের জন্য এইসব টুকিটাকি কাজ করে দিয়েছে। কিন্তু হরিকে ওরা ভুলে যান, কিম্বা ইচ্ছে করেই চিনতে চান না। শহরের লোকদের কিছু মনে থাকে না, হরি ভাবল, কিম্বা এমনও হতে পারে যে তারা এত শতশত ছেলেদের মুখ রোজ রাস্তায় দেখে যে নির্দিষ্ট একজন কাউকে মনে রাখতে পারে না। কিন্তু সে মাথা নেড়ে ঝুড়ি ও টাকাটা নিল তারপর বেরিয়ে এল।

পরের কদিন হরি খুব ব্যস্ত থাকল ওদের জন্যে — মাছধরা নৌকোগুলো তীরে এলে মাছ কিনতে যাওয়া, গ্রামের বাজার থেকে ডিম ও দুধ আনা ইত্যাদিতে। হরি ওদের সোডার বোতলও এনে দেয়। সন্ধেবেলা বাড়ির বাইরে পাম গাছের নিচে, বোম্বে থেকে আনা ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে ওরা মদের পাত্রে চুমুক দেন।

বোম্বাই থেকে তারা তাদের কাজের লোকজনদেরও সঙ্গে এনেছেন — একজন রাঁধুনি রান্না করে দেয়, আয়া তাদের কাপড় চোপড় কাচে, তোয়ালে, বালতি এইসব সঙ্গে করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বীচে যায়। এটা দেখার মতো দৃশ্য বটে —ছেলেমেয়েরা খেলছে, সমুদ্রের জল ছেটাচ্ছে, ঢেউ এসে যখন ওদের ফেলে দিচ্ছে ওরা চেঁচাচ্ছে, হাসছে, তাদের মাথা জলের ফেনায় ভরে যাচ্ছে, হরি আর ওর বোনেরা নারকেল বাগানের আড়াল থেকে দেখে, কিন্তু থালের লোকেরা আসা-যাওয়ার পথে একটু থেমে ওদের এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে হাসে। তারা কাজেই যায় বীচের দিকে — নৌকো নিয়ে সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে, কিন্তু কখনো সাঁতার কাটতে বা মাছ ও ব্যাঙের মত জল নিয়ে খেলতে যায় না। তারা ভাবে বোম্বাই শহরের লোকজনদের নিশ্চয় মাথার গণ্ডোগোল আছে।

ছেলেমেয়েরা যদিও খেলা করা কিম্বা এদিক ওদিক শুয়ে বিশ্রাম করা ছাড়া অন্যকিছু করত না তবু আশেপাশের সবাই কিন্তু সর্বদা ব্যস্ত থাকত। রাঁধুনি ও আয়ার পক্ষে সব কাজ সেরে ওঠা সম্ভব হত না বলেই হরিকে কাজে লাগানো হত। (একসময় হরির বাবাও ওদের কাজ করে দিয়েছে)। রান্নার লোক হরিকে দিয়ে মাছ পরিষ্কার করে কাটিয়ে নিত, কখনও শাকসব্জিও কাটতে হত। আয়া ওকে বলত ঘর মুছতে — দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার জন্য ঘরে ঘরে মাকড়সার জাল বিছিয়ে থাকত আর ঘরভর্তি ধুলোবালি। তখন হরি লীলাকেও ডাকত, লীলা তাদের ঝাড়ু নিয়ে এসে শাড়ি গুটিয়ে লেগে যেত ঘর পরিষ্কার করতে। ছেলেমেয়েরা লীলাকে অনুসরণ করত, অবাক হয়ে ওর কাঁচের চুড়ি ও খোঁপায় গোঁজা ফুল দেখত। লীলা কাজ থামিয়ে ওদের দিকে হাসলে ওরা আরো কাছে আসত ও সাজগোজের প্রশংসা করত। ওরা নিজেরা কখনও গয়না পরত না, যদিও প্রতিদিন এবং কখনও দিনে দু'বার বদলে পরার মত যথেষ্ট কাপড় ওদের ছিল। লীলা ওদের জন্যেও ফুল এনে দেবে শুনে ওরা কুটির পর্যন্ত লীলার সঙ্গে এসেছে।

'কমল, বেলা আয়, এদের জন্য ক'টা মালা গেঁথে দেতো।' লীলা বোনেদের ডাকে। ওদের আসতে দেখে ওরা ইতিমধ্যেই বারান্দায় এসে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছে। কমল ও বেলা হাসতে হাসতে ছুটল যুঁই ফুল জোগাড় করতে।

ছেলেমেয়েরা মালা নিয়ে বাড়ি যায় তাদের মাকে দেখাতে।

পরদিন লীলা যখন ঘর ঝাঁট দিতে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল কিছু গাঁদা, কেতকী ফুল আর কিছু পঞ্চমুখী জবার কুঁড়ি, যেগুলো তাদের বাড়ির পাশে ঝোপে ফুটেছিল। তার ইচ্ছে, ছেলেমেয়েদের দেখানো, কী করে সকালে তোলা তুষারের মত সাদা কুঁড়িগুলো দুপুরে হাল্কা গোলাপী হয়, আবার সন্ধ্যায় সেগুলো গাঢ় সোনালী হয়ে রাত হলে গাঢ় রক্তিম হয়ে ওঠে। 'ম্যাজিক, ম্যাজিক ফুল' বলে ওদের চিৎকার করতে দেখে লীলা হাসে। ওরা অবাক হলেও তার কাছে এটা নিত্যকার ব্যাপার। সে রোজই তাদের রান্নাঘরের জানলা দিয়ে এগুলোকে দেখে।

একদিন সন্ধ্যায় ওরা যখন বারান্দায় বসেছিল, সমুদ্রের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছিল। ওদের পাশে একটা পাত্রে, বালি রাখা ছিল, বালির মধ্যে গুঁজে রাখা ছিল ক্যাসুয়ারিনা গাছের একটা ডাল। হরি যখন সোডা নিয়ে পৌঁছল, অবাক হয়ে দেখল রঙীন কাগজে সাজানো হয়েছে চারদিক, রুপোর তারা ও সোনার বল হয়ে রংবেরঙের কাগজ উড়ছে হাওয়ায়। বারান্দায় যারা বসেছিল তারাও খোসমেজাজে, উত্তেজিত গলায় জোরে জোরে কথা বলছে — বড়রাও ছোটদের সঙ্গে নানারকম খেলা খেলছে। অনেক রাত অব্দি সবাই মিলে গান গেয়েছে, হেসেছে, খুব দেরি করে ডিনার খেয়েছে। রান্নাঘরে বাসন ধুতে গিয়ে হরি দেখেছে, খাবার খাওয়ার আগে তারা একটা প্লেটে খাবারের তৈরি বলে আগুন লাগিয়েছে — কেন, তা সে বুঝতে পারেনি।

সকালে লীলা যখন ঘর পরিষ্কার করার জন্যে গেছে, তখন দেখেছে অনেক ছেঁড়া রঙীন কাগজ মেঝেতে পড়ে আছে। ও যখন কাগজগুলোকে যত্ন করে ভাঁজ করে একটা জায়গায় জমিয়ে রাখছে, তখন মিসেস ডি সিলভা এসে বললেন, ‘খ্রীষ্টমাস চলে গেছে ওগুলো সব ফেলে দাও।’ কিছু বুঝতে না পেরে লীলা কাগজগুলো বেলা ও কমলের জন্যে বাড়িতে নিয়ে যায়। ‘খ্রীষ্টমাস শেষ হয়ে গেছে’ — সে ওদের বলে এবং জেনে অবাক হয় যে একথাটির অর্থ ওরা জানে। ‘হ্যাঁ খ্রীষ্টমাসের কথা স্কুলে মাষ্টারমশাই আমাদের বলেছেন, অনেক অনেকদিন আগে একটা আস্তাবলে যে শিশুটি জন্মে ছিলেন, এটা হল তাঁর জন্মদিনের ভোজ’, বেলা বলল। ‘ঠিক কৃষ্ণের মত, কৃষ্ণও তো কারাগারে জন্মে ছিলেন’, কমল ব্যাখ্যা করে বলে। লীলা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর জিগ্যেস করে, ‘কিন্তু ওরা গাছটাকে রঙীন কাগজ ও কাগজের তারা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল কেন?’ দু’বোনের কেউ আর উত্তর দিতে পারল না, তাদের মাষ্টারমশাই তো গাছের কথা কিছু বলেন নি। ঠিক তখনই ওবাড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা ওদের জন্য মিষ্টির একটা প্যাকেট নিয়ে এল। ওরা তা নীরবে গ্রহণ করল এবং পরে আনন্দ করে সবাই মিলে খেল।

‘বেচারা পিন্টো, ওকে একটা দে’, লীলা বলল। পিন্টোর জন্যে কষ্ট হল তার, বেচারার সময়টা খারাপ যাচ্ছে, কেননা ডি সিলভা পরিবার সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাদের কুকুরটিকে — গায়ে সোনালী রঙের লোম, গল্পের রাজকন্যার মত সুন্দর। ওরা ভয় পেয়েছিল উত্তেজিত হয়ে পিন্টো না মিশাকে কামড়ে দেয়, তাই তারা হরিকে দিয়ে পিন্টোকে বেঁধে রাখত একটা গাছ কিংবা বারান্দার খুঁটির সঙ্গে, অন্তত যতক্ষণ, মিশা বাগানে ছুটোছুটি করে বেড়াত। প্রথমদিকে পিন্টো রাগে চিৎকার করত, পরে যখন দেখল চিৎকারে কোন লাভ হচ্ছে না, তখন সে বালির ওপর শুয়ে থাকত। মনে সে এত ব্যথা পেয়েছিল যে, বেলা যখন তাকে মিষ্টি দিতে গেল, তাকালোই না? মাথাটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

অবশ্য ক'দিন বাদেই পিন্টোর সুদিন ফিরে এল। একদিন সকালে দেখা গেল গাড়িতে মালপত্র তোলা হচ্ছে বোম্বাই ফিরে যাওয়ার জন্যে। মিঃ ডি সিলভা হরিকে দিয়ে এক বালতি জল আনিয়ে গাড়িটা ধুয়ে নিলেন, তার আগে ওকে মুছতেও হয়েছে। পাইপ মুখে, কাজ দেখতে দেখতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এইভাবে। ... শোন — বাড়িটা ভেঙে পড়ছে, দেখভাল করার একজন লোক দরকার, আমরা যখন এখানে থাকব না তখন বাড়িটার খেয়াল রাখবে। এইযে এবার যাচ্ছি বেশ কয়েকমাস আসা হবে না আর, কিন্তু তাই বলে বাড়িটার ক্ষতি হতে দেওয়া যায় না। আমরা সামান্য কিছু মাইনে দেব, তেমন বেশি নয়, কেননা কাজ তো তেমন

কিছু করতে হবে না। এই নজর রাখা আর কি — মাঝে মাঝে খুলে বাড়িটাকে আলোবাতাস খাওয়াতে হবে, আর তেমন মেরামতির দরকার হলে আমাদের খবর দেবে। তোমার বাবা একাজটা করতে পারবে না? তুমি কি বলো? আগে তো ওকে দেখা যেত — এবার তো দেখলামই না। কোথায় আছে?'

খুবই উত্তেজিত হয়ে হরি বাড়ি ফিরল। সে জানত বাবা ঘরের অন্ধকার কোনে মাদুরের ওপর শুয়ে আছে। 'বাবা, বাবা' হরি ডাকে, 'ভদ্রলোক তোমাকে ডাকছেন, উনি তোমাকে একটা কাজ দিতে চান।'

'অ্যাঁ, কাজ?' বলতে বলতে হরির বাবা মেঝে থেকে উঠে দরজার কাছে আসে। হরি বাবাকে সঙ্গে করে মিঃ ডি সিলভার বাড়ির দিকে আসে। উনি তখনও গাড়িতে মালপত্র উঠানোর তদারকি করছিলেন। কিন্তু হরি ও তার বাবাকে দেখে তার মুখের ভঙ্গিটা বদলে গেল। কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘ জড়ানো গলার উত্তর শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন — উত্তরের সঙ্গে তাড়ির গন্ধও আসছিল। অবশেষে তিনি মাথা নেড়ে বারান্দায় উঠে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'অকর্মা মাতাল এই গ্রামের লোকগুলো — সাত সকালে বেহেড মাতাল হয়ে এসেছে। এদের কাছে তুমি কী আশা করবে? কিচ্ছু হবে না এদের দিয়ে?'

হরি বাবাকে নিজেদের বাড়ির দিকে নিয়ে এল। মনটা তার পাথরের মত হয়ে গেছে, ভারী ও শীতল। এমনকি ডি সিলভারা যখন গাড়িতে উঠল কুকুরটিকে নিয়ে, মিঃ ডি সিলভা গাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে হরিকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, 'খুব ভালো ছেলে, তুমি গাড়ির কাজ খুব ভালো করেছ, তুমি যদি কখনও বোম্বাই আসো, আমি তোমাকে গাড়ি পরিষ্কার করার কাজ দেব', হরি তখনও হাসল না, হাসতে পারল না। সে টাকাটা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল যতক্ষণ না গাড়িটা নীচের রাস্তা দিয়ে গিয়ে নারকেলগাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লীলা তারপরই পিন্টোকে ছেড়ে দিল, সে খুশিতে চিৎকার করে মুহূর্তেই গাড়িটার পথ অনুসরণ করে ছুটতে লাগল।

কারখানাটা সত্যিই গড়ে উঠল কি না, হরি যেদিন তা দেখতে বেরলো, তখনও তার সারাটা মন মদ্যপ বাবার জন্য, বোম্বাইবাসী লোকটির অপমানজনক উক্তির জন্য নীরব ক্রোধে জ্বলছিল। কোনওদিন বোম্বাই গেলে মিঃ ডি সিলভা তাঁর প্রতিশ্রুতি মত তাকে গাড়ি ধোওয়ার কাজটা দেবেন কি না বা ঐ কাজটা তার আদৌ দরকার হবে কি না, তাও সে জানে না। সে এ-ও জানে না নৌকো তৈরী হলে বিজু তাকে কোন কাজ দেবে কিনা। তাই তার দেখা দরকার কারখানাটা তৈরী হল কি না, আর সেখানে সে একটা কাজ পাবে কি না। তিনটে সম্ভাবনার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল মনে হল তার।

কিন্তু হরি যখন ছোট পাহাড়টির নিচে কারখানার জমিতে গিয়ে পৌঁছল, তখন

সে ভারি হতাশ হয়ে দেখল — টিনের চালাটি বন্ধ, হলুদ লরিটাও নেই, কিছু বড় বড় কংক্রীটের পাইপ শুধু এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে যা দেখে বোঝা যাচ্ছিল কেউ এখানে একটা কারখানা গড়তে চেয়েছিল। এইসব ছোটখাট জিনিস দিয়ে শুরু হয়ে কবে জায়গাটা যন্ত্রপাতির ঘটর ঘটর শব্দে একটা বিশাল কারখানায় পরিণত হবে যেখানে রামু ও হরি কাজ করবে?

হরি পাইপগুলোর চারপাশে একবার ঘুরল যেন সেগুলো তখনই ঘুরতে শুরু করবে কিন্তু তার পরিবর্তে একটা বাদামী রঙের ঘাসফড়িং ঘাস থেকে লাফিয়ে পাইপের ওপর বসল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার লাফিয়ে ঘাসে চলে গেল। এক হাত থেকে অন্য হাতে একটা ছোট পাথর ছুড়ে এবং শিস দিতে দিতে হরি তার হতাশ ভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। তারপর সে পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের গায়ে লাল পাথুরে মাটি কেটে কেটে সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছিল ফলে সহজেই ওপরে ওঠা যায়। সিঁড়ির পাশে শুকনো সোনালী ঘাসের ওপর দিয়ে ও যখন ওপরে উঠছিল, তখন এক রাখালকে দেখল একপাল ছাগল নিয়ে নেমে আসছে। রাখালের পরনে ছিলো সাদা ধুতি, মাথায় লাল রঙের পাগড়ি, আর তার ছাগলগুলো ছিলো সাদা কালো ও বাদামী রঙের — তারা ধুলো উড়িয়ে রাখালের পেছন পেছন আসছিল। কয়েকটি ছাগল খাদের ধারে আটকে যাওয়ায় তারা নামতে পারছিল না বলে চিৎকার করছিল, অন্যরা ততক্ষণে পাহাড়ের নীচে পৌঁছে গেছে। একসময় খুবই মরিয়া হলে আটকে পড়া ছাগলগুলো খাদটা পার হয়ে নীচে পৌঁছল। তারপর ছাগলের পালটা হাইওয়ে পেরিয়ে শুকনো মাঠে গিয়ে পড়ল যেখানে শীতের ধান সদ্যই কেটে নেওয়া হয়েছে। ধুলোর মধ্যে দূর থেকেও তখনও রাখালের টকটকে লাল রঙের পাগড়িটা দেখা যাচ্ছিল।

ঘাড়টা পেছন দিকে ফিরিয়ে হরি ওপরে উঠছিল, দেখছিল — দুটো বিশাল ঘুড়ি যেন সন্ধ্যার আকাশে খেলায় মেতেছে — বাতাসের ঢেউয়ে ভাসছে, পাক খাচ্ছে, যেন গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে নাচছে। হরি দেখতে লাগল, ঘুড়ি দুটো বাতাসের টানে ডিগবাজি খেতে খেতে মেয়েদের স্কুলের মাথার ওপর দিয়ে, খেজুর ও কলাগাছের ঘন সবুজের আড়ালে ঢাকা তাদের বাড়ির ওপর দিয়ে, এমনকি সমুদ্র ছাড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে — যে সমুদ্রে রঙিন আভা ছড়িয়ে ডুবে যাচ্ছে সূর্য, ঠিক যেন কোনও রাজা চলেছেন তাঁর রাজকীয় বিশ্রামে। তারপর ঘুড়ি দুটো চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

মদ্যপ বাবার কথা ও মিঃ ডি সিলভার অপমানকর কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ না পাওয়া ও টাকাপয়সার অভাবের কথা মনে হতে তারও মনে হল, সে যদি ঘুড়ির মত অনেক উঁচু আকাশে উঠে একসময় মাটির বাঁধন কাটিয়ে এমনি উধাও হয়ে যেতে পারত।

মন্দিরটা তেমন দেখার মত কিছু নয় — ইটে গাঁথা ছোট একটা ঘর, দেয়ালে কৃষ্ণ ও তার গরুগুলোর ছবি আঁকা। ভেতরে না গিয়ে খোলা জানলা দিয়ে সেগুলো দেখে হরির মনে পড়ল ওই রাখালটির কথা যাকে সে এইমাত্র দেখেছে — ভাবল, ও যদি কৃষ্ণের মত বাঁশি বাজাত বেশ হত। এখানে সবকিছু একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত, ছন্দে বাঁধা, কেবল সে-ই ছন্নছাড়া। তার নিরানন্দ, চিন্তাভাবনা, অস্থিরতা এইসব নিয়ে সে কারও সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থির হতে পারে না।

মনে মনে সে জানে একদিন-না-একদিন তাকে যেতেই হবে। থাল তাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না — অন্তত যে থালগ্রাম বলতে বোঝায় শুধু নারকেলগাছের সারি আর মাছধরা নৌকোর ঝাঁক। তবে এই জায়গাটা যদি সত্যিই একদিন কারখানায় রূপান্তরিত হয়, সে এখানে বাস করবে। নতুন ভাবে জীবন যাপন করবে। তা না হলে সে আর তার পরিবারের সবাই ধীরে ধীরে নিশ্চিত অনাহারের দিকে এগিয়ে যাবে, মার মত রুগ্ন হয়ে যাবে সবাই। তারপর মরে যাবে। এটা সে হতে দেবে না, চলে যাবে দূরে নৌকো করে সমুদ্রে পাড়ি দেবে, বোম্বাই গিয়ে কোনওভাবে সে তার ভাগ্য ফেরাবে, মিঃ ডি সিলভার সাহায্য নিক বা না নিক। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল তার।

হঠাৎই দেশলাই কাঠি জ্বালানোর শব্দে লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হরি দেখল একটা লোক সিগারেট মুখে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। হরি একে কোনদিন দেখেনি — রোগা কালো চেহারার লোকটির পরনে সাদা পাজামার সঙ্গে নীল জামা। লোকটি কৃষ্ণ মূর্তির দিকে চেয়ে ছিল। তারপর সে হরিকে দেখল। 'তুমি ওই গ্রামে থাকো?' ভুল দিকে ইশারা করে লোকটি জিগ্যেস করে।

'হ্যাঁ, থালের।' হরি আঙুল দিয়ে নারকেল ঝোপের দিকে দেখায়।

'আচ্ছা।' অচেনা লোকটি বলে। 'থালের কিছু লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'তুমি এখানে থাকো?' আগ্রহের সঙ্গে হরি শুধাল।

লোকটি উত্তর দিল না কিন্তু আঙুল দিয়ে নীচের ছোট চালাঘরটি দেখাল।

হরি সবিস্ময়ে বলল, 'ওইখানে? মানে, তুমি ওই কুঁড়ে ঘরে থাকো? তুমি-ই তাহলে বোম্বাই থেকে লরী নিয়ে এখানে এসেছিলে।'

হরিকে উত্তেজিত হয়ে জিগ্যেস করতে দেখে লোকটি মৃদু হেসে মাথা নাড়ে।

'তুমি তাহলে — তুমি তাহলে নিশ্চয় — নতুন কারখানা —'

'আমি কারখানা নই', বলে লোকটি হাসল, আসলে এখানে তো শুধু একটা কারখানা তৈরী হবে না। অনেকগুলো কারখানা নিয়ে গোটা একটা শহর গড়ে উঠবে এখানে। কারখানা, হাউসিং কলোনী, শপিং সেন্টার, বাস ডিপো, রেলের বড়কর্তা, ইঞ্জিনিয়ার, মজদুর — একটা পুরো শহর তৈরী হবে এখানে।'

'এখানে, থালে?' হরি বিস্মিত হয়, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না যেন।

'এইখানে — থাল থেকে শুরু হয়ে বৈশেত, বৈশেত থেকে রেওয়াস এবং রেওয়াস থেকে উড়ান পর্যন্ত,' লোকটি সগর্বে বলে, সে তার একটি আঙুল তুলে দেখায় নারকেলগাছ ঘেরা সমুদ্রের উপকূল এলাকার দিকে, তারপর আঙুলটা ঘুরিয়ে নিয়ে যায় হাইওয়ের দিকে, এবং শেষে আঙুল তোলে দূরে রেওয়াসের উপকূলের দিকে। 'নতুন থাল-বৈশেত ফারটিলাইজার কমপ্লেক্স' লোকটির গলার স্বরে যেন ঘন্টা বাজল।

'সেটা কী?' হরি জিগ্যেস করে। ও জানার জন্যে এত আগ্রহী হয়ে উঠেছে যে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতেও লজ্জা পেল না।

'ও, তুমি জানো না এটা কী? জানতে পারবে, শীগগীর জানতে পারবে।' লোকটির গলায় যেন অবজ্ঞার সুর।

'না, তুমি এখনই বল', হরি বলে, 'কারখানায় কী তৈরী হবে?'

'বললাম যে ফারটিলাইজার?' লোকটি অধৈর্য হয়ে বলে।

'সেটা কী?' হরি জিগ্যেস করে।

লোকটা এবার না হেসে পারল না, তবে গম্ভীর হয়েই হাসল। 'কেমিক্যাল্স,' এবারও এমন একটা শব্দ ব্যবহার করল যা হরি জানে না, 'নানা ধরনের কেমিক্যালস — নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া — যা মাটিতে দিলে নানা জিনিস ফলবে।'

'ওহ, সার?' হরি খুব হতাশ হয়ে বলে। এতবড় আধুনিক, বৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানা শুধু জমির সার তৈরীর জন্যে?

'সার নয় রে হাবা, এখানে আর লোককে গোরু-মোষ চরাতে দেওয়া হবে না, গোবর কুড়িয়ে জমিতেও দিতে দেওয়া হবে না। এখানে কারখানায় টন টন্ রাসায়নিক তৈরী করে সারাদেশে পাঠানো হবে, চাষীরা, মানে ধনী চাষীরা কিনবে।' হরির ছেঁড়া শার্ট ও খালি পায়ের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে লোকটি বলে। 'এই বিশাল জায়গায় — ব্যাপক চাষের জন্য রাসায়নিক তৈরী হবে, রাসায়নিকে তোমাদের এই জমিতে এত বেশি ফসল হবে যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

'আমরা তো নারকেল গাছের জন্য মাছের সার ব্যবহার করি', হরি লোকটিকে বলল, 'নারকেল গাছের পক্ষে এই সার খুবই ভাল।' তাদের গ্রামের সম্পর্কে যে বক্রোক্তি শুনেছে তার যেন জবাব দিতে চাইল সে।

'ফুঃ, কতটা মাছের সার তোমরা জোগাড় করতে পারো শুনি? এখানে কারখানায় হাজার হাজার টন তৈরী হবে, সারা ভারতে পাঠানো হবে, এমন কি বিদেশেও রপ্তানী হবে।'

'সত্যি?' হরি নরম হয়ে জবাব দেয়, সে একটা নতুন ধারণাকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে।

'নিশ্চয়ই। কারখানা তো একটা নয়, অনেকগুলো। শিল্পনগরী তৈরী হবে এখানে। বোম্বাইয়ের কাছে থানেতে যেটা রয়েছে তুমি কি দেখেছ?'

হরি দেখেনি, তাই সে শব্দ না করে শুধু মাথা নাড়ে।

'এটা তার চেয়েও বড় হবে। তুমি তার কি জান?' লোকটি হঠাৎ যেন রেগে ওঠে। তারপর সে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে হাঁটতে থাকে। জায়গাটা খাড়া হয়ে নেমে গেছে, তাই ওকে লাফিয়ে লাফিয়ে এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে পা রাখতে হচ্ছিল, লালচে নুড়িতে জুতো হড়কে যাচ্ছিল। খালি পায় হরি ওকে দ্রুত অনুসরণ করল, তখনও তার আগ্রহ মেটেনি, সে আরও জানতে চায়।

'আচ্ছা, এই সার কী করে তৈরী হবে?' সে জিগ্যেস করতে থাকে, 'মেশিনগুলো কী রকম দেখতে? সেগুলো তেলে চলবে, না কয়লায়? কারা চালাবে সেসব?'

'এ কাজের জন্য প্রচুর লোকের দরকার হবে', লোকটি পিছন ফিরে চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'নতুন রেললাইন পাতা হবে। নানা জায়গা থেকে থালে লোক আসবে কাজ করার জন্যে।'

'কোত্থেকে আসবে?' হরি চিৎকার করে জিগ্যেস করে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে, পাথরে পা রেখে রেখে নামতে থাকে, হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে।

'সব জায়গা থেকে, সারা ভারত থেকে লোক আসবে, তারা এখানে চাকরি পাবে', লোকটি চেঁচিয়ে বলে।

'আর আমরা?' লোকটিকে অনুসরণ করতে করতে হরি পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছয়, কাটা গাছের গোড়ায় লেগে তার পা কেটে গেছে।

'তোমরা?' লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হরির দিকে চেয়ে বলে, 'তোমরা কারখানায় কি কাজ করবে হে ছোকরা?'

'আমি শিখে নেব', হরি সাহস নিয়ে উত্তর দেয়, গলার স্বরকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে। 'আমি ঠিক শিখে নিতে পারব, আমার একটা কাজ চাই।'

সহসা লোকটি শান্ত হয়ে গেল, আর চিৎকার করে কিছু বলল না। তার চোখদুটোকে দয়ার্দ্র দেখাল। 'তাহলে তোমার একটা কাজ চাই, তাই তো? না খেয়ে আছো? বাড়িতে খাবার কিছু নেই? রুগ্ন মা, মাতাল বাবা, বোনেদের বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু টাকা নেই, তাই তো?'

হরি এতটাই বিস্মিত হল যে শ্বাস নিতেই ভুলে গেছে। এই অচেনা লোকটি কি করে তাদের পরিবারের কথা জানল? সে কি ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে? আর তাই বা নেবে কেন? হরির মধ্যে ও কি একজন কারখানার কর্মীর সন্ধান পেয়েছে? সত্যিই কি একটা কাজ দেবে লোকটা? খুব আস্তে আস্তে ফিসফিস করে সে শুধু বলল, 'তুমি জানলে কি করে?'

লোকটি তার চোখেমুখে পুনরায় অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'তোমরা, গাঁয়ের লোকেরা সবাই সমান। নির্বোধ লোকজন সব। তাড়ি খাও আর নারকেল গাছের নীচে সারাদিন মাতাল হয়ে পড়ে থাকো। মাছ ধরতে যাও, গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মরো। তখন সব সামলানোর দায়িত্ব ছেড়ে দাও মেয়েদের ওপরে। গাঁয়ে বুড়ি মেয়েমানুষ ও বাচ্চা-মেয়েরা না খেয়ে থাকছে। আর খচ্চরগুলো রাতে হৈ হল্লা করে। বাঃ, কী চমৎকার জায়গা তোমাদের এই থাল। যতসব মূর্খগুলো একজায়গায় জুটেছে। সবাই সমান। এখানকার কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচি।' লোকটি চারপাশে ছড়ানো পাইপগুলোর দিকে দেখিয়ে বলে। 'তারপর বাড়ি যাব, বোম্বাই, বুঝলে বোম্বাই।' সে দুহাত ওপরে তুলে গাইতে থাকল, তারপর নিজের কুটিরে ঢুকে গেল। দরজাটা জোরে ভেতর থেকে বন্ধ করল।

বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে হরি দাঁড়িয়ে রইল, অনেক প্রশ্ন তার মনের ভেতরে তৈরি হতে থাকল, কিন্তু বলতে পারল না। সে শুনল লোকটি ভেতরে কোন হিন্দী গানের সুর ভাঁজছে, কখনও জোরে কখনও আস্তে। তারপর দরজাটা খুলে গেল,

লোকটি গলা বাড়িয়ে চিৎকার করল, এই হাবা, এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছো? যাও এখান থেকে। কুমড়োমুখোদের আমি সহ্য করতে পারি না। কেমিক্যালস কী, কারখানা কী, ফারটিলাইজার কী কাজে লাগে এসব শিখে তারপর এসো।'

গ্রামের ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে হরি যখন ফিরে আসছিল, একটা সাইকেল দ্রুত তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। পাগলের মতো ঘন্টি বাজাতে বাজাতে রামু চলেছে। অস্বাভাবিক গতিতে সাইকেল চালাচ্ছে। যেতে যেতে পিছন ফিরে চিৎকার করে বলে, 'শুনেছিস, বিজুর ডিপ-ফ্রিজ এসে গেছে? বোম্বাই থেকে লরি করে আজই এল।'

রামু চলে যায়, দেখেও না যে হরি মাথা নেড়েছে। আসলে সে বৃদ্ধ বিজুর স্মাগলিং-এর নৌকো সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়েছে। নৌকোটা সমুদ্রে গিয়ে মৌসুমী ঝড়ে ডুববে। ডিপ-ফ্রিজ তলিয়ে যাবে সমুদ্রের একেবারে নীচে। হরির মাথায় এখন নতুন কারখানাগুলোর ছবি ঘুরছে — লম্বা লম্বা চিমনী। অদ্ভুত গন্ধময় ধোঁয়া আকাশে উঠছে মেঘের মত, বড় বড় ফটকের মধ্যে দিয়ে পিঁপড়ের মত লোকজন ঢুকছে, আর তাদের মধ্যে খাকি প্যান্ট ও ছেঁড়া জামা গায়ে একটি ছেলে, সে নিজে।

নারকেলগাছগুলোর ভেতরের রাস্তায় হরি যখন উঠল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পিন্টো চিৎকার করে তার দিকে এল। হরি তার গায়ে হাত দিল না। কথাও বলল না, তবু সে পাশে পাশে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল। হরি দেখল তাদের কুটিরে একটা ছোট আলো জ্বলছে। আলোটি প্রদীপের মত, আর তার পাশে তার তিনবোন ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে।

খালের ওপরকার গাছের গুঁড়িটায় পা রাখতে রাখতে হরি তাদের দিকে চেয়ে দেখল। অন্ধকারে থাকায় ওরা ওকে দেখতে পেল না, ওরা জানেও না হরি এখানে আছে। ওদের মাথা ঝুঁকে ছিল, কেউ কথা বলছিল না, অল্প আলোয় শুধু তাদের অস্পষ্ট চেহারাগুলো দেখা যাচ্ছিল। আধা অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকা ওদের প্রত্যেককেই যেন ভীত ক্লান্ত ও হতাশ দেখাচ্ছিল।

লীলা, বেলা ও কমল। হরি কত কম ভেবেছে ওদের কথা, ওদের জীবন সম্পর্কে, কারণ ওরা সবাই এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করছে এই ছোট্ট কুটিরে যে একই ধরনের জীবন ওদের সবারই। এই জীবন এত কঠিন যে সারাক্ষণ তাকে ব্যস্ত রেখেছে, এই জীবন থেকে সে কখনো ওদের আলাদা করে, আলাদা মানুষ হিসেবে দেখেনি। লীলা, বেলা ও কমল তার তিন বোন — লীলা ওর বড়, অন্য দুজন ছোট। সে যখন বাড়ির বাইরে ছিল তখন এখানে সুখ দেওয়ার মত কিছুই ছিল না ওদের, শুধু এই ধোঁয়া ওঠা আগুনের আলোটুকু ছাড়া।

কীসের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা? কীসের আশায় বসে আছে অমনভাবে?

ওরা তো হরির মত কখনও মাছধরা নৌকোর কাজ বা কারখানায় কাজ চায়নি। ওদের বিয়ে দিতে হবে একদিন, আর এ কাজের দায়িত্ব ওকেই নিতে হবে, কেননা বাবা কিছুই করবে না। ওদের জন্যে বর ওকেই খুঁজতে হবে, ওকেই কিনে দিতে হবে বিয়ের জিনিসপত্র, সিল্কের শাড়ি, সোনার গয়না — এবং বিয়ের আয়োজন সেই করবে যেখানে সারা গ্রাম নিমন্ত্রিত হবে। বরপক্ষ নিশ্চয় পণ চাইবে — সাইকেল কিংবা একটা স্কুটার, সোনার বোতাম, টাকা ও অলঙ্কার। একটা গরু কিংবা একটা মোষ, একটুকরো জমি। সে বরপক্ষের অস্বাভাবিক দাবির কথা শুনেছে এবং মেয়ের বাবাকে তা মেটাতে হয়। কিন্তু সে কিভাবে এসব দাবি মেটাবে? সে যদি একটা চাকরিও পায়, তবু সে এইসব জিনিসপত্র কেনার মত টাকা রোজগার করতে পারবে না। গ্রামের মহাজনের কাছ থেকে সে ধার করতে পারে টাকা, তারপর সে মাইনের টাকা থেকে অল্প অল্প করে শোধ করবে অনেক বছর ধরে, হয়তো সারাজীবন আর তা সে করতে পারবে যদি সে রোজগার করে, যদি একটা চাকরি পায়। যে অন্ধকার, বিষণ্ণ পরিবেশ, অসুস্থতা, মাতলামি আর হতাশা রাতের ছায়ার মত তার বোনদের ঘিরে আছে, তা থেকে তাদের বাইরে নিয়ে যেতে হলে একটা কাজ তাকে পেতেই হবে।

সে জানে এই থাল গ্রামে থেকে সে কখনও এত রোজগার করতে পারবেনা যা দিয়ে তাদের গোটা পরিবারের চলবে। বোম্বাই তাকে যেতেই হবে। বোম্বাই বড় শহর, ধনীদের শহর, এই শহরে যারা বাস করে তাদের সবার কাজ আছে, তারা রোজগার করে ও ভাগ্য ফেরায়। যে কোন ভাবে তাকে সেখানে পৌঁছতে হবে। কিন্তু কীভাবে এবং কখন তা এখনও তার কাছে স্পষ্ট নয়।

সে কুটিরে ঢোকে, লাফিয়ে আগে ঢুকে যায় পিন্টো। সবাই ওর দিকে তাকায়। ওদের বিষণ্ণ ভীত মুখ দেখে কাঁদো কাঁদো হয়ে জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে?'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাপারটা মাকে নিয়ে। মাকে আজ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। সকাল বেলায় লীলা যখন চা দিতে ঢুকেছিল তখনই দেখেছিল মা মাথা তুলে চায়ে চুমুক দিতে পারছিল না। লীলা যখন মাথার নীচে হাত দিয়ে মাথাটা কিছুটা তুলে ধরেছিল তখনই সে টের পায় জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছিল যেন। 'মা' বলে ডাকতেই চোখের পাতা নড়েছিল কিন্তু চোখ খোলেনি, হাসে নি। 'বেলা, কমল', লীলা ডেকেছিল বোনেদের। ওরা এলে মাটির কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল আর এক টুকরো কাপড় আনতে বলেছিল। তারপর জলে ভেজানো কাপড়ের পট্টি মার কপালে লাগিয়ে দিয়েছিল, মার অবশ হাতখানা ধরে বসেছিল বিছানার পাশে।

'কী হয়েছে?' বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে ওরা জিগ্যেস করেছিল। স্কুলে যাওয়ার জন্য ওরা তৈরি হয়েছিল কিন্তু মার বিছানা থেকে সরতে চাইছিল না।

'মার জ্বর হয়েছে', লীলা বিড়বিড় করে উত্তর দিয়েছিল, 'খুব জ্বর, যা গিয়ে বল — গিয়ে বল —'

'কাকে?'

'কি?'

নিজের ঠোঁট কামড়ে লীলা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণ পর কাঁপা গলায় কথা বলে নিজেকে সংযত করেছিল। 'গিয়ে দ্যাখ হরিকে মাঠে পাওয়া যায় কিনা। ওকে বল গ্রামে গিয়ে ডাক্তারকে ডাকতে — না থাক, ওখানে কোন ডাক্তার নেই।'

'ওকে আলিবাগ যেতে বলব?' বেলা উদ্বিগ্ন হয়ে ফিসফিস করে জিগ্যেস করে।

'না দরকার নেই, আলিবাগ থেকে কোন ডাক্তার এতদূরে আসবে না।' লীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলেছিল, 'বেলা, তুই খানেকারদের বাড়ি যা, গিয়ে হীরাবাইকে আসতে বল, না হয় ডাক্তার পাঠাতে বল, ও ডাক্তারদের চেনে। নিজেও শেকড়-বাকড় দিয়ে অসুখ সারায়। হয়তো ও নিজেই আসবে।'

'কিন্তু —' বেলা বলেছিল।

'সবাই যদি — ধরো, তাহলে?' কমল ঘরের কোণে পড়ে থাকা মাতাল বাবার দিকে তাকিয়ে বলার চেষ্টা করেছিল।

'তোকে যেতেই হবে। বেটাছেলেদের কিছু বলিস না, সোজা হীরাবাইয়ের কাছে যাবি।'

'হীরাবাইও তো মদ খায়, তুমি জানো?'

'সে সবসময় নয়,' লীলা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, 'যা গিয়ে তো দ্যাখ।'

মেয়েদুটো আর কথা না বাড়িয়ে দৌড় লাগিয়েছিল। খালটা পেরোতেই লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে পিন্টো ছুটে এল, চিৎকার করল ওদেরকে দেখার আনন্দে। পাথরের ওপর কুঁজো হয়ে বসে একটা বক জলার দিকে তাকিয়েছিল। পিন্টোর চিৎকারে ভয় পেয়ে ধূসর-বাদামি ডানা মেলে উড়ে গিয়ে বসল কেতকী ঝোপের মাথায় আর যে-সব পাখি ছিল তারাও চঞ্চল হয়ে উঠল, কেউ ডাকল, কেউ উড়ে গেল — কোন একটা পাখি লুকিয়ে থেকে কুপ-কুপ-কুপ শব্দ করে যেন অন্যদের সতর্ক করছে, এক জোড়া ফিঙ্গে শোঁ করে সূর্যের আলোয় উড়ে গেল। ভিন্দি গাছ থেকে কয়েকটা হলুদ ফুল ঝরে পড়ল ওদের মাথায়।

বেলা ও কমল নীচু ডালপালা ছড়ানো ভিন্দি গাছের নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় মাথা নীচু করে পেরোল। তারপর তাদের কুটির ও প্রতিবেশীদের বাগানের মাঝখানের ঝোপটা পেরোবার চেষ্টা করল। হঠাৎ কমলকে রক্ষা করার ভঙ্গিতে হাত ধরে টেনে থমকে দাঁড়াল বেলা। তারপর লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ল, 'ওহ্, শুধুই খোলস।' কমল দেখল, একটা ছয়ফুট লম্বা সাপের খোলস স্পাইডার লিলির ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে, একেবারে বেলার পায়ের কাছে। বাতাস লেগে খোলসটা নড়ছিল, আর একদম জ্যান্ত মনে হচ্ছিল — মুখটা খোলা, এমনকি চোখের ফুটো দুটোও দেখা যাচ্ছিল। এত নিখুঁত ছিল খোলসটা। এটা খোলসই, সম্ভবত আগের রাতেই ছেড়েছে। ওরা হাত ধরে খানেকারদের বাড়ির দিকে দ্রুত এগোল।

একটা বড়সড় জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরি খানেকারদের বাড়ি। বাড়ির চারপাশে সব্জির চাষ হয়, সব্জির লতা ওদের মাটির দেওয়ালের গা ঘেঁসে ওপরে উঠেছে। আঙুর গাছ খড়ের চাল বেয়ে ওপরে উঠেছে। উঠোনে এখানে-ওখানে ছড়ানো জ্বালানি কাঠ, কঁক কঁক শব্দ করে মুরগি ঘুরছে, কয়েকটা পুরনো নোংরা কাপড় ঝোপের ওপর শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সারা বাড়িটায় অপরিচ্ছন্নতা ও অবহেলার ছাপ। একসময় এদের পানপাতার বরোজ ছিল, কলার চাষ হত, মুরগি খামার ছিল, আর ছিল একটা পুকুর যেখানে মাছ ছাড়া হত। কিন্তু তিন ভাই, উত্তরাধিকার সূত্রে যারা জমির মালিক হয়েছিল, তারা কেউ চাষবাস বা মাছচাষে মনোযোগী ছিল না, ফলে ওদের বাবা মারা যেতেই ওরা কাজকাম একেবারে বন্ধ

করে ঘরে তৈরী তাড়ি খেয়েছে, যেটুকু তাড়ি অবশিষ্ট থেকেছে তা বিক্রি করেছে অন্য মদ্যপায়ীদের কাছে। ওদের বৌরা ওদের পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে অন্য গ্রামে। শুধু ওদের বৃদ্ধা মা হীরা-বাই আছে ওদের দেখার জন্য। হীরাও তাড়ি খেতে ভালোবাসে।

যাইহোক, ছোট মেয়েদুটো দেখে স্বস্তিও পেল যে হীরা-বাই বাড়ির বাইরে একটা দড়ির খাটে পায়ের ওপর পা রেখে বসে সুন্দরভাবে সুপারি কেটে কেটে পাশের বড় বাক্সে রাখছে। সারাদিন পান-সুপারি চিবানোর জন্যে তার মুখ গাঢ় লাল হয়ে আছে। ওদের দেখে অবাক হয়ে তার লাল মুখটা হাঁ হয়ে গেল। সে চটকরে তার বেগুনী রঙের শাড়িটা ঠিকঠাক করে মাথায় জড়িয়ে নিল। বাইরের কেউ এলে মহিলারা এটাই করে থাকে।

'আরে বেলা, কমল যে! কী ব্যাপার? সাতসকালে বাবা তাড়ি আনতে পাঠিয়েছে বুঝি?' সে জোরে জোরে বলে। তারপর অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। তা শুনে বাড়ির ভেতর থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, মা?'

বেলা ও কমল ওর থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কমল একটা পা আর একটা পায়ের ওপর বাঁকিয়ে রেখে মুখের ওপর আঙুল রাখল। বেলাও তাই করল।

হীরা খিক খিক করে হাসল। 'বলতে চাস না, না? তাড়ি চাইতে পারছিস না, না! লজ্জার কী আছে, সবাই জানে পুরুষরা ওই রকম! তোরা জানিস, আমিও জানি, এতে সঙ্কোচের কী আছে?'

কথা না বলে ওরা মাথা ঝাঁকাল।

'বলিস কি? সত্যিই তাড়ি চাস না? তাহলে কী চাস? তাড়ির জন্যে টাকা চাই?'

এবার আরও জোরে ওরা মাথা নাড়ল।

'তাড়ির টাকাও নয়? তাহলে মা পাঠিয়েছে বুঝি? চাল কেনার টাকা, না চা কেনার টাকা? বাড়িতে চাল নেই? দেখ মেয়েরা, কিছু চাওয়ার আগে আমি বাপু সাবধান করে দিই —'

হঠাৎ বেলা আর সহ্য করতে পারল না। কমলের কাছ থেকে কয়েকটা পা এগিয়ে এসে মোটা গলায় তাড়াতাড়ি বলল, 'আমরা টাকা চাইতে আসিনি, চালও দরকার নেই, কিছুই চাইতে আসিনি। মার খুব অসুখ, দিদি পাঠিয়েছে তোমাকে বলতে যে তুমি যদি —'

'অসুখ?' বৃদ্ধা বেলার দিকে চাইল, এখন আর হাসছে না, 'আমি জানি তোর মার অসুখ। তার তো অসুখ লেগেই থাকে। অবস্থা কি আরো খারাপ হয়েছে?'

বেলা ঘন ঘন মাথা নাড়ল, এখন খুব জ্বর, কিন্তু বাড়িতে ওষুধ নেই। মাকে দেখাবার জন্য একজন ডাক্তার ডাকতে পারবে?'

বৃদ্ধা আবার যাঁতি দিয়ে সুপারি কাটতে শুরু করল। নিজের মনেই কিছু বলছিল সে। তারপর হাতদুটোকে বন্ধ রেখে সম্পূর্ণ অন্য গলায় বলল, 'ব্যাপারটা হল কী, গরুর গলায় ঘন্টা ঝুলিয়ে ড্রাম বাজাতে বাজাতে যে বুড়ো লোকটা আসে, আজ সকালেই সে এসেছিল — এখনও খুব বেশি দূর যেতে পারেনি হয়ত। আমি খবর পাঠালে ও ফিরে আসবে। তারপর ওকে তোদের ওখানে পাঠিয়ে দেব। ওর কাছে নানা কবিরাজি গাছ গাছড়া, শিকড়বাকড় থাকে। তোরা যা, গিয়ে লীলাকে বল।' এত উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে সে কথাগুলো বলে যে মাথা থেকে তার শাড়িটা খসে পড়ে, মেহেদি দিয়ে রং করা তার ধূসর চুলগুলো দেখা দেয়।

বেলা ও কমল চলে আসে, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে পথ করে নিজেদের কুটিরের দিকে ফেরে। খালের ধারে পৌঁছনোর আগেই ওরা একটা গোঙানি শোনে। সামনে তাকিয়ে দেখে পিন্টো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে, লেজটা দুপায়ের ফাঁকে, কান দুটো সোজা। বুড়িটা অথবা বাড়ির অন্য কেউ ওকে পাথর কিম্বা নারকেল ছুঁড়ে মেরেছে, পায়ে চোট লেগেছে। পিন্টো কেঁউ কেঁউ করতে করতে তাদের কাছে এল। যাতে আর কেউ ওকে পাথর ছুঁড়ে না মারে তাই পিন্টোকে নিয়ে ওরা তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে।

বাড়িতে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। লীলা বোনেদের স্কুলের কথাও তোলেনি। অতি নিঃশব্দে, টুঁ-শব্দটি না করে ঘরের কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে মাকে দেখে এসেছে। বোনেরা কুটিরের বাইরে নিঃশব্দে খেলা করেছে — বালির ওপর নানা ছবি ও নকসা এঁকেছে, ফুলের পাপড়ি দিয়ে সেগুলো সাজিয়েছে। মাঝে মাঝেই লীলা ওদের নানা ফরমাস করেছে, ওরা সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ করে দিয়েছে — কুয়ো থেকে জল এনে দিয়েছে, চায়ের বাসন মেজেছে, ভাতের চাল পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়েছে ও জ্বালানির জন্যে ঝোপঝাড় থেকে শুকনো ডালপালা জোগাড় করে এনে দিয়েছে।

একসময় তারা ড্রাম বাজানোর শব্দ শুনতে পেল, সেইসঙ্গে শিঙার ভয়-ধরানো দীর্ঘ আওয়াজ। এর অর্থ হল ওষুধওয়ালা কাছাকাছি এসেছে। ছোট বেঁটে গরুটি এল আগে আগে, তার গায়ে সেলাইয়ের কাজ করা কাপড়, আর গলায় পরানো পুঁতির মালা। ওরা লোকটিকে প্রায়ই দেখেছে এদিকে ঘুরতে — বাণ্ডিল বাণ্ডিল ঘাস সে লোকজনকে দেয়, পয়সা দিয়ে সেগুলো কিনে লোকেরা তা আবার গরুটাকেই খাইয়ে দেয়। গরুকে খাওয়ানো হল পুণ্যের কাজ, তাই পয়সা খরচ করেও লোকেরা খুশি মনে সে পুণ্য-সঞ্চয় করত। এতে লোকটির আয় হত, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না বলে সে পবিত্র গোমাতাকে গ্রামে ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে সংগ্রহ-করা জড়িবুটি বিক্রির কাজও করত। লোকটির চেহারায় তীক্ষ্ণতা ছিল। সে সঙ্গে রাখত ওষুধ হিসেবে নানা ধরনের গুঁড়ো ও প্যাকেটে মোড়া বড়ি। এসব সে

তার সাদা ধুতি ও গোলাপি রঙের পাগাড়ের ভাঁজে ভাঁজে রেখে দিত। এসব দিয়ে গ্রামের লোকেদের ফোঁড়া, ব্যাথাবেদনা ও জ্বরের চিকিৎসা করত। যারা খুব বেশি অসুস্থ, তার গুঁড়ো ওষুধে যাদের কাজ হত না, যাদের মাথার গোলমাল, অসুখী ও যারা মৃত্যুশয্যায় তাদের জন্য সে বিশেষ পুজো দেওয়ারও ব্যবস্থা করত। এর ফলে তার সম্পর্কে একজন যাদুকর বা ওঝার ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল — এ কারণে ছোট মেয়েদুটো ওকে আসতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠল।

খালের ওপরকার কাঠের গুঁড়িটা পার হবার সময় তার হাতদুটো ওপরে তোলা ছিল, এইসময় সে জোরে আর একবার তার হাড়ের তৈরি শিঙায় ফুঁ দিল।

হাড়ের তৈরি শিঙাটা সম্পর্কে মেয়েদের মনে একটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। হাড়টা কিসের তা তারা জানত না।

লীলা ছুটে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। বেলা ও কমল পিন্টোকে জড়িয়ে ধরল যাতে সে পবিত্র গাভিটিকে আক্রমণ না করতে পারে। ওদের ইচ্ছা হচ্ছিল কাছে গিয়ে বেঁটে প্রাণীটিকে খুঁটিয়ে দেখে, কিন্তু লীলার কথামত পিন্টোকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হল যাতে লীলা লোকটির সঙ্গে কথা বলতে পারে।

'আমার মা অসুস্থ, অনেকদিন ধরেই অসুস্থ আছে। এখন জ্বরও হয়েছে। আপনার কাছে জ্বরের ওষুধ আছে? আপনার কাছে, এমন কোন ওষুধ আছে যা দিয়ে ওঁর গায়ে শক্তি আসে? বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে!' লীলা বিস্তারিত বলতে থাকে।

'আস্তে মা, আস্তে, এত তাড়া কিসের? প্রথমে আমি আমার গরুকে জল খাওয়াব, কুয়োর টাটকা জল চাই। তারপর তাকে ঘাস খাওয়াতে হবে, সতেজ নরম ঘাস চাই। তারপর আমি তোমার মাকে দেখব।'

সুতরাং এইসব ব্যবস্থা আগে করা দরকার। গরুর দেখাশোনা করা হলে পর তার দিকেও নজর দিতে হবে। লীলাকে চা তৈরি করতে হল। লোকটি গাছের নীচে দড়ির চারপেয়েতে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল যখন, মেয়েরা তার সামনে দাঁড়িয়ে তখন বলে যাচ্ছিল কিভাবে তাদের মা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছে, কিছু খাচ্ছে না, এখন উঠতেও পারছে না আদৌ। 'এখন তাঁর জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে', লীলা হঠাৎ কেঁদে উঠল, আর শান্ত হয়ে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

লোকটি তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ দিয়ে লীলার দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল ও ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওরা অবাক হল দেখে যে লোকটি একবারও ঘরে গিয়ে ওদের মাকে দেখল না, যা ওরা আশা করেছিল। পরিবর্তে আদেশ দিল ঘরের চৌকাঠের সামনে আগুন জ্বালাতে। এর জন্য নির্দিষ্ট কাঠ দরকার। ডালগুলোকে কেমনভাবে আগুনে দেওয়া হবে তাও বলে দিল। একসময় ধোঁয়া করে কাঠ পুড়তে থাকল। লোকটি তখন গরুর পিঠের ঝুলি থেকে ফুল বের করে আগুনে ফেলে দিল — যুঁই, গাঁদা, জবা ইত্যাদি ফুল। সুর করে সে সংস্কৃতে মন্ত্র পড়ল যখন আগুন জ্বলছিল। মেয়েরা আগুনের পাশে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে ছিল। আগুন যখন নিভে গেল, লোকটি তখন একটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দিল যাতে ছাইগুলো ছড়িয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তারপর সে দুহাত জড়ো করে হাতে ছাই নিয়ে জল চাইল। বালতিতে জল এলে সামান্য জল সে ঢালল হাতের তালুতে আর অন্য একটা হাতের বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুল দিয়ে জল মিশিয়ে দিল ছাইয়ের সঙ্গে। এবার সে ভিতরে গেল ওদের মাকে দেখতে।

চোখ বন্ধ করে কাত হয়ে শুয়ে আছে রুগী। লোকটি যখন ডাকল, সে পাশ ফিরে ভয়ে চোখ খুলল। লীলা মার কপালে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনার কথা শোনাতে থাকল। লোকটি মাকে মুখ খুলে জিভ বের করতে বলল, সে তাই করল। লোকটি তার জিভে কিছু ছাই দিয়ে বলল, 'খাও বোন, পবিত্র ছাই, মন্ত্রপড়া ছাই। তোমার ভেতরটাও পবিত্র করবে। যে অসুর ভেতরে ঢুকে জ্বর বাধাচ্ছে তাকে তাড়িয়ে দেবে। গিলে ফেল।' সে ছাইয়ের ছোট ছোট বড়ি বানিয়ে আঙুলে করে মার মুখে ফেলে দেয়। তারপর দুহাত জোড়া করে জোরে জোরে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ ক'রে ঘরের বাইরে আসে।

মেয়েরা হতবুদ্ধির মত তাকে অনুসরণ করে বাইরে আসে।

'সমস্ত ছাই ঝাঁট দিয়ে জড়ো কর, তারপর আমার কাছে নিয়ে এস।' ওরা আদেশমত কাজ করে। লোকটি ঝুলি থেকে কয়েকটা পাতা বের করল। সেগুলোকে নতুন প্যাকেটে করে দড়ি দিয়ে বাঁধল। 'এই নাও' বলে মেয়েদের হাতে দিল। 'প্যাকেটটা ওঁর বালিশের নীচে রেখে এস, এটা জ্বরের অসুরকে তাড়িয়ে দেবে। অন্য প্যাকেটগুলো তোমাদের নিজেদের বালিশের নীচে রাখবে, ওসুরদের হাত থেকে তোমরা রক্ষা পাবে। আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি। হরি ওম, হরি ওম, হরি ওম।' হঠাৎ থেমে গিয়ে তুলে নিল তার শিঙা, খুব জোরে ফুঁ দিয়ে অনেকক্ষণ বাজাল। খুঁটিতে বাঁধা অবস্থাতেই পিন্টো ক্ষিপ্ত হয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকল।

শিঙাটা নামিয়ে লোকটা ওদের মুখের দিকে তাকাল। ওকে খুব ক্রুদ্ধ মনে হল। ওরা লক্ষ করল লোকটির ছোট খোঁচা খোঁচা গোঁফ, গোঁফে তামাকের দাগ। 'এবার' ওদের দিকে চেয়ে সে হুঙ্কার ছাড়ল। 'এবার কী করবে তোমরা? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে? কিছু দিতে হবে না বুঝি? শুধু তাকিয়ে থাকলেই আমার পেট ভরবে ভেবেছ? তোমরা কি ভাব আমি মুফতে এসব করে বেড়াই?'

লীলা অপরাধবোধ থেকে মাথা নাড়ল ও দ্রুত কুটিরে ঢুকল। বেলা ও কমল ওর কষ্টটা বুঝল। কেননা ওরা জানে দেওয়ার মত কোন টাকা নেই। তবু লীলা কিছু একটা হাতে করে বেরিয়ে এল এবং যখন সে ওটা দিল তখন ওরা দেখল মার আঙটি ওটা, সুস্থ থাকার সময় পরত, আর অসুখের পর ওটা খুলে তাকের আয়নার পিছনে রেখেছিল। আঙটিটা রুপোর — একটু বেঁকে গেছে, কালোও হয়েছে, তবুতো রুপোর জিনিস, বোনেরা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। কিন্তু লোকটি লীলার হাত থেকে ওটিকে প্রায় কেড়ে নেওয়ার মত করে নিয়ে নিল। আঙটিটা দেখল প্রথমে তারপর ওদের সবার দিকে তাকিয়ে পকেটে চালান করে দিল। কোন ধন্যবাদ না জানিয়েই নিজের গরুটির দিকে এগোল।

গরুটিকে সঙ্গে নিয়ে লোকটি বাড়ির বাইরে পা বাড়াল। একবার ড্রাম থেকে অদ্ভুত শব্দ বের করে আর একবার ফুঁ দিয়ে শিঙা বাজায়, আর 'হরি ওম, হরি

ওম' ধ্বনি ছুড়ে দেয় আকাশের দিকে। আশেপাশের পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে যায় শব্দ করে ও ওপরে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না ওইসব শব্দ স্তব্ধ হয়।

মেয়েরা তাদের হাতে পাতার মোড়ক গুলোর দিকে চেয়ে থাকল।

'এগুলো নিয়ে কী করব?' বেলা ও কমল জিগ্যেস করল।

নীলা নিজের হাতের মোড়কটিকে এমন শক্ত করে খিমচে ধরল যেন সে ওটাকে ছিঁড়ে ফেলবে বা ছুঁড়ে ফেলে দেবে এখুনি। 'কী করব এখন?' সে কেঁদে ফেলে, 'কিছুই তো করার নেই এখন — ওর কথা তাই শুনতে হবে। গ্রামে হাসপাতাল নেই যে মাকে নিয়ে যাব সেখানে, কোন ডাক্তারও আসবে না। ওই যাদুকর লোকটা ছাড়া কে আছে যে আমাদের সাহায্য করবে? যাদু!' তীব্র স্বরে কথাগুলো বলে সে কুটিরের ভেতরে চলে যায় — লোকটি যেভাবে বলে গেছে সেভাবেই সব করতে হবে তাকে।

এইসব ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মেয়েরা খুবই ভীত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দিনটা ছিল যেন অভিশপ্ত — ওদের জন্যে আরো আঘাত ও ভয় অপেক্ষা করছিল।

বিকেল বেলায় ঠাণ্ডা মেঝেয় ওরা যখন মাদুর পেতে শুয়েছিল, তন্দ্রা মত এসেছিল, তখনই পিন্টোর হঠাৎ চিৎকারের শব্দে ওরা জেগে যায়। ইতিমধ্যে এলাকার আরো অনেক কুকুর একসঙ্গে ডাকতে শুরু করেছে। কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেছিল — পিন্টোকে থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু বাইরের কুকুরগুলোর চিৎকার ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। পিন্টোও এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে কমল ওকে ধরে রাখতে পারল না, সে তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ও পেছন পেছন গেল আর জীর্ণ তালপাতায় ছাওয়া বারান্দায় দাঁড়াল, চারদিকে তখন অপরাহ্নের চোখ ধাঁধানো রোদের দীপ্তি।

একদল লোক, ছেলেরাও আছে, কুকুর সঙ্গে নিয়ে খালের ধারের ঝোপঝাড়ে ঘুরছিল। বন মুরগি, বক, মাছরাঙা ইত্যাদি শান্ত পাখিরা খালের ধার ছেড়ে উড়ে গেল। লোকগুলো গাছপালা মাড়িয়ে যাচ্ছিল, ঝাউ গাছের সরু ডালগুলো ভেঙে দিচ্ছিল, আর সঙ্গের লাঠি দিয়ে হৈ হৈ করে নলখাগড়া ও বড় ঘাসের ওপর বাড়ি মারছিল — মনে হচ্ছিল যেন প্রাচীনকালের গুহামানব শিকারে বেরিয়েছে। দোআঁশলা কুকুরগুলো যাদের এতদিন পর্যন্ত বীচের ওপর শুয়ে শুয়ে হাই তোলা ছাড়া কোন কাজ ছিলনা, উত্তেজিত হয়ে সেগুলোও চিৎকার করছিল। মাত্র একবারই তারা লাঠির বাড়ি ও তাড়া খাওয়ার বদলে নিজেরাই শিকারের সঙ্গী হয়েছে।

'ওরা কী করছে?' বেলা ফিসফিস করে জিগ্যেস করল। সেও বোনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দেখার জন্যে।

'জানি না।' কমলও ফিসফিস করে উত্তর দিল। 'যা চিৎকার করছে তাতে মনে হচ্ছে একটা হাতি কিম্বা মানুষ-খেকো ঢুকেছে। তবে কেউটে সাপও হতে পারে।'

বেলা ভয়ে কেঁপে উঠল, তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা আঙুল যেন ওপরে উঠে গেল।

'পিন্টোকে দ্যাখ', হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'পিন্টোও ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ধর ওকে।'

কমল তাই শুনে ছুটল কুকুরের পেছনে — লাঠি ও পাথর ছোড়ার ইচ্ছে ছিলনা, আবার এটাও চায়নি যে ঘেউ ঘেউ করতে থাকা কুকুরগুলো তার দিকে ছুটে আসুক। পিন্টোর কাছে গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন খালের ধারের ছোট গাছগুলো সব পায়ের চাপে থেঁতলে গেছে। সবুজের ওপর কাদামাখা পায়ের ছাপ লেগে আছে, আর লোকগুলো একটা কেয়া ঝোপকে ঘিরে হৈ-হল্লা করছে। শব্দ করে লাঠির আঘাত করছিল ওরা কেয়া ঝোপের ওপরে, আর উন্মত্ত কুকুরগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল ঝোপের গায়ে।

এই ভীতিপ্রদ দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও কমল কৌতূহল দমন করতে পারল না। সে একজন বৃদ্ধমত লোককে জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি? ওরা কি ধরছে?'

'দেখ, দেখ', লোকটা হেসে ঝোপের দিকে আঙুল দেখাল যেখানে ছোট্ট একটা প্রাণীকে কুকুরগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছিল। লোকগুলো তখন সেটিকে কুকুরদের মুখ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা খুটির ওপর টাঙিয়ে রাখল।

'ইস', কমলের মুখে দুঃখসূচক শব্দ, তার হাতদুটো জোড়া করা প্রায় কেঁদে ফেলার মত করে বলল, 'এটাতো একটা ছোট বেজি।'

বুড়ো লোকটা তার দিকে হলুদ চোখে তাকাল, তারপর বলল 'এটা খারাপ' — খুব খারাপ প্রাণী, এটি আমাদের নারকেলের ভিতরকার জল খেয়ে নেয়। ডাবগুলো যখন সবুজ হয়ে ওঠে, এটা তখন গাছে উঠে পড়ে। ডাবের গায়ে ছোট্ট ফুটো করে দিয়ে সব মিষ্টি জলটুকু খেয়ে নেয়, ডাবটা তখন শুকিয়ে মাটিতে পড়ে যায়।' নিজের উরুতে একটা থাপ্পড় মেরে ছুটল লোকগুলোর দিকে। সেও বেজিটাকে ধরে মেরে ফেলার আনন্দে যোগ দেবে।

মনমরা হয়ে কমল পিন্টোর গলা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল খালের পাড়ে। বেচারা, অসহায়, ছোট্ট বেজি — কমল বিশ্বাস করতে পারছিল না, ওটি এত সাংঘাতিক খারাপ কাজ করতে পারে, নিশ্চয় কোন ভুল হচ্ছে। আর ওটা যদি সত্যি ডাবের জল খেয়ে নিয়ে নারকেল নষ্ট করে দেয়, তাহলেও কি এতগুলো লোকের লাঠি ও ক্ষিপ্ত কুকুরের দল নিয়ে তাকে খুঁজতে বেরনো ঠিক হয়েছে? ছোট প্রাণিটিকে ওরা যেভাবে হিংস্রতার সঙ্গে মেরে ফেলল, তাতে কমল খুবই ভয় পেল।

বেলা যখন রাস্তা দিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে লোকগুলো ও কুকুরের দলটিকে দেখার চেষ্টা করল, কমল তখন বাড়ির দিকে পা বাড়াল। 'আয় পিন্টো, চলে আয়।' পিন্টোকে করুণসুরে ডাকল সে, তার চোখে তখন জল।

সেদিনই সন্ধ্যা বেলায় — হরি তখনও ফেরেনি, আর বাবাও বেরিয়ে গেছে —মেয়েরা মায়ের দরজার পাশে বসে, জ্বর তখনও কমছে না কেন তাই নিয়ে ভাবছিল। এমন সময় ওরা পাশের বাড়ির মাতাল তিনভাইদের একজনকে দেখতে পেল। এলোমেলোভাবে পা পড়ছিল তার, চুল অগোছাল, চোখদুটো লাল — দেখেই বোঝা যাচ্ছিল গোধূলির আলো দূর না হতেই সে মদ খেয়েছে। সমুদ্রের ওপর তখনও রুপালী রং, শান্ত ঢেউ, এ সময় গ্রামের লোকদের মদ খাওয়া শুরু হয়। কিন্তু এই লোকটি নিজেই তাড়ি তৈরি করে, সে নিশ্চয় সারাদিন মদ খেয়ে বাড়িতেই পড়েছিল। লীলা জানত, তাই সে ভয় পেল।

'ওহ্ তুই, বদমাস লোকটার মেয়ে।' সে লীলার দিকে হুঙ্কার ছাড়ল। তখনও সে খালের ওপর গাছের গুঁড়িটির ওপর দাঁড়িয়ে — পা টলছিল। 'তোর বাবা কোথায়, এ্যাঁ? সেই বদমাসটা?'

'বাবা? সে-সে তো বেরিয়ে গেছে।' লীলা জবাব দিল।

'বেরিয়ে গেছে, না বৌয়ের খাটিয়ার নীচে লুকিয়ে আছে? আমি আসব? এসে টেনে বের করব নাকি?'

লীলার মুখ দিয়ে মৃদু আর্তনাদ বেরিয়ে এল, আর তা যেন দুই বোনের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হল। বোনেরা লীলার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। এবার পিন্টো গোঁ গোঁ করে ডাকতে শুরু করেছে, যদিও ওরা তাকে ধরে রেখেছে যাতে সে লোকটাকে আক্রমণ করতে না পারে।

'বাবা নেই, তুমি এখানে আসবে না — মা অসুস্থ হয়ে আছে।' লীলা গলা চড়িয়ে ওকে বলল।

'খুব ভালো, খুব ভালো', সে বিদ্বেষমাখা হাসি হাসল তার পানখাওয়া লাল মুখের হলদে দাঁত বের করে। 'মার অসুখ, বাবা বাইরে, মেয়েরা কিছু জানে না। এটুকুতো জান যে ও তার টাকা কোথায় রাখে?' হঠাৎ সে সিংহের মত গর্জন করে ওঠে। লীলা ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়।

'টাকা? আমাদের কোন টাকা নেই।' হাতের মুঠি শক্ত করে ও মৃদু স্বরে উত্তর দেয়, মনে মনে কামনা করছিল হরি যেন এখনই এসে পড়ে।

'টাকা নেই, আমাদের কোন টাকা নেই', লোকটি লীলাকে ভেঙায়। 'খুব সুন্দর উত্তর! আমাকে এইসব বলতে শিখিয়ে দিয়ে গেছে বদমাসটা, না? যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে! সবকটা মিথ্যাবাদী। দাঁড়াও, ঠিক ধরব আমি। ধরে ঘাড় ভেঙে দেব, টাকাও আমি ঠিক আদায় করে নেব।'

প্রতিবেশী লোকটা যখন ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এমনি করে চিৎকার করছিল, কখনও হাত নেড়ে, কখনও সামনে এগিয়ে এসে, তখন পিন্টো রাগে গরগর করছিল। তারপর হঠাৎ মেয়েদের হাত ছাড়িয়ে লীলার পাশ দিয়ে গিয়ে

রাস্তায় ছুটেছে, ক্ষিপ্ত হাতের থাবায় বালি আঁচড়াতে থাকল ও ধারালো দাঁত বের করে পাহারাদার কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। দ্রুত লাফিয়ে গিয়ে লোকটির সামনে গিয়ে কামড়াতে উদ্যত হলে সে হাত তুলে গর্জন করল, 'কুকুরকে ডেকে নাও। এটাকে যদি বাড়ি থেকে না তাড়াও, আমি ঠিক মেরে ফেলব।'

বেলা ও কমল একসঙ্গে চিৎকার করে পিন্টোর দিকে ছুটল। লীলাও বেরিয়ে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে, 'পিন্টো পিন্টো, চলে এসো। তোরা ওকে ধর। ও কামড়াবে না, কামড়াবে না।'

'আমাকে যদি কামড়ায়, আমি তাহলে — আমি তাহলে —' লোকটির কথা শেষ হয়না। চেঁচামেচি শুনে ওর বুড়ি মা খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হয়েছে দেখতে। এই মহিলাই যাদুকর লোকটিকে সকালে পাঠিয়েছিল ওদের মাকে দেখতে। নিজের ছেলেকে ওখানে মাতাল অবস্থায় পাক খেতে দেখে সে তার হাত চেপে ধরে খুব দ্রুত এক তীব্র ঝাঁকুনি লাগাল।

'তুই, তুই এখানে কি করছিস হতচ্ছাড়া?' সে ক্রোধে ফেটে পড়ে বলে, 'ছোট মেয়েগুলোকে ভয় দেখাতে এসেছিস? যা বাড়ি যা। শুনতে পাচ্ছিস না? তুই এখন বাড়ির বাইরে এসে কারো সঙ্গে কথা বলার অবস্থায় নেই। যা, গিয়ে কালো নোংরা মাটির গর্তে লুকো, তাড়ির হাঁড়িতে মুখ রাখো গিয়ে, ও মুখ আর দেখাতে এসো না।' বলতে বলতে ছেলেকে ধাক্কা দেয়। লোকটি চুপচাপ ছিল এতক্ষণ। ধাক্কা খেয়ে নিজেকে পুরো সামলাতে পারে না, পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় তার। 'সবাই বলছে যা যা। কোথায় যাব? আমার টাকা চাই, আমি টাকা নিয়ে তবে যাব। আমি জোচ্চোরকে মেরে ফেলব, এই কুত্তাটাকেও মারব।'

'চুপ কর', ওর মা ওর দিকে চেঁচিয়ে ওঠে, একটা লাঠি হাতে নিয়ে গাছের ডালে জোরে মারে। 'চুপ কর, বলছি না?' আবার চেঁচায়। তারপর পুত্রের পিছন পিছন চলে যায়, মেয়েগুলোর দিকে একবারও আর তাকায় না। বালির ওপর নারকেল গাছের পাশে ছায়ার মতো ওরা তখন দাঁড়িয়ে ছিল।

তারপর ওরা সার বেঁধে বাড়ির দিকে ফিরে আসে নিঃশব্দে। লীলা বাতি জ্বালায়, একটু তাড়াতাড়িই যেন — ছায়া আজ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বিপদে যেন পূর্ণ হয়ে আছে রাত। ছোট আগুনের শিখার পাশে ওরা বসেছিল, তখনই হরি বাড়ি ফিরে এসেছে। জিগ্যেস করেছে, 'কী হয়েছে?' অবশেষে ওরা যেন ভেঙে পড়ে, সবকথা হরিকে বলতে থাকে। ওরাও জানত হরির কিছু করার ছিল না মাকে সুস্থ করতে কিংবা মদ্যপ প্রতিবেশির ভয় দেখানোর হাত থেকে বাঁচাতে কিংবা তাদের চারপাশের নির্মমতা থেকে তাদের রক্ষা করতে। কিন্তু সে যে ওদের ভয়ের ব্যাপারটা জানবে ও সব ঝামেলাগুলোর সমভাগী হবে, এটাই ওদের কাছে অনেকখানি ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরি জেনে গেছে যে ছায়াচ্ছন্ন ঘরে বোনেদের সঙ্গে নিঃশব্দে বসে থাকলে তার চলবে না। ফাঁকা জাল নিয়ে সমুদ্রতীরে ঘুরলেও হবে না। এমন কি কাজের আশায় পাহাড়ের নীচে স্তূপীকৃত টিনের আশেপাশে ঘুরলেও তার চলবে না, কেননা কারখানা কবে হবে তার ঠিক নেই। ওর এখনই কিছু একটা করা দরকার — কাজ করার মত পরিবারে ও ছাড়া আর কেউ নেই।

পরদিন সকালে বীচের তপ্ত সাদা বালির উপর গিয়ে দাঁড়াল অন্যদের সঙ্গে, বিজুর নির্মীয়মান নৌকো ঘিরে। তার মনে হল নৌকোর কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। ডিপ-ফ্রীজ নৌকোয় লাগানো হয়েছে বলে বিজু দিনরাত নৌকোর কাছ ছেড়ে নড়ে না। হরি শুনল, বিজু নাকি নৌকোর পাটাতনেই ঘুমোয় — যেন নৌকো তার ইতিমধ্যেই সমুদ্রে ভাসছে। এখন সকালের উজ্জ্বল রোদে সে বসে আছে ফোল্ডিং চেয়ারে, হাতের তালুদুটো দুই হাঁটুতে লাগানো, অন্যদের সঙ্গে সেও দেখছে নৌকোয় পালিশ ও রং করা হচ্ছে। চকচকে নীল রং করা এক টুকরো টিন, মাঝখানে সাদা ও গোলাপী রঙের জলপরীর ছবি লাগানো হয়েছিল কেবিনের দরজার ওপর। আর একজন লোক খুব সাবধানে ছবির নীচে লিখছিল নৌকোর নাম — 'জলপরী।' নৌকোর নাম লেখা স্পষ্ট হতেই গ্রামের ছেলেরা হাসতে লাগল, আর বিজু রাগ রাগ ভাব করে ওদের দিকে তাকাল।

ওরা হাসছে কেন দেখার জন্য হরি থামল। ওরা আঙুল দিয়ে গোলাপী সাদা রঙের জলপরীর নীল সমুদ্রে খেলা করার ছবিটাকে দেখাল, তারপর তাকে নিয়ে রসিকতা করল।' বিজু কি সমুদ্রে গিয়ে জলপরীকে ধরবে বলে এই নৌকো বানাচ্ছে', বলেই ওরা বিজুর দিকে তাকাল। হরির কিন্তু হাসি পেল না। সে ওদের ছাড়িয়ে সোজা দৃঢ়ভাবে হেঁটে বিজুর কাছ পর্যন্ত গেল। গতরাতেই সে ঠিক করেছিল বিজুর কাছে নৌকোর কাজ চাইবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য একজন কেউ আসায় বিজু তার মাথাটা ঘুরিয়েছিল

অন্যদিকে। হরি দেখল টিনের ঝুপড়ির সেই লোকটা, যে কারখানার পাইপগুলো পাহারা দেয়।

'তাহলে খালের লোকেদের মাছ ধরার জন্য আর একটা নৌকো তৈরী হল?' লোকটি হাসতে হাসতে বিজুর কাছে এগিয়ে এল, তার ঠোঁটে ধরা একটা শস্তা দামের সিগারেট তখনও জ্বালানো হয়নি।

বিজুর মুখটা কালো হয়ে গেল, চোখে ভ্রুকুটির ছাপ। 'এটা কোন সাধারণ মাছধরার নৌকো না', সে বিড় বিড় করে বলল। 'নিজের চোখেই দেখছ না এর একটা ডিজেল ইঞ্জিন আছে, ডিপ-ফ্রীজ আছে? তাছাড়া এটা দিনে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।'

'ওহ্, তাই নাকি?' লোকটি হাসল। নৌকোর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে একটা টান দিল।

ঠিক তখনই টিনের সাইনবোর্ডটা পেরেক খুলে ডেকের ওপর শব্দ করে পড়ে গেল। এটাকে তুলে আবার পুরানো জায়গায় লাগানো হল, তবে রং খারাপ হয়ে গেছে, কাঁচা রং গড়াচ্ছিল টিন বেয়ে। ছেলেরা খিক খিক করে হাসতেই বিজু রঙের মিস্ত্রীর উপর রেগে গিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে চিৎকার করল, আর সে অপ্রস্তুত হয়ে আবার রং লাগাতে লাগল।

'তাহলে একটা বিশাল ট্রলার তৈরী হচ্ছে বলুন! তাই না?' লোকটি উপহাসের ভঙ্গিতে বলল। 'এটা পঞ্চাশ মাইল যাবে? অবশ্য যেতেই হবে, মাছ ধরতে গেলে তো যেতেই হবে।'

'কী বলতে চাইছ তুমি? এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।' বিজু বলার চেষ্টা করল তার ফোল্ডিং চেয়ারে ঘুরে বসে।

'না, এখানে মাছ নেই', লোকটি নিচু হয়ে বালির ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। 'এখানে মাছ নেই বললেই চলে। গতকাল আমি রাতের খাবারের জন্য পমফ্রেট কিনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একটা ছোট মাছ শুধু পাওয়া গেল। বোম্বাইয়ের কেউ ওই সাইজের পমফ্রেট খায় না।' লোকটি ঘৃণাভরে বলল, গ্রামের লোকেরা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনল সে কথা। লোকটি পুনরায় বলতে লাগল, 'চাও বাগ্‌দা চিংড়ি, পাবে বড় জোর কুচো চিংড়ি। বোম্বাইয়ের লোকেদের কাছে এসব কিছুই নয়। এমনকি তোমাদের গ্রামের লোকের কাছেও এ কিছু নয়। এখন সময় হয়েছে — নৌকো-টৌকো মাছধরার জাল ছেড়ে দিয়ে অন্য নতুন কোন কিছু করা দরকার?

'আমরা সবসময়ই এখানে মাছ ধরেছি', বিজু দৃঢ়ভাবে বলে, এতে গ্রামের সবচেয়ে ধনী ও বড় জেলে বিজুর জন্যে হরি ও অন্যান্য ছেলেরা একধরনের গর্ব বোধ করল। 'সমসময় এখানেই মাছ ধরে যাবো। আর এখানে যদি যথেষ্ট মাছ না ওঠে, তাহলেও অবশ্য খাবারের অভাব হবে না — ধান ও সব্জী ফলে, নারকেল

গাছ আছে। দেশের আর কোথায় তুমি এত খাদ্যশস্য পাবে? এখানকার নারকেল এত বড় ও মিষ্টি যে বোম্বাইয়ে তা খুবভালো দামে বিক্রি হয়। এখানকার মাটি এত ভালো যে বছরে দু'দুটো শস্য ফলে। আমাদের ধান সবার সেরা। তুমি কি আমাদের ভালো চালের ভাত খেয়েছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ', লোকটি জিভ থেকে তামাকের টুকরো থু করে ফেলে বলে, 'তোমাদের চাল খেয়েছি, তোমাদের জমিও দেখেছি। সব চলে যাবে, সব জমি কিনে নিয়ে তার ওপর কারখানা তৈরি হবে। তোমাদের চাল আর হবে না।'

ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মাথা নাড়ল, তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গ্রামের বড়দের এ কথাগুলোই ওরা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এখন আসল লোকের মুখ থেকেই শুনছে, এখন বিশ্বাস করতেই হবে। বয়স্ক বিজুর কালো মুখে ভয় ও উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠলে ছেলেরা তা উপভোগ করল।

'কেউ আমাদের জমি নিতে পারবে না', বিজু বলল। ওর নিজের তিন একর ধানের জমি ও দু একর নারকেল ও পানের জমি আছে, এ ছাড়া মাছ ধরা নৌকো অনেকগুলো তো আছেই। 'আমাদের জমি, আমরা বিক্রি করব না।'

'সরকার থেকে যখন বলবে বিক্রি কর, তোমরা ঠিক বিক্রি করবে', লোকটি আঙুল মটকাতে মটকাতে বলল।' কোন কথাই খাটবে না তখন, তোমাদের বিক্রি করতেই হবে। সরকার থেকে এই জায়গাটাকে কারখানার উপযুক্ত বলে বেছে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং এখানেই কারখানা হবে।'

'কেন, এখানে কেন?' বিজু চ্যালেঞ্জের ঢঙে প্রশ্ন করে। 'যাও যেখানে জমিতে ফসল হয় না, পাথুরে মাটি, সেখানে গিয়ে কারখানা বানাও গে।' সে কঙ্কেশ্বর পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখায়, যেটি অনুর্বর এলাকা থেকে উপকূলের সবুজ অংশকে আলাদা করেছে। 'আমরা আমাদের চাষের জমি কারখানার জন্যে বিক্রি করব কেন?'

'করতেই হবে — সরকার এই জায়গাটাকেই বেছেছে।'

'আমাদের সঙ্গে কথা না বলে সরকার কি করে এই জায়গাটা ঠিক করল?'

'তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে কি জিগ্যেস করবে?' লোকটি উত্তর দেয়। 'সরকার থেকে এক্সপার্ট লোকেরা উপযুক্ত জায়গার খোঁজে এসে এই জায়গাটাকে ঠিক করেছে। জায়গাটা রেওয়াসের বন্দর থেকে কাছে, তাই সরাসরি বোম্বাইয়ের সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা চালু হবে। বোম্বাইও কাছে, মাত্র চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে। এখানে সহজেই রেললাইন পাতা যাবে। পাকা রাস্তা তো আছেই, শুধু চওড়া করতে হবে এই যা। সমুদ্র ধারেই, তাই কারখানার বর্জ্য পদার্থ পাম্প করে ফেলে দেওয়া যাবে। আর জমিও প্রচুর আছে যেখানে অনেক কারখানা ও হাউসিং কলোনী তৈরী হতে পারবে। লোকজন যারা এখানে কাজ করতে আসবে তারা তাতে থাকবে।'

'লোকজন? কোন লোকজন আসবে এখানে কাজ করতে?'

'হাজার হাজার লোক', লোকটি হেসে বলে, 'হাজার হাজার লোক আসবে, তাদের জন্য অনেক কলোনী তৈরী হবে, বাস ও ট্রেনের ব্যবস্থা হবে, মার্কেট হবে —'

'আর আমরা যারা এখানে বাস করছি তাদের কী হবে?' বিজু রেগে জিগ্যেস করে।

লোকটি হাসল, তারপর হাত দিয়ে শূন্যে এমন ভঙ্গি করল যেন সে কোন কাঠ কাটছে। 'এমনি হবে — তোমাদের গ্রাম থাকবে না, তার জায়গায় কারখানা গড়ে উঠবে, ফারটিলাইজার তৈরী হবে, গ্যাসের উৎপাদন হবে, অনেক চাকরির সংস্থান হবে। সরকার থেকে এরকমই বলা হচ্ছে।' কথাগুলো বলার পরই সে সচেতন হল যে গ্রামের লোকেরা তার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'জেলে ও চাষীরা এখন কারখানার কর্মী হবে?' বিজু হুঙ্কার ছেড়ে বলে। 'তুমি বলতে চাইছ এই ছেলেরা তাদের বাপদাদার জমি ও নৌকো ছেড়ে দিয়ে শহরের লোকের মতো কারখানায় কাজ করতে যাবে?'

'এই ছেলেরা?' লোকটি ঘুরে ছেলেদের দিকে তাকায়. ওরা আগ্রহ নিয়ে এতক্ষণ কথাবার্তা শুনছিল। 'আমি এই ছেলেদের কথা জানি না, আমি শুধু এটুকু জানি যে কারখানা চলাবার জন্য অন্য জায়গা থেকে ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিকদের আনা হবে।'

'আর আমরা?' হরির বদলে হঠাৎ রামু চেঁচিয়ে বলে উঠে, হরি কথা বলতে পারে না, তার গলা শুকিয়ে গেছে।

'তোমরা?' রামুর দিকে তাকিয়ে লোকটি অবজ্ঞাভরে বলল। 'এই তো উনি আছেন, ওঁর নৌকো করে তোমাদের পাঠিয়ে দেবেন মাছ ধরতে — পঞ্চাশ মাইল দূরে!' বলেই হাসতে থাকে সে, রোদ ঝলমলে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের দিকে হাত দেখিয়ে বলে, 'অনেক, অনেক দূরে তোমাদের পাঠিয়ে দেবে।'

গ্রামের সবাই রেগে ছিল। রাস্তা থেকে মন্দির পর্যন্ত হরি যেখানেই গেল এটা সে টের পেল। বাড়িতে লীলাকে বলে এসেছে যদি পায় তাহলে মার জন্যে কিছু বরফ সে কিনে আনবে কারণ মার এখনও ধুম জ্বর। গ্রামের দৃশ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি অবশ্য — বারান্দায় রেলিংয়ে শাড়ি ঝুলছে, মেয়েরা তাদের দরজার পাশে তুলসীগাছে জল দিচ্ছে, বাজারে মেয়েরা ফুলের মালা বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখছে, পাতার ওপরে কলা ছড়িয়ে রেখেছে, কিন্তু তবুও বাতাসে একটা কোন সুর ধরা পড়ছিল — শ্লথ, অলস আবহাওয়ার বদলে ক্ষোভ ও রাগের পরিবেশ তৈরী হয়েছে।

এতই স্পষ্টভাবে হরি এই মনোভাবটা বুঝতে পেরেছিল যে সে যখন মন্দিরের ইঁটের তৈরী হলঘরে অনেক লোককে একজায়গায় দেখল, সে অবাক হল না।

কর্মহীন ছেলেরা ও জেলেরাই শুধু নয়, নারকেল বাগান ও পানের বরোজের মালিক এমন চাষীরা, এমনকি মহিলা ও বালিকারাও সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়ানো এক যুবকের কথা শুনছিল, তিনি বক্তৃতা করছিলেন। হরি তার কথা শোনার জন্য কাছে এগিয়ে গেল।

'আমি আলিবাগ থেকে এসেছি আপনাদের এটা জানাতে যে আসুন, আপনারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। আমরা এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই চিন্তিত — আমরা যারা রেওয়াস থেকে আলিবাগ পর্যন্ত উপকূল বরাবর চৌদ্দটি গ্রামের লোক এখানে বাস করি। আমাদের প্রত্যেকেই আজ বিপন্ন। আমাদের জমি নিয়ে নেওয়া হবে। এই জমিতে আমরা নারকেল গাছ তৈরী করি, ভাল ধান ফলাই আমাদের পরিবারের জন্য। আর এই জমিতে ওরা ওদের কারখানা বানাতে চায়। আমাদের জমির ফসল নষ্ট হবে, যাতে ওদের কারখানা গড়ে উঠতে পারে। কারখানায় যখন ফারটিলাইজার তৈরী হবে, তখন কারখানা থেকে নির্গত অনেক বর্জ্য পদার্থ, তরল রাসায়নিক নোংরা ফেলা হবে আমাদের সমুদ্রে। আর তার ফলে তার কয়েক মাইল জুড়ে এলাকায় সমস্ত মাছ মরে যাবে। আমাদের জমি ছাড়া, সমুদ্র ছাড়া আমরা বাঁচব কী করে?' হাত ওপরে তুলে আবেগকম্পিত গলায় তিনি বলে যাচ্ছিলেন।

'বাঁচব কী করে আমরা?' সমবেত লোকেরা সমস্বরে বলে উঠল। এমনকি হরিও চেঁচিয়ে উঠেছে, 'কী করে?' নিজের গলার স্বর শুনে সে নিজেই অবাক হল।

'ওরা ওদের লোক পাঠাবে আপনাদের শান্ত করতে, স্তোকবাক্য দিয়ে ভোলাতে। ওরা বলবে, তোমরা চাকরি পাবে। আমি আপনাদের বলছি — ওরা আমাদের সবাইকে চাকরি দিতে পারবে না। কারখানাগুলোকে চালাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা, শহরের কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসা লোকজন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য, যারা কোনদিন স্কুলে যায়নি কিন্তু সারা জীবন অন্যের জমিতে ফসল ফলিয়েছে, তাদের জন্য কিছু কাজ থাকতে পারে, কিন্তু সে সব কাজ হল — ঝাড়ুদারের কাজ, মুটের কাজ, সবচেয়ে বাজে কাজ, যে কাজে টাকা নেই। কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা — ওরা সবচেয়ে বেশি মাইনে পাবে, থাকার জন্য বাড়ি পাবে — এরা শহর থেকে আসবে ওরা বলছে, কারখানার জন্যে মাত্র পাঁচশ একর জমি ওদের চাই, কিন্তু ওদের আরো কয়েক হাজার একর জমি দরকার হবে হাউসিং কলোনী তৈরীর জন্যে এবং বড় কারখানাকে ঘিরে অনেক ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠবে তার জন্যে। ওরা অন্ততঃ আড়াই হাজার একর জমি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। এগুলো আমাদের সবচেয়ে ভালো জমি শুধু নয়, মহারাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট জমি। এসবের পরিবর্তে ওরা আমাদের দীর্ঘ নারকেলগাছগুলো কেটে ফেলবে, জমির ফসল নষ্ট করে ফেলবে, সমুদ্রের মাছ মেরে ফেলবে, তারপর আমাদের তাড়াবে কেননা আমরা ওদের কোনও কাজে আসব না। আমরা কি এটা হতে দেব?' যুবকটির গলা যেন গর্জে উঠল।

'না, না, না।' — লোকেরা পাল্টা গর্জন করে উত্তর দিল, 'আমরা হতে দেব না, হতে দেব না!'

'তাহলে আসুন, আমরা বোম্বাই গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলি আমরা যা ভাবছি। আমরা ইতিমধ্যে আলিবাগে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু তিনি আমাদের জন্যে কিছুই করেন নি। বলা হচ্ছে, একজন মন্ত্রী এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু সত্যি কথা হল, উনি যখন দেখলেন যে আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি, তিনি ভয় পেয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন, তারপর বোম্বাই চলে গেলেন সবকিছুই পুলিশের ওপর ছেড়ে দিয়ে। আর পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিল — এইরকম ব্যবহার আমরা মেনে নেব না। আমরা পুলিশী শাসন মেনে নেব না।' তিনি চিৎকার করে বললেন। তাঁর লম্বা চুল কাঁধ অবদি ঝুলছিল আর হাতের মুঠি উঠেছিল আকাশের দিকে।

'পুলিশী শাসন চলবে না, চলবে না', সমবেত লোকজন সুর মেলাল। সামনে দাঁড়ানো ছেলেটির কাঁধে ভর রেখে হরিও চিৎকার করল।

'এখন আমাদের সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। তিনি যদি এসে আমাদের কথা না শোনেন তবে আমাদেরই যেতে হবে তাঁর কাছে, তাঁর বোম্বাইয়ের অফিসে।' তরুণটি জোরে জোরে বললেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কে কে আমার সঙ্গে আসবে? তোমরা আসবে কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', সমস্বরে সবাই, এমনকি মহিলা ও শিশুরা পর্যন্ত চিৎকার করে উত্তর দিল। অথচ এদের বেশিরভাগই আলিবাগ পেরিয়ে আর যায়নি, আর পকেটেও বাস বা ফেরিভাড়া ছিল না তাদের।

'তাহলে কাল সকলে রেওয়াসের জেটিতে আমার সঙ্গে মিলিত হোন, আমরা মাছধরা নৌকো করেই যাত্রা করব। আমরা বোম্বাই পর্যন্ত নৌকো বেয়ে যাব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অফিসেই দেখা করে আমাদের কথা শোনাব। ওঁরা আমাদের দেখে ভয় পাবেন, শান্ত হয়ে আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হবেন। আমরা ওঁদের বলব, ওঁরা আমাদের জমি নিয়ে নিতে পারবেন না, আমাদের কাছ থেকে সমুদ্রকে কেড়ে নিতে পারবেন না। জমি আমাদের, সমুদ্র আমাদের।'

'আমাদের, আমাদের', ঠিক যেমনভাবে হাওয়ায় নারকেল গাছ একসঙ্গে দোলে বা সমুদ্রে একসঙ্গে অনেক পাল ওড়ে তেমনি করে সবাই আকাশের দিকে হাত তুলে নাড়তে থাকল।

যে দোকানে আলিবাগের বরফ কারখানা থেকে বরফ আসে জেলেদের কাছে বিক্রি করার জন্যে হরি শেষ পর্যন্ত যখন দোকানে গিয়ে পৌঁছল, সে শুনল যে তখনও বরফ আসেনি। দেরি হবার কারণ হাইওয়েতে ফাইটিলাইজার ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত চাষী ও জেলেদের বিশাল মিছিল-এ গাড়িঘোড়া সব আটকে গেছে।

হরি মাথা নাড়ল, ইতিমধ্যে সে সবই জেনেছে। কিন্তু তার বরফের দরকার ছিল খুব। সারাদিন অন্য কিছু করবার নেই তার, তাই সে দোকানের কাছে একটা জবা ঝোপের পাশে ধুলোর ওপর বসে বরফের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। খদ্দেরহীন খালি দোকানের চারপাশের নিস্তব্ধতা ও ঝোপের ছায়া তার ভালো লাগল। একা থাকা তার দরকার ছিল, কেননা অনেক কিছু ভাবতে হবে তাকে।

সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার পর থেকে, বরং বলা ভাল তারও আগে থাকতে, গতরাতে যখন তার বোনেরা মুখে কোনও কথা না বলে তার কাছে কিছু যেন একটা প্রত্যাশা করছিল, তখন থেকেই সে যেন জনতার তাড়া খেয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে ছিটকে পড়ছিল, বুঝে উঠতে পারছিল না, কোন দিকে তার যাওয়া উচিত।

ওইদিন সকালেই সে বিজুর কাছে কাজ চাইতে গিয়েও বলতে পারেনি, বাধা পেয়েছে শহরের লোকটির সঙ্গে বিজুর কথাবার্তায় — তাদের কথা শুনে হরির মনে হয়েছিল বদমেজাজী বিজু, নৌকোর লোকজন ও গ্রামের স্কুল পালানো ছেলেগুলো, যাদের একমাত্র কাজ জটলা করে হাসি ঠাট্টা করা, তাদের চেয়ে শহর থেকে আসা কারখানার পাহারাদার লোকটি অনেক বেশি বিজ্ঞ, চালাক ও ধুরন্ধর। বিজুর কাছে কাজ চাওয়ার ইচ্ছে এখন সে ত্যাগ করেছে, মানসিকভাবে সে এখন ওই শহরের লোকটির দিকে। কর্মহীন, অলস ও কদাকার গ্রামের ছেলেদের দিকে নয়। লোকটির কথাবার্তার ধরনটা হরিকে আহত করলেও সে বুঝেছে তার কথায় যুক্তি আছে।

তারপর আলিবাগ থেকে আসা তরুণ লোকটির জোরালো বক্তৃতা সে শুনেছে। জেনেছে সে — ওঁর নাম আদারকার, গত নির্বাচনে ওরা সবাই ভোট দিয়েই ওঁকে, মহারাষ্ট্র রাজ্য বিধানসভার সদস্য বানিয়েছিল। হরির মনে হল, গ্রামের লোকেদের পাশে দাঁড়িয়ে চাষী ও মৎসজীবীদের অধিকার রক্ষার লড়াই করা তার কর্তব্য, যাতে তারা প্রথাগতভাবে তাদের জীবন নির্বাহ করতে পারে। না-ই বা থাকল তার নিজের জমি কিম্বা মাছধরার নৌকো!

এখন কী করবে সে? গ্রামবাসীদের সঙ্গে বম্বে গিয়ে তাদের জমি ও জীবিকাচ্যুত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে? নাকি সরকার ও কারখানার পক্ষ নিয়ে ওখানে কাজ পাওয়ার চেষ্টা করবে? প্রশ্নগুলো মনের ভিতরে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বুঝল, বোম্বাই যাওয়ার ব্যাপারে সে বেশি উত্তেজনা বোধ করছে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে আংশিক কারণ ছিল তা হল, নিজের জমির জন্যে গ্রামের লোকের সঙ্গে আন্দোলন করার ব্যাপারে সে আকর্ষণবোধ করছিল। আর অন্য কারণটি হল, অবশেষে বোম্বাই যাওয়ার সুযোগ তার সামনে হাজির হয়েছে। এই সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছে সে এতদিন। অল্পবয়সী, কপর্দকহীন এক বালক যে কোনদিন কোথাও যায়নি, সাহস করবে সে কী করে?

ছায়ায় বসে মাথা নীচু করে সে একটা ছোট ডাল দিয়ে ধুলোর ওপর দাগ কাটছিল। শেষ পর্যন্ত একসময় চটের বস্তায় জড়ানো বরফ নিয়ে লরি এসে হাজির হল, বরফের সঙ্গে লরিতে কেরোসিন, চিনি, মসুরীর ডাল ও গমও এসেছে। দোকানদার যখন বরফের টুকরো কেটে কেটে তার বাক্সে রাখছিল হরি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। হরি খুব অল্প পয়সার বরফ কিনল, যার কমে চাইলে দোকানদার দিতে চাইত না। তারপর সে দ্রুত বীচের দিকে এগোল, তাড়াতাড়ি বাড়ি না পৌঁছলে বরফ গলে যেতে পারে। তার মা ও লীলার কাছে অন্তত কিছু একটা নিয়ে যেতে পারছে ভেবে সে একধরনের সুখবোধ করল, কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত তার দুঃশ্চিন্তাগুলো দূরে থাকল।

যে মুহূর্তে সে খালের ধারের রাস্তায় পৌঁছল, সেই মুহূর্তেই কিছু একটা অঘটনের ব্যাপার আঁচ করল। নিস্তব্ধ বাড়ি থেকে তার বোনেদের কান্নার স্পষ্ট শব্দ কানে এল তার, সে ছুটতে লাগল এই ভেবে যে হয়ত তার মার কিছু হয়েছে।

'লীলা', সে জোরে জোরে ডাকল, 'লীলা, কী হয়েছে?'

লীলা ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। সে বোনেদের মত খুব জোরে কাঁদছিল না, তার কান্নার শব্দ কম, কিন্তু মর্মস্পর্শী। হরি ছুটে গিয়ে লীলার হাত ধরল, বলল, 'মা? মার কী হল? এই তো বরফ এনেছি মার জন্যে, এই তো বরফ!'

লীলা মাথা নেড়ে বোঝাল মার কিছু হয়নি। তারপর চোখ বন্ধ করে কুটিরের এক কোনে ইশারা করল। হরি ভেতরে ঢুকল, হাঁটু দুটো তার কাঁপছে, বুঝল লীলা পিন্টোর দিকে আঙুল দেখিয়েছে। পিন্টো মেঝেয় সোজা হয়ে শুয়ে আছে, বীচের ওপর পড়ে থাকা একখন্ড তক্তার মত, গায়ের লোম ফ্যাকাশে, চোখ খোলা কিন্তু দৃষ্টিশূন্য। সে এগিয়ে গিয়ে কুকুরটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসল, কিন্তু স্পর্শ করার সাহস হল না।

বেলা ও কমল ছুটে এসে হরির কাঁধে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে তার হাত ধরে টানতে লাগল।

'কী হয়েছিল?' ফিসফিস করে হরি জিগ্যেস করল, 'আজ সকালেই তো ভাল দেখে গেছি।'

লীলা এসে ওদের পিছনে দাঁড়িয়েছে, সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ওকে বিষ দিয়েছে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল, বাড়ির সামনে এসে বমি করতে আরম্ভ করেছিল — রক্তবমি, তারপর মাটিতে পড়ে মরে গেল। বিষ দিয়েছিল ওকে, বিষ — আমি জানি।' সে শব্দ করে কাঁদতে থাকে, সে কান্নায় বেদনার সঙ্গে ভীতিও মিশে ছিল।

'পিন্টোকে কে বিষ দেবে?' হরি বিমূঢ় হয়ে শুধাল, বরফ মাটিতে রেখে সে হাত দিয়ে পিন্টোকে ছুঁয়ে প্রাণের স্পন্দন খোঁজার চেষ্টা করল।

'আমি জানি কে দিয়েছে।' কমল প্রতিবেশীদের জমির দিকে হাত দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ওই ভয়ানক লোকটা, ওইখানে থাকে যে মাতালটা।'

'হ্যাঁ, ওই তো আমাদের ভয় দেখিয়েছিল,' লীলা বিষন্ন গলায় বলে, 'ও বলেছিল আমাদের দেখে নেবে, বলেছিল পিন্টোকে মেরে ফেলবে।'

'কিন্তু কেন?' হরি রাগে চড়া সুরে জিগ্যেস করে, এবার সে যেন নিজেই কেঁদে ফেলে। 'ও কেন আমাদের পিন্টোকে মেরে ফেলবে?'

'ও আমাদের দেখতে পারে না,' বেলা ও কমল কাঁদতে কাঁদতে বলে।

'ও বলেছিল আমাদের শাস্তি দেবে', লীলা মনে করার চেষ্টা করে, 'কারণ বাবা ওকে তাড়ির দাম দেয়নি। ও বলছিল বাবার কাছে টাকা পায়, বাবা ধার নিয়েছিল।'

'ধার, ধার', হরি দাঁতে দাঁত ঘসে। 'তাড়ি খাওয়ার জন্যে বাবা সব সময় ধার করে বেড়াবে।' উঠে দাঁড়িয়ে মৃত কুকুরটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ক্রন্দনরত বোনেদের দিকে তাকায়, তারপর বাড়ির বাইরে চলে যায়। ও চলে যাবে — রেওয়াস চলে যাবে, বোম্বাই চলে যাবে। এই দুঃখময় গৃহ, সন্ত্রস্ত বোনেরা, অসুস্থ মা ও মদ্যপ পিতার কাছে আর সে ফিরে আসবে না। সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে, যতদূরে যাওয়া সম্ভব সে চলে যাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরি জানত না যে পরদিন সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে জোয়ার এলে বিজুর নৌকো ভাসানো হবে। সবুজ গাছপালার আড়ালে লুকনো কুটিরগুলো থেকে গ্রামবাসীরা একে একে বেরিয়ে রোদ ঝলমলে বেলাভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে দেখার জন্যে। বিজুর স্ত্রী নৌকোর ডেকের ওপর রংবেরঙের নানা ধরনের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে — এ সবই তার শাড়ি কেটে সেলাই করে বানানো হয়েছে। কোন পতাকায় গোলাপী, সবুজ ও বেগুনী, কোনটি অনেকগুলো শাড়ির সমাহারে তৈরি, ফুল ও অন্যান্য নকসা তৈরী হয়েছে তাতে। উজ্জ্বল নীল ও গোলাপী রঙের সদ্য আঁকা সাইনবোর্ডটি লাগানো হয়েছে কেবিনের গায়ে। আনন্দোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে বিজু বসে ছিল তার ফোল্ডিং চেয়ারে, হাত দুটো ভাঁজ করে বুকের কাছে ধরা, গর্বে ফুলে উঠছিল তার বুক।

গত সন্ধ্যায় নৌকো তৈরির কারিগররা নৌকোটিকে তুলবার জন্যে দুটো যন্ত্র বসিয়েছিল বালিতে, সেগুলোর সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল নৌকোতে। এখন সকালবেলায় তালগাছের গুঁড়ি শুইয়ে রাখা হয়েছে নৌকোর গা থেকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত। বিজুর স্ত্রী ও কন্যা মিষ্টির থালা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল নৌকো জলে ভাসানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাইকে মিষ্টিমুখ করাবে বলে। এবার বিজুর স্ত্রী নৌকোর গায়ে নারকেল ভাঙার জন্যে এগিয়ে গেল, যেখানে একজোড়া চোখ আঁকা হয়েছিল সাদা ও কালো রং দিয়ে। নারকেল ভাঙা হল, সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও চিৎকার ধ্বনিত হল।

এবার নৌকোটিকে তোলা হল রংকরা গাছের কাণ্ডগুলির ওপর, বাঁশের খুঁটিগুলো ধরে রেখেছিল ঘর্মাক্ত কলেবর শ্রমিকেরা, তারা এবার বাঁশের গায়ে দড়িগুলো এমনভাবে জড়াতে শুরু করল যে একসময় নৌকো বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে গেল একদিকে। যারা দড়ি টানছিল ভয় পেয়ে দড়ি ছেড়ে দিয়ে ছুটল প্রাণ বাঁচাতে। নৌকো বালির ওপর কাত হয়ে প্রায় উল্টে পড়ার উপক্রম হল।

বিজুর মুখ নিমেষে শুকিয়ে গেল। সে চেয়ার থেকে উঠে এসে কী ঘটছে দেখার

চেষ্টা করল। তার স্ত্রী ও মেয়ে ব্যথাহত হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল মিষ্টির থালা হাতে। ছোট ছোট ছেলেরা যারা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল, মজা পেয়ে হাসতে লাগল। নৌকোর মিস্ত্রীরা বোকার মত দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিল। কেউ জানেনা এখন কী করা দরকার।

বিজু শ্রমিকদের শাপান্ত করছিল, 'আলিবাগ থেকে লোক আনাই দরকার ছিল আমার। জমিতে কাজ করা এই গর্দভগুলো নৌকোর কী বুঝবে?'

'আজ ওরা আসেনি কেন, আলিবাগ থেকে লোকেরা আসেনি কেন আজ?' একটি লোক তাকে জিগ্যেস করে খুব সহজভাবে।

'ওরা আজ সব রেওয়াস গেছে, ওখান থেকে বোম্বাইয়ের নৌকো ধরবে।' ছেলেদের মধ্যে থেকে কেউ একজন হাসতে হাসতে উত্তর দেয়। 'সরকার থেকে এখানে যে কারখানা তৈরি করা হবে, তা বন্ধ করার জন্যে গেছে। ওরা সারাজীবন চাষী, জেলে ও বোকা হয়েই কাটাতে চায়।' ছেলেটি ব্যঙ্গের ছলে ব'লে নৌকো ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনদের দেখায়। 'আমরা সারাজীবন এইরকম বালতি বানাব আর ওতে চড়ে সমুদ্রে গিয়ে ডুবে মরব।'

'ও, তাই নাকি?' বিজু ছেলেটির দিকে তাকায়, 'নৌকো বানানো ও মাছধরার কী বুঝিস তুই, হাঁদারাম? তোদের যা দরকার তা হল মার।'

'আমরা ভালই বুঝি।' ছেলেটি খুব শান্ত হয়ে উত্তর দেয়। ছেলেটি আর কেউ নয়,

হরির বন্ধু রামু। 'আমরা কারখানায় কাজ করব। আমরা ভালো পাকা চাকরি পাব, পকেটে টাকা থাকবে। আর তোমরা সমুদ্রে গিয়ে পচা মাছ ধরে আনবে। তখন দেখব কে বেশি বোঝে — তুমি না আমরা।' রামুর পাশে যেসব ছেলেরা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সবাই বুড়ো লোকটাকে তার নৌকো নিয়ে ব্যঙ্গ করতে লাগল। নৌকোটিকে উদ্দেশ্য করে 'কুমড়োর খোলা' ও 'নারকেলের খোলা' বলে চেঁচাতে থাকল। তা শুনে বিজু তার শক্ত সমর্থ হাতদুটো ওপরে তুলে ওর দিকে চেঁচিয়ে উঠল, 'পালা সব এখান থেকে। না হলে লাঠি ভাঙব তোদের পিঠে।'

ছেলেরা চলে যায় হাসতে হাসতে। ওদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করে 'হরি কোথায়? এত মজার ব্যাপার ঘটল, ওকে দেখছি না।'

'জানিনা', রামু উত্তর দেয়। 'তোদের কি মনে হয় ও আলিবাগের লোকেদের সঙ্গে রেওয়াসে গেছে?'

'গিয়ে থাকলে বোকামি করবে খুব।' অন্য একজন বলে ওঠে।

ওরা যেতে থাকে, যেতে যেতে পা দিয়ে বালি ছেটায়। দু'একজন দাঁড়িয়ে থাকে, দেখার চেষ্টা করে লোকগুলো আবার দড়ি ধরে টেনে নৌকো সোজা করার চেষ্টা করছে, তারপর না পেরে ছেড়ে দিচ্ছে। 'আয়, জোয়ার আসা পর্যন্ত এখানে দাঁড়ানো যাক।' মুখের ঘাম মুছতে মুছতে ওরা বলে। 'জোয়ারে নৌকো ঠিক হয়ে যেতে পারে, তখন হয়ত নিজেই ভাসতে থাকবে।' ওরা বিজুকেও বোঝায়। কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারে না। চা খেতে হবে বলে ওরাও চলে যায়।

বিজু তার স্ত্রী ও মেয়ে নতুন জামাকাপড় পরে শুধু অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বীচে। কিছুক্ষণের মধ্যে রোদের তেজ এত বাড়ে যে ওরাও দাঁড়াতে পারে না আর।

জোয়ার এত উঁচু অব্দি ওঠেনি যাতে নৌকো জলে ভেসে ওঠে। পরদিন তাই বিজুর লোকেরা আবার চেষ্টা করে নৌকো সোজা করতে যাতে ভাসানো যায়। কিন্তু ওদের মধ্যে এমন কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনা ছিল না যাতে তারা সফল হতে পারে। পরপর বেশ কদিন ধরে তারা চেষ্টা করতে থাকে, আর না পারলে বিজু ওদের ওপর রেগে যায়। অবশেষে ওরা নৌকোটাকে সামান্য কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং জোয়ারের জলে নৌকো ভেসে ওঠে। এটা ঘটে খুব নিঃশব্দে, রাতের অন্ধকারে।

হরি ততক্ষণে থাল গ্রাম থেকে অনেক দূরে, 'জলপরী' নামে নৌকোটির কথা তখন তার মনেও নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হরি যখন রেওয়াসে পৌঁছল, তখন ভোর হয়ে আসছে। যেসব লোকেরা রাতে হাজির হয়েছিল তারা জেটিতে লাগানো মাছধরা নৌকোয় উঠে বসেছে। জেটির পাশে নৌকোগুলো ওপরে-নীচে দুলছিল।

গরুর গাড়ি থেকে হরি নামে, এতেই সে সারা রাত কাটিয়েছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু পয়সা বের করে গাড়োয়ানকে দিতে যায়। কিন্তু সে তার হাতের চাবুকটা ওপরের দিকে তুলে ধরে বলল, 'যাও, ছোটো, ঐ যে নৌকো — তুমি ধরতে চেয়েছিলে। আমার নৌকো আসতে দেরি আছে তাই আমি এখন এক কাপ চা খেয়ে নেব। আমি তোমার জন্যে আলাদা তো কিছু করিনি, আমি তো এখানে আসতামই। তাই পয়সা দিতে হবে না।' তারপর সে চাবুকটা মারল তার বলদের পিঠে, গাড়িটা চলতে শুরু করল রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের দিকে।

সারারাত গরুর গাড়ির শক্ত পাটাতনের ওপর বসে থেকে হরির কোমর ধরে গেছে। আসলে ও রেওয়াসের বাস ধরার জন্য গ্রামের পাকা রাস্তায় অন্ধকারে একা এক ঘন্টা দাঁড়িয়েছিল। একসময় সে বুঝতে পারল যে রেওয়াস যাওয়ার শেষ বাসটা চলে গেছে আগেই — তাই গরুর গাড়িটিকে হাত দেখিয়ে থামিয়েছিল। গাড়োয়ানও তাকে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিল। 'এস, উঠে পড়, আমাকেও ভোর হবার আগে রেওয়াসে পৌঁছতে হবে, আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সে বোম্বাই থেকে আমাদের গ্রামের জন্যে মাল নিয়ে আসবে, আমাকে ওখানেই দেখা করতে বলেছে। জমির খাবার আসবে মানে ফারটিলাইজার। তুমি জান সেটা কী?'

মাঝরাতে গরুর গাড়ি থেকে ওই অপ্রত্যাশিত শব্দটি শুনে হরি বিস্মিত হল। কিন্তু তার মনে হল এ সম্পর্কে সে এমন কিছু জানেনা যাতে ব্যাখ্যা করে বলতে পারে, তাই সে চুপ করে থাকল। গরুর গাড়িতে কিছুই ছিল না, এমনকি একটা বস্তা পর্যন্ত পাটাতনের ওপর ছিলনা। গাড়িটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে হরিও

ঝুঁকে পড়ছিল, তারপর আবার পিছনে হেলে পড়ছিল। সে একদিকে থেকে অন্য দিকে ধাক্কা খাচ্ছিল। অসমান পাটাতনে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল তার, পাটাতনের বাখারিগুলোকে সমান করা হয়নি, এমনকি গিঁটগুলো পর্যন্ত উঁচু হয়ে ছিল। একধারে শক্ত করে ধরে বসেছিল হরি, পা-দুটো শক্ত করে লাগিয়ে রেখেছিল অন্য পাশে যাতে তাকে এদিক ওদিক হেলে পড়তে না হয়। 'আমার মনে হয় ফারটিলাইজার হল একধরনের সার', সে এবার বলল গাড়োয়ানকে। 'গোবর ও পচাসারের মত, তবে পার্থক্য আছে, তোমাকে কিনতে হবে।'

'ঠিক বলেছ। আমরা এখন সবকিছু রেডিমেড চাই দোকান থেকে। তাঁত বোনার দরকার নেই, ঘরে গম ভাঙানোর দরকার নেই। বাড়িতে গোবর জমিয়ে সার তৈরি করারও দরকার নেই। কেন তা আমি বুঝি না। এটা একটা নতুন ব্যাধি — খরচসাপেক্ষ ব্যাধি।' লোকটি অভিযোগের সুরে বলতে থাকে — কোন দৃঢ় অনুভব থেকে নয়, রাতের বেলায় সে তার নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে চায় যেন। তার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল মৃদু, তার ঘুম পাচ্ছিল।

'হয়তো এটাও যথেষ্ট নয় আর', হরি পেছনে বসে বলল।

'না, না, যথেষ্ট নয়।' গাড়োয়ান সায় দিল। 'কিছুই যথেষ্ট নয়।' এই পৃথিবীতে এখন আমরা এত লোক যে কিছুই যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট তেল নেই সবার জন্যে। খাবার নেই। যথেষ্ট কাজ নেই। স্কুল বা হাসপাতাল বা ট্রেন বাস বা বাড়িঘর নেই। এতবেশি লোক নিয়ে কী করে হবে, এভাবে চলতে পারে না। আগে কিন্তু এমন ছিল না।' লোকটি জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে পিঠ চুলকাতে থাকে। তার চিবুক বুকে লেগে যায়। চোখ বন্ধ করে থাকে সে — বলদ-দুটোর ওপর নিজেকে ছেড়ে দেয়। দুপাশের ধান ক্ষেতের মধ্যে সোজা রাস্তা দিয়ে তারা গাড়িটি টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ হরি বসে বসে দেখল — ধুলোর রাস্তা গাড়ির নীচে থেকে বেরিয়ে চন্দ্রালোকিত নদীর মত দুপাশের মাঠ ভেদ করে চলে গেছে। মাঠ ফাঁকা কেননা শীতকাল হওয়ায় মাঠের গম আগেই কেটে নেওয়া হয়েছে। কঙ্কেশ্বর পাহাড়ের ওপর চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় গম গাছের খোঁচা খোঁচা গোড়াগুলো ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দে রাস্তার ওপর থেকে নিশাচর পাখিরা উড়ে যায়, পেঁচার ডাকও শোনা গেল। মাঝে মাঝেই ওরা আমবাগানের পাশ দিয়ে এসেছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে আমবাগানগুলোকে মনে হয়েছে কালো রংয়ের বিশাল তাঁবুর মত। রাস্তার পাশের দোকানও দু'একটা চোখে পড়েছে, মিট মিট করে হেরিকেনের আলো জ্বলতে দেখা গেছে সেখানে। একটা কুকুর এমনি একটা দোকানের কাছ থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির পাশে পাশে এগিয়ে এসেছে ঘেউ ঘেউ করতে করতে, তারপর নিজে নিজেই ফিরে গেছে। পুনরায় নৈঃশব্দ, শুধু গাড়ির ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ ছাড়া। হরি পাটাতনের ওপর শুয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

রেওয়াসের জেটিতে গিয়ে হরি অবাক হয়ে দেখল লোকজনে ভরে গেছে জায়গাটা। সে ভাবতে পারেনি এত লোক বোম্বাই যাবে। সে ভেবেছিল কোন রোমাঞ্চকর কাজ সে করতে যাচ্ছে, তাই সে উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তায় কাঁপছিল। এখানে এসে দেখল ছেলে, বুড়ো, নানা বয়স ও আকারের মানুষ তাদের সবচেয়ে পরিষ্কার পোশাক পরে এসেছে। কফি রঙের সমুদ্র পর্যন্ত জেটির দৈর্ঘ্য পূর্ণ হয়ে উঠেছে তাদের ভিড়ে। নৌকোগুলো ঢেউয়ে দুলছে, এখন ওদের ওঠার অপেক্ষায়।

আলিবাগ থেকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন আদারকার। তিনি সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে যাঁরা নৌকোয় চড়ছিল তাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ফেরির টিকেট কাউন্টার পেরিয়ে এগিয়ে গেল হরি, একটা ফলের দোকানও ছিল যেখানে লোকেরা পথের জন্যে কলা ও মোসাম্বি কিনছিল। জেটির শেষ প্রান্তে পৌঁছে হরি একটু ইতস্তত করল — সে যদিও জেলেদের গ্রাম থাল থেকে এসেছে, তবু অনেকদিন সে মাছ ধরার নৌকোয় চড়েনি। তখনই সে আদারকারের চিৎকার শুনল, 'যাও এগিয়ে যাও — গ্রাম ও জীবিকার জন্যে লড়তে হলে আমাদের যেতেই হবে।' তা শুনে ওর পেছনের লোকজন এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই হরি ধাক্কায় ধাক্কায় একেবারে নৌকোর মধ্যে গিয়ে পড়ল।

যখন সূর্য উঠল ম্যাড়মেড়ে সমুদ্রটা ময়ূরের নীল ও পান্নার সবুজ রং ধারণ করল। দূরের তীরবর্তী এলাকার বোম্বাই শহরকে সমুদ্র-এর রঙে খুবই উজ্জ্বল দেখাল — বালি কিম্বা লবণের তৈরী একটা সাদা প্রাসাদ যেন নীল আকাশের সীমা স্পর্শ করেছে। ইতিমধ্যে সব নৌকো ভর্তি হয়ে চলতে শুরু করেছে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে যেন ডলফিনের দল এগিয়ে চলেছে।

রেওয়াস থেকে বোম্বাই চৌদ্দ কিলোমিটারের পথ। যেতে যেতে সারাক্ষণ চাষী ও জেলেরা গান গাইছিল, চিৎকার করছিল। তাদের গলার স্বর একটা নৌকো থেকে অন্য নৌকোয় শোনা যাচ্ছিল। সবাই খুবই ফুর্তিতে ছিল, কেননা এমন বেড়াবার সুযোগ তাদের আসেনা সচরাচর। তারা কোনদিন দিনের কাজ ছেড়ে এভাবে গ্রাম থেকে চলে আসেনি। তাই এটা তাদের কাছে ছিল ছুটির দিন। আদারকারের তাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছিল ওরা কেন বোম্বাই যাচ্ছে। ওঁর কণ্ঠস্বর একসময় বেশ ভাঙা ভাঙা হয়ে ওঠায় একজন জেলে তার ঘামে-ভেজা জামা ধরে টেনে বলল, আপনি বসুন একটু, বোম্বাই গিয়ে এত চিৎকার করতে হবে যে এখন থেকে দম রাখা দরকার। ওখানে গিয়ে আমরা এমন চেঁচাব যে শহরের সব লোক শুনবে। আপনি চিন্তা করবেন না। এখন বসে একটু বিশ্রাম নিন।' তারপর একজনকে ডেকে বলল, 'আদারকার ভাইকে চা দিয়ে যাও।' সে একটা মাটির ভাঁড় নিয়ে এল। তাতে অর্ধেকটা চা, বাকিটা আনতে গিয়ে পড়ে গেছে। ওরা ওদের নেতাকে চা এগিয়ে দেয়, তিনি বসে পড়েন ও চায়ে চুমুক দেন। অন্য একজন মোসাম্বি একটা ছাড়িয়ে একটা একটা করে ওঁর দিকে এগিয়ে দেয়। উনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও সবার পরামর্শ গ্রহণ করেন।

হরির সঙ্গে চা বা ফল কিছুই ছিল না, সে রাতে বাড়ি থেকে কোন খাবার আনেনি। চুপচাপ নৌকোর মেঝেতে বসেছিল সে. কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। ওই নৌকোতে থাল গ্রামের আর কেউ ছিল না। সবাই উপকূলঘেঁষা বিভিন্ন গ্রামের অপরিচিত মানুষ। হরি ওদের কথা শুনছিল। কিন্তু খুবই ক্লান্ত বোধ করছিল সে। গরমে তার তেষ্টাও পেয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল সে। চিন্তা না করে যে অনিশ্চিত ভ্রমণের ঝুঁকি নিয়েছে সে, তার ভয় —। আসলে চিন্তা করার মত মনের অবস্থা ছিল না তার — খুবই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সে। একদিনও তার আর থাল গ্রামে বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। তার মনে হচ্ছিল একটা পরিবর্তনের সময় এসেছে। অনেকদিন ধরে নতুন কিছু করার কথা সে যা ভেবে আসছে, এখনই যেন তা করা দরকার। সেকি ভুল করেছে?

এখন অবশ্য ফেরার প্রশ্ন নেই। মিছিলে যোগ দিয়েছে সে। এখন জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে বাড়ি পৌঁছনো ভিন্ন তার আর ফেরার পথ নেই। একবার বোম্বাই পৌঁছলে ওকে ওখানে থাকতেই হবে। কাজ করে জীবনধারণের ব্যবস্থা করতে হবে। সে কি তার জন্যে প্রস্তুত? নিশ্চিত হতে পারে না সে। পিছন ফিরে তাকিয়ে রেওয়াসের সিক্ত উপকূলাঞ্চল চোখে পড়ল। পৌঁছনোর পক্ষে তা এখন বেশ দূর। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে হতাশায় চোখ বুজল হরি।

'ছেলেটিকে দেখ', কে একজন বলল। 'এটি কার ছেলে? তোমার সঙ্গে খাবার নেই বাবা? ঠিক আছে এই নাও।' বলে সে তিনভাঁজ করা একটা ঠাণ্ডা শুকনো রুটি হাতে ধরিয়ে দেয়। হরি নিল কিন্তু ওর গলা এত শুকিয়ে ছিল যে ওর মনে হল রুটিটি সম্ভবত চেবানো বা গিলে ফেলা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। কিন্তু সৌজন্যবশতঃ সে রুটিটিতে কামড় দেয়। কিছুটা ক্ষিদে মেটায় সে শারীরিক শক্তি পেল।

এই শক্তি তার প্রয়োজন ছিল কেননা আজ তার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।

তাদের নৌকো সবুজ ঢেউয়ের ওপারে বোম্বাই শহর যত এগিয়ে আসছিল, ততই একটা ভয় পেয়ে বসছিল হরিকে। নৌকো থেকে নামার সময় চারদিকে চেয়ে থাকতে তার ভালো লাগার কথা, কিন্তু ভিড় নৌকোয় শক্ত হয়ে বসে লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার ফলে গায়ে ব্যথা অনুভব করছিল সে। কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার কোন ফুরসৎ ছিল না। সঙ্গের লোকজন তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। আসলে তারা ঠেলছিল কেননা পেছন থেকে ঠেলা খাচ্ছিল তারাও। বোম্বাইয়ের জেটিতে বেশ ভিড় ছিল, সবাই আগে যেতে চায়, সবারই তাড়া আছে — এত ব্যস্ততা হরি গ্রামের জীবনে কখনো দেখেনি। এর মধ্যে সে লক্ষ্য করল দুপাশে জাহাজগুলো দাঁড় করানো আছে, ক্রেনে করে মালপত্রের বিশাল গাঁট নামানো হচ্ছে। খালি গায়ে ঘর্মাক্ত অবস্থায় কিছু লোক মাথায় ও কাঁধে করে বাক্স পেঁটরা, ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল।

আর ঠিক তাঁদের গ্রামের মেয়েদের মতোই ঝুড়িতে করে চকচকে মাছ নৌকো থেকে নামিয়ে বাজারে নিয়ে যাচ্ছে। খড়, কাদা ও মাছের আঁশ পথের ওপর পড়ে থাকায় রাস্তাটা খুবই পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। শহরের গন্ধের সঙ্গে তার পরিচিত সমুদ্র ও মাছের গন্ধ মিলে একটা অদ্ভুত আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। আর ছিল শহরের কোলাহল —— জেলেদের চিৎকার চেঁচামেচি নয়, থালে যা শোনা যায় না কখনো সেইসব যানবাহনের শব্দ। এবার ওরা গেট দিয়ে বাইরে এসে রাস্তায় ভীতিপ্রদ যানবাহনের মধ্যে পড়ে। সেই এক মুহূর্তে রাস্তায় যত যানবাহন হরি দেখল সারাজীবনে তা কোনোদিন দেখেনি। থালে খুবই অনিয়মিতভাবে একটা বাস গ্রামের প্রধান রাস্তা দিয়ে গিয়ে হাইওয়েতে পড়ত, প্রাইভেট কার দেখা যেত ক্বচিৎ কখনো — যখন ও আলিবাগে এসেছিল, সেখানে দেখেছিল প্রধানত সাইকেল। কিছু সাইকেল রিক্সা, আর বাস লরি তো ছিলই। কিন্তু এখানে সবকিছু একসঙ্গে — যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত যানবাহন বোম্বাইয়ের রাস্তায় নেমেছে। সাইকেল, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, বাস, কার, ট্যাক্সি ও লরি সব একসঙ্গে নানা শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছে। হরি ভয়ে পাশের লোকটির হাত শক্ত করে ধরে, তারপরই স্বস্তি পেল দেখে যে লোকটি তাদের থাল গ্রামেরই এক চাষী, নাম মাহে।

'তাড়াতাড়ি চল ভাই, থেম না, আমাদের কালোঘোড়ার কাছে যেতে হবে', মাহে হরিকে বলল —। তারপর দুজনে যানবাহনের মধ্যে দিয়ে ছুটে পেরোতে গিয়ে একটা বড় লাল রংয়ের ডাবল-ডেকার বাসের মুখে পড়ল। বাসটা তৎক্ষনাৎ ঘ্যাঁচ শব্দ করে থেমে গেল ওদের মুখের সামনে। ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বের করে ওদের দিকে গর্জন করে উঠল। ওরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকল।

তখনই পুলিশ এসে হাজির হয় — বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পুলিশ, হাতের লাঠি দেখিয়ে ও মুখের বাঁশি বাজিয়ে যারা সব যানবাহন থামিয়ে দিতে পারে। ওরা মিছিলও নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন মিছিল করে আলিবাগ থেকে ওরা এসেছে।

'কোত্থেকে এসেছ, অ্যাঁ?' পুলিশ হরির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'কখনও ট্রাফিক লাইট দেখনি? কী করে রাস্তা পার হতে হয় তাও জাননা? কুমড়োর খেত থেকে সোজা চলে এসেছে এখানে, যত্তোসব।'

'ওদের ওখানেই পাঠিয়ে দেওয়া দরকার, গিয়ে কুমড়ো ফলাক, তাড়িয়ে দাও বোম্বাইয়ের রাস্তা থেকে', বাসের ড্রাইভার রাগে চিৎকার করতে থাকে।

পুলিশটি হেসে বাস থামাবার জন্যে হাত তুলে রাখল ও অন্য হাতে মিছিলের লোকদের রাস্তা পার হওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল।

'আমরা চাষী ও মৎসজীবি, আলিবাগ থেকে এসেছি', মাহে রাস্তা পেরনোর আগে আস্তে করে বলে, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'তাই কর', পুলিশ বলে, 'তাই কর, উনি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে চা, মালা ও মিষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছেন।' ব'লে জোরে জোরে হাসতে লাগল ও বাস

ড্রাইভারের দিকে তাকাল। তারপর তীক্ষ্ণ শব্দে বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি যাওয়ার পথ করে দিল। হরি ও তার সঙ্গীরা খুব আহত ও অপমানিত বোধ করতে করতে এগিয়ে গেল।

'এই বোম্বাইঅলারা খুবই অভদ্র হয়', মাহে মন্তব্য করে। হরি শুধু মাথা নেড়ে সায় দেয়। এতক্ষণ যা ঘটল তা সারা দিনের ব্যঙ্গবিদ্রূপের শুরু মাত্র। রহস্যময় কালো ঘোড়ার দিকে যেতে রাস্তা জুড়ে তাদের এইরকম অনেক কিছু শুনতে হয়েছে। হরি ভয়ে ভয়ে দশ তলা বিশ তলা বিশাল বাড়ি ও বড় বড় দোকানগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। দোকানের বড় বড় জানালাগুলোর জায়গাতেই তাদের থাকার মত কুটির তৈরি হতে পারে। আর এত লোক রাস্তা ছাপিয়ে পড়ছিল যে হরির মনে হল তাদের সংখ্যা সমুদ্রের মাছের চেয়েও বেশি। যেতে যেতে হরি কালো ঘোড়ার কথা চিন্তা করছিল। এই অদ্ভুত শহরে কি কালোঘোড়াকে দেবতা বলে মানা হয়? ব্যগ্র হয়ে কালো ঘোড়া খুঁজছিল সে, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল দেখার জন্যে, কিন্তু সে দেখছিল শুধু মানুষজন, বাড়ি ও যানবাহন, সে শুধু শুনছিল গাড়ির হর্নের শব্দ, গীয়ারের ঘড় ঘড় শব্দ, বিশাল ডাবল-ডেকার, বাস, ট্যাক্সি ও কারের গর্জন। লোকেরা বাজারের ব্যাগ, হাত ব্যাগ, ব্রীফকেস হাতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল ওদের ফেলে। তাদের মুখে বিরক্তি দেখা দিচ্ছিল — 'এই আবার একটা মিছিল, সব আটকে দেবে।' 'এবার এরা কিসের দাবি জানাচ্ছে?' 'আমরা তো বাস ধরতে পারব না, অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে।' 'এই সর, সর, যেতে দাও।'

একবার অন্য একটা মিছিল ঠিক ওদের সামনে দিয়ে চলে যায়। ওদের দাঁড়াতে হয়েছিল যতক্ষণ না মিছিলটি চলে যায়। হরি খুব বিস্মিত হয়ে দেখল, মিছিলে যারা হাঁটছিল তারা সবাই মহিলা। ওদের হাতে ধরা ছিল ব্যানার, হাত মুঠো করে ওপরের দিকে তুলে চিৎকার করছিল — 'জিনিসের দাম কমাতে হবে, আমাদের তেল চাই, চিনি চাই, ন্যায্যমূল্যে চাল চাই', এবং 'উইমেন্স সোসাইটি ফর ফ্রিডম এ্যান্ড জাস্টিস জিন্দাবাদ।' ওদের পুরোভাগে ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। তাঁর মাথায় পাকা চুল। হাতে কাঠের একটা খুন্তি নিয়ে তিনি ওপরে তুলছিলেন স্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অন্যরা তাতে মজা পাচ্ছিল ও মহিলাকে উৎসাহ দিচ্ছিল। কারো হাতে ধরা ছিল রান্নার পাত্র, তাতেই শব্দ করছিল, কারো হাতে রান্না করার বড় হাতা, জোরে শব্দ করতে করতে যাচ্ছিল — ব্যাপারটা ওরা সবাই উপভোগ করছিল বলে মনে হল।

হরি সহ আলিবাগ এলাকার গ্রামবাসীরা তা দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়েছিল। ওদের সঙ্গে একজন মহিলাও নেই, আনা জরুরী মনে করেনি কেউ। ওদের ধরণা, পুরুষরা নিজেরাই সব করতে পারবে, যেখানে সেখানে মেয়েদের নিয়ে এসে ঝামেলা বাড়ানোর দরকার নেই। বোম্বাইয়ে এসে ওদের মনে হল, মেয়েরা কোন কাজ পুরুষদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারে না, নিজেদের

ব্যাপার নিজেরাই সামলাতে ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হরির কাছে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তাই সে অন্যদের সঙ্গে হাসিতে বা ঠাট্টায় যোগ দেয় নি, বরং ধীরভাবে হাঁটতে থাকল। সে ভাবছিল মা ও লীলা এই মিছিল দেখলে কী বলত।

ওদের পাশে পাশে এখন পুলিশ হাঁটছে, লাঠি হাতে ভিড় সামলে সুশৃঙ্খলভাবে সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হল ওরা এমন মিছিল দেখতে খুবই অভ্যস্ত, তাই তারা জানে কিভাবে কি করতে হয়। হরি দেখল, ওদের একটা বড় গোলাকার জায়গার কাছে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে গম্বুজযুক্ত বড় বড় বাড়ি ঘিরে আছে, তাদের চারপাশে আছে গাছপালাযুক্ত একটা পার্ক। 'দেখ, দেখ, যাদুঘর', কেউ চেঁচিয়ে বলল। অন্য একজন বেশ উত্তেজনার সঙ্গে জিগ্যেস করল, 'আমরা দেখতে যাব না?' কিন্তু না, ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিশাল বিশাল খয়েরি রঙের অফিস বাড়িগুলোর দিকে, মধ্যিখানে চতুঃষ্কোন একটা জায়গা, যেখানে রয়েছে একটা উঁচু বেদীর মত, তাতে কিছু নেই। 'কালো ঘোড়া, কালো ঘোড়া', হরি লোকজনকে বলতে শুনলো। সে জিগ্যেস করল, 'কোথায় কোথায়?' অন্য একজন উত্তর দেয়, 'তুমি জাননা বুঝি? ইংরেজরা যখন দেশ ছেড়ে যায়, সঙ্গে করে কালো ঘোড়াও নিয়ে গেছে, বোম্বাইয়ের লোকেরা বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে তাড়ানোর সঙ্গে, কালো পাথরটিকে হটিয়ে দিয়েছে।' 'ওহ', খুব হতাশ হয়ে হরি উচ্চারণ করে। তার ইচ্ছে ছিল সে সম্রাটকে তার ঘোড়ার ওপর বসে থাকতে দেখে। তাই সে উঁচু ফাঁকা বেদীটির দিকে চেয়ে থাকল। কালোঘোড়ার বেদীর ওপরে বসা অবস্থায় কল্পনা করল। অন্য লোকজন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওদের চারপাশে যানবাহন অবিরাম গতিতে আসা-যাওয়া করছিল, যেন কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই ওরা কেন এসেছে বা এখানে কী করছে।

স্তম্ভ বা বেদীটির পাশে একটা কাঠের মই লাগানো হয়েছিল, আর একজন রোগা দাড়িঅলা বয়স্ক ব্যক্তি তার ওপর উঠল। আলিবাগের কেউ ওকে চেনেনা। তিনি একটা মেগাফোন মুখের সামনে ধরে কথা বলতে শুরু করলেন। যানবাহন চলাচলের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে হরি কথা শোনার চেষ্টা করল।

'আমি আপনাদের সামনে কিছু বলতে এসেছি, আমি আপনাদের পক্ষে কথা বলতে চাই, কেননা আপনাদের জীবনযাত্রার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কেননা আপনাদের সবুজ মাঠ ও সমুদ্র আপনাদের কাছে যেমন মূল্যবান, আমাদের কাছেও তেমনি। আমাদের গাছপালা, আমাদের মাছ, আমাদের গরু বাছুর ও পাখিকে রক্ষা করতে হবে। ...'

হরি বুঝতে পারছিল না উনি কে, আর কেনই বা উনি অমন আবেগের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওকে শহরের মানুষ বলেই মনে হল, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং শিক্ষিত ব্যক্তি — ধুলো ও রোদে কাজ করা গ্রামের মানুষদের মত নয়। তবুও তিনি মাছ, গরু ও গাছপালার কথা বলছিলেন আন্তরিকভাবেই। উনি এসবের জন্যে এত চিন্তা করছেন কেন?

তিনি যেন হরির ভাবনার কথা বুঝতে পেরেছেন এমনভাবে উত্তর দিলেন, 'আপনারা ভাবতে পারেন, বোম্বাই শহরের একজন লোক হয়ে আমি কেন গ্রাম থেকে আসা ভাইদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি এবং তাদের হয়ে কথা বলছি। আপনারা হয়ত আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। একদিক থেকে, আপনারা ঠিকই ভাবছেন, কারণ আমার কিছু স্বার্থগত কারণ আছে। সারা বোম্বাই শহরের লোকজন চিন্তিত হয়েছে জেনে যে থাল-বৈশতে যে কারখানা তৈরি হবে, তা থেকে নানা মারাত্মক কেমিক্যাল বাতাসে ছড়াবে — আশেপাশের বেশ কয়েক মাইলের আবহাওয়াকে দূষিত না করে কোন কারখানতে ফারটিলাইজার তৈরি হতে পারে না। সালফার ডায়ক্সাইড, এ্যামোনিয়া ও ধুলো সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। সম্প্রতি সরকার থেকে ঠিক করা হয়েছিল যে বড় শহরের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন ফারটিলাইজার কমপ্লেক্স তৈরি হবে না। কিন্তু রেওয়াস থেকে বোম্বাইয়ের দূরত্ব আপনারা জানেন মাত্র চৌদ্দ কিলোমিটার, যে দূরত্বে কাক উড়ে যেতে পারে। এমনিতেই বোম্বাই শহরে প্রচুর কলকারখানা, ভিড় এবং এখানকার বাতাস দূষিত। আর কত দূষণ আমরা সহ্য করতে পারব? আপনারা কি জানেন, জাপানে অর্গ্যানিক মার্কারি সমুদ্রে ফেলা হয়েছিল, ফলে মাছ সব বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, এবং সেই মাছ যারা খেয়েছিল সেই হতভাগ্য মানুষেরাও বিষের কবলে পড়েছিল ...'

হরি শুনবার খুব চেষ্টা করছিল কিন্তু অপরিচিত যানবাহনের শব্দে তার মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছিল। তার নিশ্চিত মনে হচ্ছিল মোটরগাড়ি আর বাসগুলো যেন সোজা তার দিকেই তেড়ে আসছে। সতর্ক নজর না রাখলেই সে নির্ঘাৎ চাপা পড়বে। সে উসখুস করছিল, তার চারপাশের লোকেরা তার গায়ের ওপর এসে পড়ছিল, আর মাথার ওপর দিয়ে ঝুঁকে একে অপরের সঙ্গে কথা বলছিল। বক্তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য বুঝতে তাদের অসুবিধে হচ্ছিল।

'আপনাদের যদি চাষবাস ও মাছধরার কাজ ছাড়তে বাধ্য করা হয়, তাহলে গ্রাম ছেড়ে আপনাদের শহরে কাজের খোঁজে চলে আসতে হবে। বোম্বাই শহরে চারদিকে তাকিয়ে দেখুন — এখানে কি আরও বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লোকের জায়গা হবে? আপনাদের কি মনে হয় এখানে এত লোকের থাকার জায়গা ও কাজ পাওয়া যাবে? এই শহরের গরীব ও বেকার লোকেরা কিভাবে থাকে দেখুন। সবুজ মাঠ ও নারকেল গাছঘেরা গ্রামের বসবাস ছেড়ে আপনারা কি শহরের ফুটপাথে ভিখারীদের জীবন গ্রহণ করবেন?

এসব শুনে হরির গা-টা কেঁপে উঠল। তার মনে হল, দাড়িঅলা ব্যক্তিটি যেন ওকে লক্ষ্য করেই কথা বলছে, প্রশ্ন করছে। বিস্ময়ে ওর মুখটা হাঁ হয়ে গেছে — কিভাবে তিনি জানতে পারলেন যে হরি এখানে কাজ খুঁজতে এসেছে? হরি তার মনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করেনি। তার মনের কথা সে নিজেই ভালো বোঝে না। কিন্তু মনে হল বক্তা যেন তার সম্পর্কে সব কিছু জানেন। 'কে উনি?' সে

মাহেকে জিগ্যেস করল। মাহে ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, অবাক হয়ে বক্তৃতা শুনছিল।

'সৈয়দ, ওরা বলছিল ওঁর নাম সৈয়দ আলি বা ওরকম একটা কিছু', মাহে উত্তর দেয়। 'রাজনৈতিক নেতা নন, তবে জানিনা কেন এরা ওকে এখানে বলার জন্যে ডেকেছে।'

'উনি খুব ভাল বলতে পারেন', হরি বলল, 'খুবই ভাল।'

এখন তিনি বিদায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন আর একজন ছোটখাট ব্যক্তি রংচটা সুতির শার্ট ও নাকের ওপর দড়ি বাঁধা চশমা পরে উঠছেন তার জায়গায়। ওঁকে মাইক দেওয়া হতেই উনি জোরালো কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করলেন। ওঁর কণ্ঠস্বর বোঝা শুধু কঠিনই ছিল না, তিনি যা বলছিলেন তাও বোঝা হরির পক্ষে সম্ভব ছিল না। সব কথাই হরির কাছে নতুন ও অপরিচিত। কিন্তু শহরের এই ব্যক্তিরা কী করে হরির চেয়েও বেশি জানলেন থাল ও উপকূলের অন্যান্য গ্রামগুলির কথা? নিজেদের বড় অজ্ঞ মনে হল তার, যেমনটি আর কোনদিন হয়নি।

'আপনারা আলিবাগ থেকে এসেছেন', ভদ্রলোক বলতে শুরু করেছেন, 'আলিবাগ বলতে আপনারা নিজের বাড়ি বোঝেন, কিন্তু আমরা যারা আবহাওয়া অফিসে কাজ করি, তাদের কাছে আলিবাগ হচ্ছে পৃথিবীর বিখ্যাত জিওম্যাগনেটিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, পৃথিবীতে এরকম একটিমাত্রই আছে। 1841 সালে এটি বোম্ব য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল — আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে কা কিন্তু 1904 সালে এটাকে আলিবাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, কারণ হল বোম্বাই শহরের ট্রাম সার্ভিসকে বৈদ্যুতিকরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এর ফলে পর্যবেক্ষণের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

'হুঁ?' পাগড়ি তুলে মাথা চুলকিয়ে মাহে বলল, 'কিসব পর্যবেক্ষণ-টেক্ষণ বলছে?'

'জানি না', শুনে বোঝার চেষ্টা করতে করতে হরি উত্তর দিল।

এখন আলিবাগের কাছে যদি ফারটিলাইজার কারখানা তৈরি হয়, তাহলে ইলেকট্রিক কারেন্ট ও বিশাল লোহালক্কড়ের স্তূপ যা এখন জড়ো করা হয়েছে, তা থেকে পর্যবেক্ষণের কাজ ব্যাহত হবে।'

হরির মুখে ভ্রুকুটি দেখা দিল। সে কিছুই আর বুঝতে পারছিল না।

'আমরা সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং ও-এন-জি-সি অর্থাৎ অয়েল এ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনকে সংবাদ সরবরাহ করি। এটা দেখা খুবই জরুরি যে আমাদের কাজ যেন ব্যাহত না হয়। 1846 সাল থেকে এভাবেই কাজ হয়ে আসছে, এখন এই কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তা আমরা হতে দিতে পারি না।' বক্তার গলা ধরে যায়। তিনি থেমে বড় একটা রুমাল দিয়ে মুখ মোছেন। তাঁকে দেখে যে-কেউ বুঝতে পারবে যে তিনি অফিসে কাজ করতে যত অভ্যস্ত, সভায় বক্তৃতা দিতে তত স্বচ্ছন্দ নন।

'আমরা — আপনারা — সবাই মিলে এই কাজের জন্যে গর্বিত। এটাকে রক্ষা করতেই হবে যে-কোন মূল্যে।' এবার তিনি মাইক ছেড়ে দিয়ে নীচের ভিড়ে নেমে এলেন। বক্তৃতা শেষ হয়েছে এই স্বস্তিতে জনতা হাততালি দেয়। বক্তা নিজেও যেন রেহাই পেয়ে মৃদু হাসলেন।

'উনি কে? উনি কী বলছিলেন?' সবাই জিগ্যেস করছিল একে অপরকে।

'আলিবাগের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তুমি দেখেছ?' একজন জিগ্যেস করে। 'আমি দেখিনি ওটা কোথায় আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমুদ্রের ধারে একটা ছোট সাদা বাড়ি, আমি জানি।' একজন বিজ্ঞের মত বলে। 'কিন্তু ওটা যে এত প্রয়োজনীয় তা জানতাম না।'

'উনি তো বললেন পৃথিবীবিখ্যাত।'

'উনি যখন বললেন, তখন হবে নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, ওটা খুবই দামী ব্যাপার', সবাই মেনে নিয়ে মাথা নাড়ে।

কিন্তু অন্য একজন মোটা বড়সড় চেহারার তরুণ সবার মাথার ওপর দিয়ে জোরে জোরে বলল, 'একটা পুরনো বাজে অবজারভেটরিকে শুধুমাত্র পুরনো বলেই টিকিয়ে রাখতে হবে? আমাদের চাষের জমি, আমাদের ফসল, আমাদের নৌকো — সেসবের কী হবে? এসবের জন্যই তো এখানে আমাদের আসা — ওই লোকটির পুরনো অফিস, তার ফাইলপত্র কিংবা ওদের কাজের সমর্থনে আমরা আসিনি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই তো।' একজন বয়স্ক লোক যুবকটিকে খুশি করার জন্য বলে। 'নিন, একটু ধূমপান করে নিন, তারপর আমাদের জমি, আমাদের নৌকো নিয়ে ভাবা যাবে।'

এবার তৃতীয় বক্তা বেদীতে উঠলেন। তিনি ওদের নিজেদের নেতা, আদারকার — তাই তারা উচ্চৈস্বরে ওঁকে স্বাগত জানায় রোদের তাপ উপেক্ষা করেও।

আদারকারের বক্তৃতা শুনে ওরা আবার প্রাণ ফিরে পেল, কেননা ওঁর ভাষা ওদেরই মুখের ভাষা, বলার বিষয় যা তা ওদেরই মনের কথা, যা ওরা সবচেয়ে ভালো বোঝে। তিনি আগে যা বলেছিলেন সেই কথাগুলোই পুনরায় বললেন ওদের জমির উর্বরতার কথা, উৎকৃষ্ট ফসলের কথা। শুধু ফ্যাকটারি বানানোর কাজের জন্য সেসব ছেড়ে দেওয়া যায় না বা নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। তিনি আরও বললেন, টাকা পয়সা বা চাকরির লোভে যেন গ্রামবাসীরা না ভোলেন, কেননা সেসব কিছুই পাওয়া যাবে না — শুনে সবাই মাথা নাড়ল ও হাততালি দিল।

'আমরা সরকারকে জানাতে এসেছি, যে সামান্য টাকাপয়সা ওরা আমাদের দিতে চান, আমরা তা চাই না — আমাদের জমি আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, আমরা তা বিক্রি করতে চাই না। আমরা ওদের গোলাম হবার জন্য কারখানা কাজ করতে চাই না। আমরা সবসময় স্বাধীনভাবে কাজ করেছি ও জীবিকা-নির্বাহ

করেছি, আমরাই আমাদের প্রভু থেকেছি। এখন আসুন, আমরা মন্ত্রণালয়ে যাই, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করি। ভাইসব, এগিয়ে চলুন।' তিনি হাত মুঠো করে ওপরে তুললেন এবং শেষ কথাগুলো গর্জন করার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন।

সেই গর্জন ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল জনতার মধ্যে। হঠাৎ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হল। জনতা ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। হরি দেখল যে সব লোক তার পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা অন্যদিকে সরে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি একদল লোককে পেরিয়ে অন্য একদল লোকেব কাছে পৌঁছল, তবু বুঝতে পারলনা সবাই কোথায় যাচ্ছে বা ওকেও যেতে হবে কিনা।

মোটাসোটা যুবকটির হাত জড়িয়ে ধরে হরি তার কাছে জানতে চাইল, 'আমরা কি সবাই মিলে এখন মিছিল করে মন্ত্রণালয়ের দিকে এগিয়ে যাব?'

ঠিক তখনই মাইকে ঘোষণা শুনল, 'বন্ধুগণ, আপনারা আসুন ডকের দিকে ফিরে যান, সেখানে আমাদের নৌকো অপেক্ষা করছে। আমাদের মধ্যে থেকে কেবল পাঁচজন আবেদন নিয়ে মন্ত্রালয়ে যাবেন, আমিও থাকব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর অমরা ডকে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব এবং একসঙ্গে ফিরে যাব।'

'ওই তো, তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলে', মোটাসোটা চেহারার তরুণটি হরিকে বলল।

হরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল জনতা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। নিজেকে পরিত্যক্ত ও বন্ধুহীন মনে হল তার। গ্রামের বন্ধুরা কেউ আসেনি — তারা ঘরে বসে মনের আনন্দে আশায় আশায় দিন কাটাচ্ছে, কবে ফার্টিলাইজার কারখানা তৈরি হবে, কবে তারা সেখানে কাজ পাবে। হরি তাদের ছেড়ে এই মিছিলে যোগ দিয়েছিল এই কারণে যে সে থাল ছেড়ে বোম্বাই আসতে চেয়েছিল। মন থেকে কখনও মানেনি যে সে ওই মিছিলেরই একজন। তার না আছে জমি, না আছে মাছধরার নৌকো যার জন্য সে লড়াই করবে? তাছাড়া সে মিছিলের লোকজনদের কাউকে তেমন চেনেনা। ওরা মূলতঃ চাষী ও মৎসজীবি, ওর বাবার মত ভূমিহীন বা নৌকোবিহীন বেকার নয়। ওরা চেনেও না তার বাবাকে। এখন সে তাই বুঝতে পারল সে কোন দলেই পড়ে না। সে কারো বা কোন দলেরই নয়। সবাই তাকে ইতিমধ্যে ছেড়ে চলে গেছে। সে এখন বোম্বাই শহরে একা।

থালের ক্ষুদ্র কুটিরে বসে কেউই বোম্বাই অভিযান বা বিজুর নৌকো জলে ভাসানোর কথা ভাবছিল না। হরি বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর বোনেরা সারারাত মার বিছানার পাশে পালা করে বসে থেকেছে। তার মুখে একটু একটু করে জল দিয়েছে, কপালে ভেজা কাপড়ের পট্টি লাগিয়েছে। আধঘুমে কখনো কখনো বেলা বা কমল বিড় বিড় করেছে, 'হরি ফিরেছে?' লীলা নিঃশব্দে মাথা নেড়েছে।

সারারাত এইভাবে কাটিয়ে ওরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে সূর্য ওঠার ঠিক আগে সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পিন্টোও নেই যে বাড়ির বাইরে

গিয়ে শিশিরসিক্ত ঘাসে ছুটে বেড়াবে ও খালের ধারে গিয়ে বককে তাড়া করবে। এমনকি লীলাও মার বিছানার ধারে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার প্রাত্যহিক পুজোকর্মের কথা ভুলে। ঘুম ভাঙতেই লীলা দেখল বেশ বেলা হয়ে গেছে। সকালের রোদ তাকে বিব্রত করল। পিন্টোর নিস্তব্ধতা ও হরির আকস্মিক অন্তর্ধান তাকে ইতিমধ্যেই বিমর্ষ করেছে। সে ভাবল হরি নিশ্চয় রাতের মধ্যে ফিরে
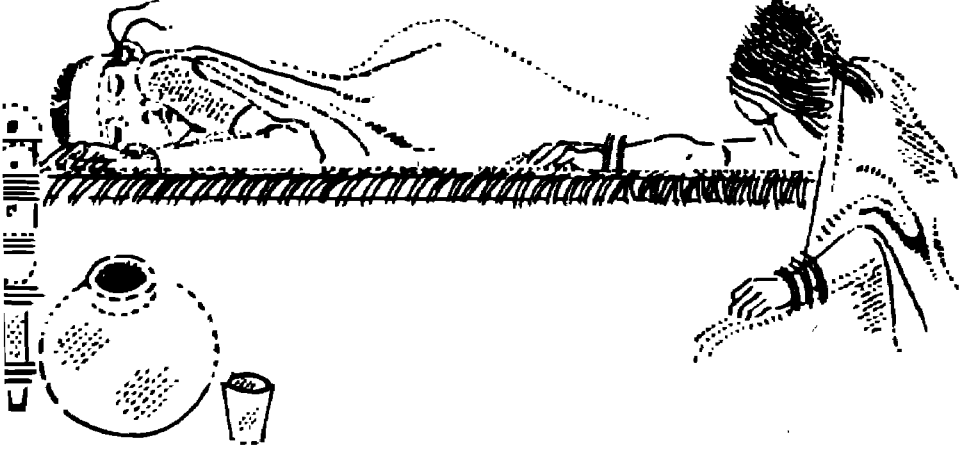
এসেছে। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই সে চোখ ফেরাল মার রুগ্ন নিস্পন্দ শরীরের দিকে, জ্বরে এখনও গা পুড়ে যাচ্ছে। অন্য সমস্ত চিন্তা তখন তার মাথা থেকে চলে গেল।

'কমল, বেলা', বোনেদের ঘুম থেকে তুলে চা খাইয়ে লীলা বলল, 'বাজারে গিয়ে মার জন্যে কিছু বরফ নিয়ে আয়। ওদিকে হরি আছে কিনা দেখবি। দেখতে পেলে ডাকবি — ও হয়তো রাতে মন্দিরের ওখানে রাত জেগে নাটক দেখেছে। ওকে বলবি বাড়ি আসতে আর তোরা কিছু বরফ সঙ্গে আনবি।'

মেয়েরা রান্নাঘরের তাকে কিছু পয়সা রেখেছিল সেগুলো নিয়ে ছুটলো বীচ পেরিয়ে। বিজুর নৌকো জলে ভাসানোর যে চেষ্টা হচ্ছিল সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। অবশ্য গ্রামের বেশিরভাগ লোকেরই আজ নৌকো নিয়ে আগ্রহ ছিলনা। বিজু যাদের কাজ করার জন্য নিয়ে এসেছিল তারা ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না বললেই চলে। বেলা ও কমল দেরি না করে সোজা বাজারে বরফের দোকানে গেল। সেখানে লীলার বন্ধু মীনার সঙ্গে দেখা হল — মীনা ব্যাগে করে তরি-তরকারি নিয়ে ফিরছিল। 'তোরা শুনেছিস?' ওদের ডাকল মীনা, 'গ্রামের লোকেরা সব বোম্বাই গেছে সরকারের কাছে পিটিশন করতে। কে যেন বলছিল হরিও ওদের সঙ্গে গেছে।'

'হরি?' ওরা থেমে গিয়ে মীনার দিকে চাইল। 'হরি বোম্বাই গেছে? না, না ও যেতেই পারে না। নিশ্চয় এ দিকে কোথাও আছে।'

'কোথায়? আমি তো দেখিনি ওকে। তোরা রাজুকে জিগ্যেস করতে পারিস। ওই তো আমাকে বলছিল।'

'তার দরকার নেই, আমরা মার জন্যে বরফ কিনতে এসেছি। এখনই ছুটতে হবে, মার খুব জ্বর।' ওরা তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলে দৌড় লাগাল।

ওরা যখন বাড়ি পৌছল, দেখল লীলা সবে পিন্টোকে সামনের গাছটির নীচে মাটি খুঁড়ে কবর দিয়েছে। এখন ও মাটিটা সমান করছিল। যখন সে ওদের খালের রাস্তা পেরিয়ে দৌড়ে আসতে দেখল, তখন উঠে দাঁড়াল এবং নিজের হাত ও শাড়ি ঝেড়ে নিল। মেয়েদুটো দাঁড়ায় এসে এবং তারপর নিঃশব্দে বারান্দায় গিয়ে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে। ওরা দেখল দিদি কাঁদছে, কিন্তু সান্ত্বনা জানানোর মত কোন কথা ওদের জানা ছিল না। ওরা বুঝতে পারল, ওদের নিজেদের চোখও জলে ভরে গেছে।

তারপর বেলা ঢোঁক গিলে বলল, 'লীলা, মীনা বলছিল হরি অন্য সবার সঙ্গে বোম্বাই গেছে। রাজু ওকে নাকি বলেছে।'

লীলা এমনভাবে তাকাল যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। হরি এত রাগতে পারে কিম্বা এত ভেঙে পড়তে পারে যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে? সে কিছুই বুঝতে পারে না। ও নিজে কোনদিন পালিয়ে যাবে না। অসম্মতি জানিয়ে ও মাথা নাড়ল। এখানে বাস করা খুবই ভীতিপ্রদ ও কঠিন তাদের কাছে, কিন্তু তবুও সে আছে — মা ও বোনেদের ওকে দেখতে হয়, তাকে থাকতেই হবে। কোন কথা না বলে ও ঘরের ভিতরে চলে গেল। হরি যদি না আসে, সে নিজেই আলিবাগে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে এবং মার জন্য ওষুধ নিয়ে আসবে। মাকে বাসে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তাই সে-ই মার অবস্থাটা ডাক্তারের কাছে বর্ণনা করবে এবং তার সাহায্য চাইবে। হরি আজ এখানে থাকলে ও-ই যেতে পারত, এবং ব্যাপারটা কত সহজ হত।

যখন সে বেরোবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, বাইরে কিসের একটা হট্টগোল শুনলো। মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের অপরিচিত শব্দ শোনা যাচ্ছিল তাদের রাস্তায়। তারপরই দেখল এক বিস্ময়কর দৃশ্য ঃ একটি গাড়ি ঘাসের ওপর লাফাতে লাফাতে 'মন রিপোজ' নামের সাদা বাংলো বাড়িটির দিকে যাচ্ছে।

'ওরে বেলা, ও কমল, দেখ', লীলা চিৎকার করে বলল, 'বোম্বাই থেকে ডি সিলভারা এসেছে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে হরি কালো ঘোড়ার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করল, জায়গাটা ছেড়ে দূরে যেতে তার সাহস হল না কেননা এই একটি মাত্র জায়গাই সে ভাল করে চিনেছে। যেসব রাস্তা ডকের দিকে গেছে, সেইসব রাস্তা দিয়ে গ্রামের লোকেরা চলে গেছে। কেউ তাকে যেতে বলেনি তাদের সঙ্গে, কেউ তাকে আদৌ লক্ষ্য করেনি। তাকে সবাই ফেলে রেখে গেছে।

এখন একা হওয়ার ফলে সে সচেতন হল যে তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। সে দেখল একটা বড় বাড়ির সামনে একটা লোক ঠেলা গাড়ির ওপর ডাব নিয়ে বসে আছে। হরি ওর দিকে এগিয়ে গেল, নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখল কিছু পয়সা যা সে বাড়ি থেকে এনেছিল এখনও আছে। 'কত দাম?' সে জিগ্যেস করল। জীবনে কোনদিন তাকে ডাব কিনতে হয়নি। যখনই দরকার হয়েছে গাছে উঠে গিয়ে এক কাঁদি ডাব নামিয়ে এনেছে, ডাবের দাম সম্পর্কে তার কোন ধারণা থাকার কথা নয়। তাই সে জিগ্যেস করায় লোকটি যখন বলল, 'দু টাকা', তার মূর্চ্ছা যাওয়ার মত অবস্থা হল। লোকটির কালো তীক্ষ্ণ চেহারা, কথা বলছিল মুখে সিগারেট রেখে। কিন্তু সে যখন হরির মুখের অবস্থা দেখল, কিছুটা সদয় হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? শহরে এসব জিনিসের দাম কত জান না বুঝি? মনে হচ্ছে জান না। ঠিক আছে, আমি তোমার জন্যে শস্তা দামের একটা দিচ্ছি।' বলে সে একটা ছোট ডাব খুঁজে বের করল এবং তার বাঁকা ছুরিটা দিয়ে এক কোপে কেটে হরির হাতে দিল। হরি যখন ডাবের জল খাচ্ছিল, লোকটি লক্ষ্য করল। মজা পেয়ে বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সারাদিন কিছু খাওনি।'

'কিছু খাইনি', হরি স্বীকার করে। তারপর মুখ মোছে এবং ডাবের মাথার অংশটা ধরে ভেতরের মিষ্টি শাঁসটুকু বের করে খায়। 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে, জল তেষ্টাও পেয়েছে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি', ডাবওয়ালা মাথা নাড়ে। সেসময় তার অন্য কোন

খদ্দের ছিল না, তাই সে হরির সঙ্গে এত কথা বলতে পারে। ‘গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছ, তাই না?’

‘আমি মিছিলের সঙ্গে এসেছিলাম’, হরি বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই বলল। ‘এইখানে যে মিছিলটা এতক্ষণ ছিল, দেখেছ? আজ সকালে আমরা আলিবাগ থেকে এসেছি।’

‘তাই না কি? তা সরকারের কাছে কী চাইতে এসেছিলে — খাবার, রাজপ্রাসাদ না সোনাদানা?’

তাদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে হরি বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ডাবওয়ালার সেসবে কোন আগ্রহ ছিল বলে মনে হল না। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সে শুধু বলল, ‘চাও, চাও, যা খুশি সরকারের কাছে চাও। তোমার কি মনে হয় সরকারের কান আছে এবং শুনতে পায়? তোমার কি মনে হয় সরকারের চোখ আছে এবং দেখতে পায়? আমি বলছি তোমাকে, সরকারের শুধু একটা মুখ আছে যা দিয়ে খায়। আমাদের টাকা খায়, আমাদের জমি খায়, গরীব মানুষকে খায়। আমার উপদেশ যদি মানো, তো সরকার থেকে দূরে থাক। কিচ্ছু চেও না, কোন কিছুর জন্যে নির্ভর কোর না। ওরা বলে, সরকার আমার মা-বাপ। আমি তোমাকে বলছি, আমার বাবা-মা আমাকে ছয় বছর বয়সে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। নিজের রুজি রোজগারের জন্যে বাবা মায়ের আমার দরকার নেই, আমি নিজে নিজেকে খাওয়াই। আমি একজন পুরুষ, আমার রুজি আমি নিজেই রোজগার করি। এটাই

হল স্বাধীন থাকার সব থেকে ভাল পথ, বুঝেছ ছোকরা? কারো দয়া চাইবে না, তাই ধন্যবাদ দেওয়ারও দরকার নেই, তোমার যা দরকার নিয়ে নেবে। মানুষ হও, স্বাধীন হও।'

হরি শুনে মাথা নাড়ল। সে ডাবওয়ালাকে খুব বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ও শ্রদ্ধেয় বলে মনে করল। ওর পায়ের কাছে বসে শিখতে প্রস্তুত সে, কিন্তু কখনই তার মনে হল না যে লোকটি হরিকে শেখাতে আগ্রহী হবে। যেমন একদিন বাবা ও মাকে তার দরকার হয়নি, তেমনি হরির মত ছাত্রও তার দরকার হবে না। বড় বাড়িটা থেকে এক তরুণ ও এক তরুণী হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে ডাবওয়ালার গাড়ির সামনে দাঁড়ালে সে ডাব কেটে দেওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। হরি জানত, তার ময়লা কাপড় ও ক্ষুধার্ত মুখ নিয়ে এখনই সরে যাওয়া উচিত।

ফুটপাথ ধরে হরি এগিয়ে যায়। চার পাশে নোংরা জমে ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তাই তাকে আস্তে আস্তে সাবধানে হাঁটতে হচ্ছিল। এমন সময় সে কাকে যেন বলতে শুনলো 'ওই বিল্লুর কথায় কান দিওনা। ওর কাছ থেকে দূরে থাক, লোকটা সাঙঘাতিক। দিনের বেলায় ডাবে ছুরি চালায়, আর রাতে সেটা ব্যবহার করে —।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হরি বক্তাকে দেখল, একজন ভিখারি, ছেঁড়া মাদুরের ওপর বসে একটা আঙুল নিজের গলায় টানছে। তারপর পানখাওয়া জিভ বের করে দেখাল সে কী বোঝাচ্ছে। হরিকে খুবই চমকে যেতে দেখে ভিখারিটা খুব জোরে জোরে হাসতে লাগল, আর তার পানখাওয়া গোটা মুখটা দেখা গেল।

'অবাক হচ্ছ? তুমি বুঝি জাননা রাস্তার লোকেরা এমনি করেই বেঁচে থাকে? পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে সামনে অমন একটা নিরাপদ কোনও পেশা, আর পিছনে বিপজ্জনক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ। তুমি কি ভাবো ডাব বেচে কিংবা ভিক্ষে করে একটা লোকের দিন গুজরান হতে পারে? আমার কাছে শুনে যাও, কিছুতেই হয় না। কী করে শহরে পয়সা রোজগার করতে হয় তা যদি জানতে চাও, আমি বলে দেব। তবে সামান্য ফি দিতে হবে।' হরিকে জায়গা করে দেওয়ার জন্যে মাদুরের একধার ঘেঁষে বসল সে।

হরি কিন্তু কোন লোকের কাছে এমন বিপজ্জনক কৌশল শিখতে চায় না, তাই সে মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত পা চালাল। সে দেখতে পেলনা ভিখারিটি হেসে তার কাপড় চোপড়ের ভিতর থেকে একটা বোতল বের করে তাতে চুমুক দিল। ভিখারি, বদমায়েস বা খুনী হবার জন্যে হরি শহরে আসেনি। কেন সে এসেছে হরি জানেনা, শুধু এটুকু জানে যে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে নিজের ভাগ্যে কী আছে দেখতে। এখন সে বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছেছে, সে এবার দেখবে কী হয়।

বিশাল চকটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে এবার ভয় পেল হরি, তার মনে হল, বিপজ্জনক লোকেরা যেন বেরিয়ে আসছে আশপাশ থেকে। এমনকি খালি

স্তম্ভটাকেও অশুভ মনে হতে লাগল তার — রাজার মূর্তি না থাকাটা তার কাছে একটা বার্তা বলে মনে হল যেন। ভয় থেকে পেয়ে পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল যাতে সে ওখান থেকে সরে যেতে পারে। কাছেই নারকেল গাছঘেরা একটা চওড়া পার্ক দেখে সে ভাবল ওখানে ছায়ায় ঘাসের ওপর বিশ্রাম নিতে নিতে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা দেখবে। কিন্তু যখন সে এগিয়ে গেল, সামনে রাস্তার শেষে দেখতে পেল সমুদ্রের জল চকচক করছে — সমুদ্রের গন্ধ পেল সে, গন্ধ পেল মাছেরও।

হঠাৎ বাড়ির কথা, আপনজনের কথা মনে পড়তে পার্কের কথা ভুলে সে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। দেখল রাস্তাটা সমুদ্রকে ঘিরে রেখেছে। এমন দারুণ দৃশ্য হরি কখনো দেখেনি — রাস্তার একধারে গাছের চেয়েও উঁচু বড়বড় প্রাসাদ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর অন্য দিকে শান্ত উজ্জ্বল পালিশকরা ধাতুর মতো চকচকে সমুদ্র। যদিও ওখানে কোনও নৌকো নেই, জেলে নেই। সমুদ্রের ধার দিয়ে রাস্তা বেয়ে কেবল অবিরাম যানবাহনের গর্জন।

সমুদ্র ও প্রাসাদোপম বাড়িগুলোর মধ্যেকার রাস্তা দিয়ে এগোল হরি। একসময় সে একটা বালিময় বীচে এসে হাজির হল। বীচে লোকজন ভর্তি, দোকান, রঙীন পানীয়, ডাব ও খাবার সব বীচের ওপর। বীচের চেয়ে মেলার মাঠের সঙ্গে যেন বেশি সাদৃশ্য — খুঁটির সঙ্গে বাঁধা বেলুন উড়ছে, দোকানে ফুলের মালা, প্লাস্টিকের খেলনা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা বালির ওপরে খেলা করছে, লোকজন দোকানের সামনে ভিড় করছে, আর এমন সব খাবার খাচ্ছে যা হরি কোনদিন দেখেনি।

হরি একধারে যখন দাঁড়িয়ে চেয়ে ছিল, একটা গাড়ি তখন ঠিক তার পেছনে এসে থেমেছে। গাড়ি থেকে এক পরিবারের অনেকে আনন্দে চিৎকার হৈ-হল্লা করতে করতে নামল। ছেলেমেয়েরা নতুন পোশাকে, মেয়েরা পরেছিল সুন্দর সব শাড়ি, আর পুরুষেরা হাসিমুখে ওদের খাবার ও খেলনার দোকানের দিকে নিয়ে গেল।

ওদের দেখে হরির মনে পড়ে গেল, ওর পকেটে ডি সিলভাদের বোম্বাইয়ের ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজটা রাখা ছিল, ওরা একসময় ওকে কাজ দিতে চেয়েছিল। বোম্বাইয়ের একটা ঠিকানা ওর কাছে আছে এবং তার জানা লোক সেখানে আছে যারা তাকে সাহায্য করতে পারে — মনে করার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বস্তির ভাব ঠাণ্ডা সতেজ ও বন্ধুত্বময় সমুদ্র হাওয়ার মত এসে ওকে পূর্ণ করল।

হরি কাছের একজন দোকানদারের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি বাচ্চাদের কাছে নানা রংমেশানো বরফজল বিক্রি করছিল — কাগজটা তাকে দেখিয়ে হরি জানতে চাইল, এই ঠিকানাটা কোথায় তা সে জানে কি না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', চোখদুটোকে ওর দিকে ঘুরিয়ে লোকটি হাসল, 'দারুণ ঠিকানা পেয়েছ তো হে। তুমি নিশ্চয় কোন ছদ্মবেশী রাজকুমার' বলে সে একটা বাচ্চার দিকে সবুজ রঙের বরফের গোলা এগিয়ে দিয়ে পয়সা নিল। তারপর হরিকে বলল, 'সোজা রাস্তা ধরে ওপরে উঠে যাও, মালাবার হিলে পৌঁছবে, ওখানেই তোমার রাজপ্রাসাদ দেখতে পাবে। তোমার জন্যে বোধহয় কোন রাজকুমারী মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে।' লোকটি চোখ টিপে হাসল।

লোকটির হাসি বা রসিকতা কোনটাই হরির পছন্দ হয়নি। সে যতটা সম্ভব ব্যক্তিত্ব নিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করল, মুখটা সবসময়ের মতই গম্ভীর, শুধু তার বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় ছটফট করছিল।

লোকটি যেমন বলেছিল, রাস্তাটা তেমনি ওপরে উঠে গেছে। দুপাশে বড় বড় বাড়ির সারি, সেগুলো ছাড়িয়ে সে গাছপালা ও পার্কের ওপরে তৈরি বাগান দেখতে পাচ্ছিল। শহরটা যে এত বড় ও বিশাল তা সে কোনদিন ভাবে নি। তার আরো অবিশ্বাস লাগছিল এই ব্যাপারে যে এখানকার কোন একটি বাড়ির লোকজন তাকে চেনে।

তার আশা দীর্ঘস্থায়ী হলনা। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গোলাপের মতো লাল সূর্য সমুদ্রে ডুবেছে, শহরে অন্ধকার নেমেছে। ওপরে উঠতে উঠতেই ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। দ্বীপের মতো শহরটির এই পাহাড়ে আলো জ্বললে মণিমাণিক্যের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছিল। পিছনে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছিল রাস্তা নীচে নেমে গিয়ে সমুদ্রকে ঘিরে চলে গেছে, দুপাশে দু'সারি করে উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে। এটাই কি সেই বিখ্যাত কুইন্স নেকলেস জায়গা যার কথা সে আগে শুনেছে? তার মনে হল নিশ্চয় এটা সেই জায়গা। সে চেয়ে দেখল, নিয়ন আলোয় বিজ্ঞাপনগুলো নিভছে জ্বলছে এবং সবুজ নীল ও কমলা রং ছড়াচ্ছে। উত্তেজনা ও ভয়ে তার বুক দুরু দুরু করছিল।

বাড়িটা যখন সে খুঁজে পেল, তখন রাত হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও অন্ধকার ছিল না। রাস্তার আলোর সঙ্গে শত শত জানলা থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে ছিল। সে তার সারা জীবনে এত আলো চোখে দেখেনি। রাত বলতে এতদিন যা সে দেখেছে এ তা নয়। তার মনে হল অন্ধকার থাকলে বুঝি ভালো হত, তাহলে অন্তত সীবার্ড নামের দীর্ঘ সাদা বাড়িটায় ঢোকার সময় কেউ তাকে দেখত না।

সে অবশ্য ভেবেছিল বাড়িটায় ডি সিলভারা নিজেরাই থাকে, কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখল অচেনা লোকজনের বেশ ভিড়, যেন একটা বাস গুমটি বা জাহাজঘাটা। একজন লোক ভেতরে একটা ছোট ঘরের দরজা খুলে লোক ঢোকাচ্ছে, তারপর দরজা বন্ধ করতেই সবাই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আবার হঠাৎ দরজা খুলে যাচ্ছে,

নতুন-একদল লোক ঢুকে যাচ্ছে। হরি এটা বুঝতে পারল না, কিন্তু ও যখন লোকটিকে জিগ্যেস করল ডি সিলভারা আছেন কিনা সে বলল, 'ঢুকে পড়, দশ তলা।' দশ বার জন লোকের মধ্যে ওকে ঠেলে দিয়ে লোকটি দরজা বন্ধ করল, তারপর দরজার বোতাম টিপতে ছোট ঘরটি হঠাৎ ওপরের দিকে উঠতে লাগল। হরি ধাতস্থ হবার আগেই ঘরটা থেমে গেল, দরজা খুলে গেল হাট করে, লোকটি ওকে হাত দেখিয়ে বেরোতে বলল, 'একশো দুনম্বর'। তারপর দরজা বন্ধ করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

হরি এখন বাড়িটার মাঝখানে। সে চারপাশে তাকাল, কিন্তু বন্ধ দরজা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না তার। দরজাগুলোর নম্বর খুব কাছ থেকে দেখতে থাকল সে এবং একসময় পিতলের ওপর 102 লেখা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় ধাক্কা দিল কিছুক্ষণ। তারপর সাদা প্যান্ট ও উঁচু কলারের সাদা কোট পরা লম্বা মতন একজন দরজা খুলল, 'দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিস কেন বুদ্ধু? বেলটা দেখতে পাচ্ছিস না?' সে চেঁচিয়ে বলল।

হরি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কোন ঘন্টা ঝুলছে কিনা। কিছু না দেখতে পেয়ে বলল, 'কই না তো?' তারপর আস্তে করে বলল, 'কোথায় আছে?'

'এই যে বুদ্ধু, এখানে,' রেগে গিয়ে লোকটা দরজার একটা সাদা বোতামে হাত দিয়ে দেখাল। হাত দিতেই হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দে ঘন্টা বেজে উঠল। 'কে তুই, কী চাস?'

'আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব', হরি ফিস ফিস করে বলল। লোকটির পাশ দিয়ে তাকিয়ে দেখল আলোয় উজ্জ্বল ঘর, মেঝেয় কার্পেট পাতা, বড় বড় আকারের আসবাব। ছবি, আয়না ও ফুল দিয়ে সাজান। নিজের ময়লা চটিতে ধুলোমাখা পা দুটো সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল সে। ভাবল, এই অবস্থায় কোনদিন কি সে ওই ঘরের ভিতরে ঢুকতে পারবে?

দরজায় দাঁড়ান লোকটির ওকে ঘরে ঢুকতে দেওয়ার ইচ্ছে কখনো হবে বলে মনে হলনা। 'সাহেব? কে পাঠিয়েছে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে? চিঠি নিয়ে এসেছিস?'

হরি পকেটের কাগজ-টুকরোতে হাত রাখল, 'এই যে নাম ঠিকানা লেখা আছে।'

'এটা কে দিয়েছে?'

'উনিই দিয়েছেন আমাকে।'

'সত্যি কথা বল'।

'সত্যি বলছি, উনি যখন থালে এসেছিলেন, আমি ওঁর গাড়ি ধুয়েমুছে দিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন বোম্বাই এলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

'থাল?' লোকটি এবার ভুরু কোঁচকাল। শব্দটি ওর চেনা মনে হল। হরি এবার ভরসা করে ওর মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু যা শুনল তাতে আরও একবার ধাক্কা খেল।

'সাহেব এখানে নেই, থালে গেছেন, যেখান থেকে তুই এসেছিস। আজ সকালেই গেছেন সব্বাই মিলে — গরমের ছুটি কাটাতে। ফিরে এসেই আবার উনি বিদেশে যাবেন। ওঁর বড় কারবার জানিস নিশ্চয়। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ব্যবসা আছে। সেখানে একমাস কাটিয়ে তারপর ফিরবেন।' এই পর্যন্ত বলে সে হরিকে নিরীক্ষণ করল, তারপর আবার বলল, 'তা তুই থাল থেকে এসেছিস, তাই না? রান্নার লোক ও আয়ার কাছ থেকে থালের কথা শুনেছি বটে. ওরা বলছিল খুবই জংলা জায়গা নাকি। তা, তুই এখানে কী করছিস?'

'আমি কাজ খুঁজছি', হরি ফিসফিস করে বলল। 'আমি থাকতে চাই।'

লোকটি বিরক্ত হল, ভয় পেয়েছে মনে হল। 'যা এখান থেকে যা', চেঁচিয়ে বলল সে।' এখানে তোর কোন কাজ হবে না, সাহেবের অনেকজন চাকর আছে, আর দরকার নেই। অন্তত থালের কোন ছেলেকে দরকার হবে না। যা, কোন কাজ এখানে হবে না। এখানে থাকাও যাবে না।' শেষ কথাগুলোর পুনরুক্তি করে লোকটি পিছিয়ে গেল ভেতরে, তারপর দরজাটা জোরে বন্ধ করে দিল।

হরির কিছুই করার ছিল না। বোতাম টিপে অমন জোরে শব্দ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, আবার দরজায় ধাক্কা মারবে সে সাহসও হলনা। এখন কী করবে, রাত কোথায় কাটাবে ভাবতে ভাবতে অসহায়ভাবে সে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল। এমন সময় যে লোকটা ওকে ছোট বাক্সটার মধ্যে ওপরে নিয়ে এসেছিল, সে হঠাৎ দরজা খুলে ডাকল, 'নীচে যাবে? কেউ নিচে যাবে?' হরি সঙ্গে সঙ্গে বাক্সর দিকে এগোল এবং রকেটের গতিতে বাক্সটা নীচে নেমে ওকে বাড়ির নিচে পৌঁছে দিল।

ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল হরি, কোথায় যাবে এখন সে জানেনা। বন্ধুহীন এই শহরে আদৌ সে এসেছিল কেন তা ভাবছিল। তখন বাড়ির গেটের পাশে উঁচু টুলের ওপর বসে থাকা একটা লোক ওকে ডেকে জিগ্যেস করল, 'কি চাও তুমি? কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?'

'ওরা এখানে নেই', হরি মাথা নেড়ে উত্তর দিল, 'ওরা চলে গেছে — 102 নম্বরের ওরা।'

লোকটি ওর দিকে আর নজর দিল না, যারা আসছে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সিঁড়ির কাছে কয়েকজন ছেলে মার্বেল নিয়ে খেলছিল। তাদের অন্য জায়গায় গিয়ে খেলার জন্যে বলল। ওরা লোকটির দিকে চেয়ে হাসল। বেশ কিছুক্ষণ পর জায়গাটা ফাঁকা হলে লোকটি ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেল হরি তখনও দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। এবার সে ওর দিকে এগিয়ে এল।

'তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বুঝি?' সে জিগ্যেস করল।

কথা না বলে হরি মাথা নাড়ল। সে এত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত, দুর্বল ও ভীত হয়ে পড়েছে যে হাঁটতে বা কথা বলতে পারছিল না।

'হুঁ' শব্দ করে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুর মত বলল, 'বলছি কী — আর আধ ঘন্টা পর আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাবে, রাতের পাহারাদার আসবে। আমি যাব গোয়ালিয়া ট্যাঙ্কে, ওখানেই আমি থাকি। আমি তোমাকে আমার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাব, ওর কাছে তুমি খাবার পাবে। তোমার তো খিদে পেয়েছে খুব, তাই না?'

কেউ এত দয়া দেখাতে পারে বা সাহায্য করতে পারে এটা বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না হরির। তাই সে তাকিয়ে থাকল। লোকটি হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধে রাখল, তারপর বলল, 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।'

লোকটির নাম হীরা লাল, গত বার বছর ধরে সীবার্ড বাড়িটির প্রহরায় আছে — বেশ রাত করে ওর সঙ্গে যেতে যেতে হরি শুনল। যানবাহন, বড় বড় দোকান ও রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে গিয়ে ওরা পাহাড়ের নীচের রাস্তায় পৌঁছল। সেখানে ছোট ছোট দোকানের সারির মধ্যে কম পয়সার খাবারের দোকান চালায় হীরা লালের বন্ধু জগু। জগুই ওকে শস্তায় খাবার দেবে, রাতে ঘুমোতে দেবে। 'আমি এই রাস্তা দিয়ে রোজ আসাযাওয়া করি। কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।' বলে হীরা লাল চলে গেল হাত নেড়ে।

জগু তার খদ্দেরদের টিনের থালায় রুটি ও জলমেশানো পাতলা মুসুরির ডাল পরিবেশন করছিল। হরির দিকে একবার তাকিয়ে একটা খাবারের থালা তার দিকে এগিয়ে দিল, কোন কথা বলল না। ওকে দেখে হরির মনে হল যে সে ভাল পোশাকপরা হীরা লালের মত ভালমানুষ নয়। আসলে পোশাক তার তেমন কিছু ছিলনা বললেই চলে — একটা ময়লা লুঙ্গি কোমরের কাছে জড়িয়ে রেখেছে শুধু, খালি গায়ে ঘামছে। কিন্তু হরি দেখল, লোকটির দয়ামায়া আছে। সে তার থালাটা নিয়ে বসে পড়ল ও মাথা নীচু করে সারাদিনের একমাত্র খাবার দ্রুত খেতে থাকল। খাওয়া শেষ হতেই জগু এল এবং আর একখানা রুটি থালায় ফেলে দিল। হরি সেটাও খেল, কেননা খুবই ক্ষিদে পেয়েছিল তার। বাড়িতে সে মোটামুটি এমন খাবারই খায় কিন্তু জীবনে সে এত ক্ষুধার্ত, এত ক্লান্ত কোনদিন হয়নি।

খদ্দেররা সব চলে গেলে জগু ওকে হাত দেখিয়ে ইঙ্গিত করল যেন সে লম্বা কাঠের বেঞ্চিগুলোর যে কোন একটিতে শুয়ে পড়ে। হরি সঙ্গে সঙ্গে তাই করল — শক্ত বেঞ্চি, রাস্তায় শব্দ ও আলো সত্ত্বেও সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এত ক্লান্ত, দুর্বল ও উদ্বিগ্ন ছিল হরি ওই প্রথম রাতে যে সে কোথায় ঘুমিয়ে ছিল সে সম্পর্কে তার খেয়াল ছিল না। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সে জায়গাটা প্রথম তাকিয়ে দেখল।

'শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়'-এর মত এত বাজে অপরিচ্ছন্ন খাবারের দোকান হরি দেখেনি — এমনকি থালের আলিবাগ-রেওয়াস হাইওয়েতে যেগুলো দেখেছে সেগুলোও এর চেয়ে ভাল, সাধারণত আম বা অন্য গাছের ছায়ায় কাঠের চালাঘর তৈরী করা হয় সেখানে, গাঁদা ও জবা ফুল পুরনো কালির দোয়াতে পুরে ফুলদানি সাজানো হয়, রঙিন সিগারেট প্যাকেট সোডাওয়াটারের বোতল বেশ সুন্দর করে গোছানো থাকে তাকে এবং সম্ভবত কোন দেবদেবীর ঝলমলে ছবি দেওয়ালে টাঙানো থাকে, ফ্রেমের ওপর মালা ঝোলানো হয়, উগ্র গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি জ্বালানো হয় তার সামনে।

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্কের 'শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়'-এ কোন পত্রিকা থেকে কাটা শ্রীকৃষ্ণের ছবি পর্যন্ত দেওয়ালে সাঁটা ছিল না। কিংবা থাকলেও হয়তো দীর্ঘদিনের জমে ওঠা ঝুল-কালিতে তা ঢেকে গিয়েছিল। সিলিংজুড়ে মাকড়সার জাল বিছানো, তাতে ঝুল জমে মাথার ওপর কম্বলের মত আস্তরণ তৈরি হয়েছে। মেঝে ও কাঠের টেবিলগুলোর রং কালো হয়ে গেছে, কালিঝুল তাদেরও ওপর পড়েছে। আর সারাদিন ধরে খোলা উনুনের কালি জমছে, উনুনে অ্যালুমিনিয়াম কড়াইয়ে ডাল ফুটছে, হাত দিয়ে রুটি বানিয়ে সেঁকা হচ্ছে।

এটা সম্ভবত বোম্বাই শহরের মধ্যে সবচেয়ে শস্তা খাবার জায়গা, এখানে একজন ভিখারিও কিনে খাবার সামর্থ্য রাখে, কেননা এখানকার খদ্দেররা সাধারণত ভিখারি, মুটে ও ঠেলাওয়ালা — এরা মাল বইবার ফাঁকে এখানে এসে খেয়ে নেয়। এইসব লোকদের কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না, ভোরবেলায় আগের রাতের বাসি খাবার কিছু খেয়ে কাজে বেরোয় ও সারাদিনের খাটাখাটুনি সেরে ঘরে ফেরে

যখন সারা শহর ক্লান্তিতে ঢলে পড়েছে নিদ্রার কোলে। এই কারণে ভোজনালয়ের মালিকের সময় থাকে না ঘর মোছা বা পরিষ্কার করানোর, আর টাকাও নেই তেমন যে ফুল ও ছবি দিয়ে সাজাবে।

নিজেও সারাদিন পরিশ্রম করে সে, সাহায্য করার জন্যে দুটো ছেলে আছে, তাবা বড় বড় পাত্রে আটা মাখে, চাপাটির মত করে বেলে আগুনে সেঁকে দেয়। দিনরাত উনুনের আগুন জ্বলছে এসবের জন্যে।

সকালে এক কাপ চা ও একটা ভাঁজ করা রুটি হরির হাতে ধরিয়ে দেয় ওরা, কিছুই জিগ্যেস করে না। 'তোমরা যে খাবার আমাকে দিচ্ছ তার দাম দেওয়ার মত আমার কাছে কোন পয়সা নেই। আমি তার বদলে রান্নার কাজ করে দিতে পারি', হরি বলল। লোকটি তার কথায় কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, রান্নার কাজে আর একজনকেও লাগানো যায়। তুমি এই বাসনগুলো ধোওয়ার কাজ দিয়েই শুরু কর। তারপর আটা মাখানো ও রুটি বেলার কাজে সাহায্য করতে পার।
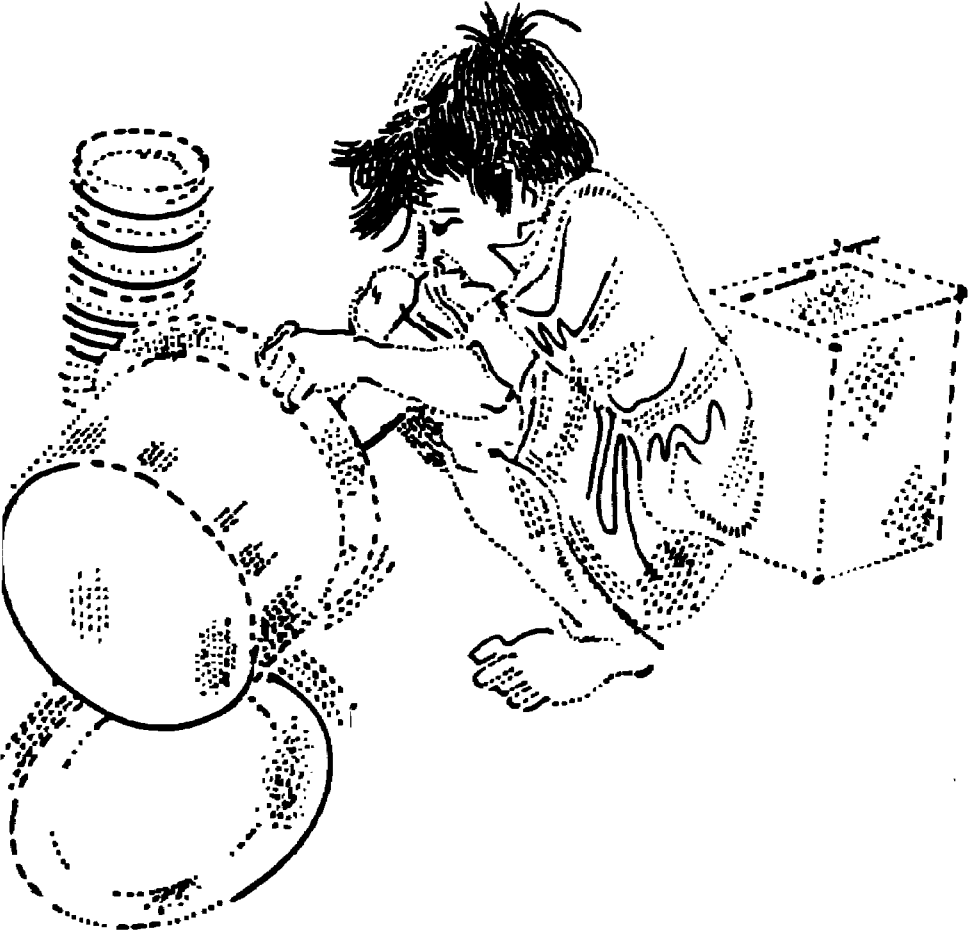
তুমি যদি চাও এখানে থেকেও কাজ করতে পার, খাবার পাবে। আর অন্যরা যা পায়, দিনে একটাকা করে পাবে।'

কাজেই হরি ভোজনালয়ের পেছনের দিকে ছোট রান্না ঘরে গেল কাজ করতে। সেখানে বড় বড় পাত্রগুলো পরিষ্কার করার জন্যে কিছু নারকেলের ছোবড়া ও উনুনের ছাই ছাড়া আর কিছু ছিলনা। সেগুলো দিয়েই যতটা সম্ভব পরিষ্কার করার চেষ্টা করল, যদিও সে জানে লীলা তার এই কাজকে মোটেই ভালো হয়েছে বলত না। যাই হোক, এবার সে ছেলেদুটোকে সাহায্য করল পাত্রে আটার বিশাল বিশাল ডেলাগুলোকে মাখতে — কাজটা কঠিন হওয়ায় ওরা সবাই ঘেমেনেয়ে উঠল। কাজ করার সময় একে অপরের সঙ্গে কথা বলছিল না। ছেলেদুটো অবশেষে যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলল, তখন হরি বুঝল ওটা তামিল ভাষা, যা সে জানে না। ওরাও হিন্দী বা মারাঠি জানে এমন মনে হল না। তাই ওদের ও হরির মধ্যে কোন কথা হল না। অবশ্য ওরা যে হরির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বা ওর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল তা নয়, অথবা এমনও হতে পারে যে কাজ করতে করতে ওরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে কথা বলার ইচ্ছেই ছিল না। ওরা দুজনে উনুনে আঁচ দিল, তারপর একজন রুটি বেলতে থাকল, অন্যজন বড় চিমটে দিয়ে সেগুলোকে সেঁকতে লাগল। আর সামনের ঘরের লম্বা টেবিলে যারা খেতে বসেছে তাদের খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব পড়ল হরির ওপর। এত কাজ করতে হচ্ছিল ওদের আর এত গরম ওই ছোট্ট জায়গাটায় যে কারো কথা বলার মত শক্তি বা সময় কোনোটাই ছিল না। হরিও চুপ করে ছিল।

হরিকে নিঃশব্দেই কাজ করে যেতে হত যদি না পাশের দোকানের ভদ্রলোক তার সঙ্গে আলাপ করতেন। দোকানটা ছিল ঘড়ি সারানোর, দরজার ওপর সাইনবোর্ডে দোকানের নাম লেখা ছিল — ডিং ডং ওয়াচওয়ার্কস। হরি যখন একটা বালতি করে দোকানের নোংরা ফেলতে যাচ্ছিল রাস্তার ধারের ময়লা ফেলার জায়গায়, তখন তিনি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। তার মাথায় ছিল কালো টুপি, চোখে কি একটা পরে হাতের তালুতে একটা ঘড়ি রেখে দেখছিলেন। হরিও হেসে প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। বয়স্ক লোকটিকে দেখে হরির মনে হয়েছিল কালো ঘোড়ার মিটিং এর বক্তা সৈয়দ আলির মত দেখতে, তাই সে সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিল তিনি একজন সহৃদয় ভালোমানুষ। তার ওপর বিশ্বাস রাখা যায় এবং তিনি ওকে বুঝবেন ও প্রয়োজনে সাহায্য করবেন।

'শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়'-এ তাহলে নতুন ছেলে এল', বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন। তারপরই নিজের হাতের ছোট ঘড়িটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পুনরায় কথা বলতে শুরু করলেন হরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। হরি দেয়ালে ঝোলানো ও শোকেসে অতসব ঘড়ি দেখতে দেখতে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। 'শহরে নতুন বুঝি?' তিনি জিগ্যেস করলেন এবার বেশ জোরে।

হরি মাথা নেড়ে সায় দিল।

'কোথা থেকে এসেছে? জগুর গ্রাম থেকে?'

'না, না। আমি জগুকে তেমন চিনিনা। আমি এসেছি থাল থেকে, থাল হল আলিবাগের কাছে।' হরি আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিল। সে দেখল তার মুখ দিয়ে সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউয়ের মত কথা বেরিয়ে আসছে, কথাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ও স্পষ্ট। নিজের ঠিকানা বলতে গিয়ে বেশ গর্বও অনুভব করল সে। কেন তা কালো ঘোড়ার সৈয়দ আলি হয়ত বুঝত, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে এই ভদ্রলোক তার কিছুই জানেন না, তিনি ধন্দে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তার কৌতূহলও হল। হরি তাই বলে, 'ওই পাহাড়ের ওপর বড় বাড়িটার দারোয়ান আমাকে এখানে এনেছিল খাওয়ার জন্যে, আমি থেকে গেছি কাজ করব বলে।'

'আরো অনেক লোকই জগুর কাছে এসেছে সাহায্যের জন্যে', বৃদ্ধ লোকটি একটা সরু লম্বা ছুঁচ দিয়ে ঘড়ির যন্ত্রপাতিতে খোঁচাতে খোঁচাতে মাথা নাড়লেন।' খুব শান্ত লোক, কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনা, কিন্তু অনেক লোকেরই ভালো করেছে ও। এই যে ছেলেদুটো ওর সঙ্গে কাজ করে — ওদের বাবা-মা ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছিল। ওরা শহরে এসেছিল কাজ খুঁজতে — থাকত প্ল্যাটফর্মে, একদিন জল আনতে গিয়ে রেললাইন পার হওয়ার সময় ওদের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে গেল। এই তো সেই ষ্টেশন।' বলে তিনি ছুঁচটা হাতে ধরা অবস্থাতেই রাস্তার দিকে হাত দিয়ে দেখালেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'সকালবেলায় ওই সময় জগু কাজে আসছিল, দেখে ছেলেদুটোকে সোজা এখানে নিয়ে এল, খেতে দিল, থাকতে দিল, কাজও দিল।'

হরি এই কাহিনী শুনে খুব মর্মাহত হল, তবে তাকে জগুর আশ্রয়ে আর একজন অনাথ হিসাবে ভাবা তার পছন্দ হল না। একজন মাতাল অন্যজন অথর্ব হলেও বাবা ও মা তো তার আছে। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম নয়, থাকার ঘর আছে তার। এইসব ভেবে সে হঠাৎ বলল, 'আমার একটা পোষ্টকার্ড কেনা দরকার, এদিকে পোষ্টাপিসটা কোথায় আছে বলবেন?'

'ওঃ হো!' বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা ওর দিকে তাকিয়ে হাসেন, 'হঠাৎ মনে পড়ল বুঝি, কাউকে চিঠি লিখতে হবে? লেখ, নিশ্চয়ই লিখবে। সোজা রাস্তা ধরে গিয়ে বাঁদিকে ইলেকট্রিক সাব-স্টেশনের পরেই পোস্টাপিস পাবে। পোস্টকার্ড কেনার পয়সা আছে, না আমি ধার দেব?'

কৃতজ্ঞচিত্তে পয়সাটা নিল হরি, এও জানাল যে জগুর কাছ থেকে টাকা পেলেই সে শোধ করে দেবে, তারপর তাড়াতাড়ি পোষ্ট অফিসের দিকে এগোল। পোষ্টকার্ড কিনে হরি দেখল লেখার জন্যে একটা পেন দরকার। তাই সে ঘড়ির দোকানে ফিরে এল আবার। কেননা তাদের খাবারের দোকানের চেয়ে ঘড়ির দোকানেই একটা পেন থাকার সম্ভাবনা বেশি। বিকেলের চড়া রোদে ঘর্মাক্ত অবস্থা হরির, দোকানে তখন

কেউ ছিলনা, অন্য ছেলেদুটোও গরম ও ক্লান্তিতে ঘুমোচ্ছে টেবিলের নীচে। হরি ডিংডং ওয়াচওয়ার্কস-এর সিঁড়িতে বসে ঘড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কাছ থেকে নেওয়া পেনটা সাবধানে ধরে লিখল —

'শ্রীচরণেষু মা,

আমি বোম্বাইয়ে আছি। একটা কাজ পেয়েছি এখানে। যা টাকা পাব তোমাদের দিয়ে আসব। আশাকরি তুমি ভাল আছ। আমি ভাল আছি। বোনেদের আমার কথা বোলো।'

এবার সে বড় বড় অক্ষরে যায়গা ভরিয়ে নিজের নাম লিখল, কিন্তু তার ঠিকানা দিল না। তারপর সে পোষ্ট অফিসের দিকে এগোল, যেতে যেতে সে আনন্দও যেমন পেল চিঠি লেখার জন্যে, তেমনি ভয়ও পেল এই ভেবে যে এখন থেকে ও বোম্বাইয়েই থাকছে, বাড়ি যাচ্ছে না।

বেলা ও কমল ছুটে এসে লীলার পাশে দাঁড়াল। সবাই দেখল, ডি সিলভারা তাদের গাড়ি থেকে নামছে। রান্নার লোক ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছে ওদের কুটিরের দিকে, খালের ওপার থেকে সে চেঁচিয়ে ডাকতেই ধূসর রঙের বুড়ো বকটা চমকে উঠল ও উড়ে গেল ঝাউ ও কেতকী গাছের দিকে।

'তোমাদের ওই ভাইটি কোথায়?' সে জিগ্যেস করল, 'ওকে আসতে বল, মালপত্র বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।'

'ও তো নেই এখানে', লীলা বলতে শুরু করে থামল, তারপর বেলা ও কমলকে মৃদু ঠেলা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোরা যা না? ব্যাগগুলো বয়ে নিয়ে যা, আর ওদের বল আমি আসছি।' সে কুটিরে ফিরে গেল মার কিছু দরকার আছে কিনা খোঁজ নিতে, আর জল খাওয়াতে। তারপর কোমরে শাড়ির কিছুটা গুঁজে নিয়ে খালটা পেরোল ওদের বাড়ি গিয়ে সাহায্য করবে বলে। সকালে আলিবাগে গিয়ে কারো সাহায্য চাওয়ার পরিকল্পনা সে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল, এইজন্য যে ডি সিলভাদের কাছ থেকে হয়ত সে আরো বেশি সাহায্য পাবে — ডি সিলভারা বড়লোক, গাড়ি আছে, ইচ্ছে করলে সাহায্য করতে পারে, লীলা চেষ্টা করে দেখবে।

লীলা ওদের ঘরগুলোকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করল, ঘরের কোণ থেকে মাকড়সার জাল সরিয়ে ফেলল, কুয়ো থেকে রান্নাঘরের জন্যে জল নিয়ে এল, তারপর বৃদ্ধ রাঁধুনিটিকে জিগ্যেস করল, 'ওঁরা এবার এখানে কতদিন থাকবেন?'

'বলছিল পনের দিন থাকবে', লোকটি গজগজ করতে করতে উত্তর দিল, 'এটা ওঁদের ছুটির সময় — স্কুল বন্ধ, আর বিলাত যাওয়ার বদলে এখানেই প্রথম পনের দিন কাটাতে চায়। আমি জানিনা এই জঙ্গলে কী করে সব ব্যবস্থা হবে। আমি বলেছিলাম, দোকানপাট কোথায় এখানে? তোমার ভাই এতদিন আমাদের দোকান বাজার করে এনে দিয়েছে, এখন বলছ ও নেই এখানে। জানিনা কোথায় রুটি, ডিম

ও সব্জি পাব। আমি জানি না কী করে কী সব হবে। তবে ওঁরা নিজেরা যখন আনন্দফূর্তি করবে, আমাকে তো তখন সব ব্যবস্থা করতেই হবে।' পরিবারের অন্যরা তখন বেতের চেয়ার টেনে নারকেল গাছের নীচে নিয়ে যাচ্ছিল এবং ছেলেমেয়েরা খেলনার ঝুড়ি, কোদাল ও রবারের বল নিয়ে ছুটোছুটি করছিল।

লীলা গোড়ালির ওপরে বসে রান্নার লোকের দিকে তাকাল, 'আমি ও আমার বোনেরা মিলে তোমাদের সাহায্য করব। আমরা বাজারে গিয়ে তোমরা যা চাও এনে দেব। থালে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়, তবে এখানে যা পাওয়া যাবে না, মাঝে মাঝে তোমাদের সাহেব গাড়ি করে আলিবাগ গিয়ে তা কিনে আনতে পারবেন।'

'ঠিক বলেছ, অগত্যা তাই করতে হবে আর কি।' লোকটির খুঁতখুঁতে ভাব তবু যায় না। 'এই নাও দুপুরে খাওয়ার জন্যে শাকসব্জি ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে রাখ। সন্ধ্যায় কি তোমরা কিছু মাছ কিনে আনবে? আর কালকের ব্রেকফাস্টের পাঁউরুটি কোথায় পাওয়া যাবে?'

'সকালে মাছ ধরে জেলেরা তীরে এসে পৌঁছলে আমি টাটকা মাছ কিনে আনব', লীলা ওকে আশ্বস্ত করল।' আমাদের এখানকার বাজারে কিছু রুটি তৈরি হয়, তবে তোমরা যদি শহরের কারখানায় তৈরি রুটি চাও, তাহলে তোমাদের সাহেবকে তা কিনতে আলিবাগ যেতে হবে গাড়ি করে।'

'সাহেবকেই যেতে হবে, আমি গিয়ে ওঁকে বলছি', লোকটি বলল।

মিঃ ডি সিলভা কিন্তু আর গাড়ি চালিয়ে পাশের শহরে যেতে চাইলেন না, কেননা সদ্য এতটা রাস্তা গাড়িতে এসেছেন, লম্বা রাস্তায় ধুলোর মধ্যে গাড়ি চালিয়ে এখন বিশ্রাম চান তিনি। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর স্নানের পোশাক পরে নিয়ে বীচের দিকে যাচ্ছিলেন সাঁতার কাটার ইচ্ছে নিয়ে। পরিবারের অন্যরা অবশ্য ইতিমধ্যেই স্নানের পোশাকে ঢেউয়ের মধ্যে নেমে জল ছেটাতে শুরু করেছে, তারা হাসছে, চিৎকার করছে। তাদের সুন্দর সোনালী কুকুরটা বীচে ছোটাছুটি করে চিৎকার করছে, বালি ছড়াচ্ছে যখনই ঢেউকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখছে।

রান্নার লোকটি দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে বিড়বিড় করল, 'ওদেরকে দেখ, এইসব করার জন্যে এতটা পথ এসেছে? বাড়িতে তো আরো আরামে স্নান করতে পারত। কিন্তু ওরা সব পাগল, তাই এমন করছে, সব পাগল —।'

পরদিন সকালে যখন রুটি শেষ হয়ে গেল, মিঃ ডি সিলভাকে গাড়িতে গিয়ে বসতেই হল। তিনি রান্নার লোককে বললেন, 'তোমার যা যা দরকার সব বল, আমি আলিবাগে গিয়ে সব কিনে আনব আজ। এরপর আর ঝামেলা করবে না কখনো।'

একথা শুনে লীলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতদুটো সামনে জোড়া করা ও দৃষ্টি নিচের দিকে, সলজ্জভাবে বলতে চাইল যা সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, 'সাব, আমার মাকে একবার আলিবাগে

হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? আপনি যদি ওদিকে যান, আমি আর মা আপনার সঙ্গে যেতাম। মা এত অসুস্থ অথচ এখানে ডাক্তার নেই, হাসপাতাল নেই।'

মিঃ ডি সিলভা এমন হতবাক হয়ে গেলেন যে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা তোতলাতে হল তাঁকে, কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী দ্রুত এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে লীলার সব কথা শুনলেন।

'তুমি তো বলনি তোমার মার অসুখ?' তিনি বললেন, 'আমি সবসময়ই কিছু ওষুধ সঙ্গে রাখি, আমি কিছু ওষুধ দিতে পারতাম।'

লীলা তাঁর দিকে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাকাল, তারপর বলল, 'মার অনেকদিনের অসুখ, এখন খুবই রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি জানিনা এই অবস্থায় কী ওষুধ দেব। একজন ডাক্তার দিয়ে দেখানো খুবই দরকার। আলিবাগে হাসপাতাল আছে, আমি তাই ভাবলাম — ভাবলাম আপনারা যদি ওকে নিয়ে যান। আমি আপনাদের কাজ করে দেব, আপনারা তো আমাকে টাকা দিতেন, সেই টাকায় ডাক্তার ও ওষুধের খরচ যদি হয়। ...'

'নিশ্চয়', মিঃ ডি সিলভা এবার জোর দিয়ে বললেন 'নিশ্চয় আমরা ওষুধের খরচ দেব। তোমাদের মাকে নিয়ে এস।'

দিনটা এত উত্তেজনাপূর্ণ ছিল যে লীলা হয়ত উপভোগ করতে পারত যদি ওই উত্তেজনার সঙ্গে দুশ্চিন্তা ও ধকল না থাকত। আলিবাগ দু-মাইল দূরে হলেও সে সেখানে যায়নি বললেই চলে, কোনদিন মোটর গাড়িতেও চড়েনি। চড়ল যখন, তখন তার চিন্তার মধ্যে শুধু মার কথা, মা পেছনের সীটে সোজা হয়ে শুয়ে ছিল লীলার কোলে মাথা রেখে, আর কাতরাচ্ছিল। তাকে এত ফ্যাকাশে ও রুগ্ন দেখাচ্ছিল যে লীলার ভাবনা হল, তার মা আলিবাগে জীবিত পৌঁছবে কিনা। পথে সে মার ব্যাপারে এত নিমগ্ন ছিল যে জানলা দিয়ে চেয়েও দেখেনি রাস্তায় — গাছপালা, গরুর গাড়ি, বাসস্টপ কিছুই দেখেনি। মিঃ ডি সিলভা বেশ জোরে গাড়ি চালিয়ে ছিলেন, হয়তো তাঁরও ভয় ছিল সময়মত লীলার মাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারবেন কিনা।

মিঃ ডি সিলভা যদি তাকে সাহায্য না করতেন তবে কী হত ভেবে লীলা আরো অসহায় বোধ করতে শুরু করল। 'এখানে দাঁড়াও আমি একটা স্ট্রেচার ও একজন নার্সকে নিয়ে আসছি, তারপর ডাক্তারের কাছে গিয়ে কথা বলব', জানলা দিয়ে এ কথা বলে তিনি কমপাউণ্ডের ভিতর ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীদের মধ্যে দিয়ে শহরের মানুষের মত দৃঢ় ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। সাদা পোশাকের দু'জন লোক স্ট্রেচার নিয়ে এল এবং লীলার মাকে ভেতরে নিয়ে গেল। একটা চাদর, গামছা, চিরুনি ও এনামেলের গ্লাসের পুঁটুলিটা সঙ্গে নিয়ে লীলাও ওদের পেছনে পেছনে ছুটল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পেরিয়ে সে হাসপাতালের একটা ওয়ার্ডে গিয়ে

পৌঁছল, সেখানে দুসারি পরপর বিছানা পাতা আছে, আর ওপরে ফ্যান ঘুরছে। ঘরটা ঠাণ্ডা আর জানলার কাঁচে সবুজ রং করার জন্যে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে। লোক দুজন স্ট্রেচার থেকে তার মাকে নামিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দিল এবং একজন নার্স দ্রুত তার দিকে এগিয়ে এল।

'এখানে দাঁড়াও, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব। তারপর তোমাকে নিয়ে ফিরে যাব', মিঃ ডি সিলভা বললেন। লীলা মাথা নেড়ে বিছানার এক পাশে বসল — ভয় পেয়ে কাঁপছিল সে।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' নার্স বিছানার চাদর সোজা করতে করতে হাসল এবং বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটাকে গুছিয়ে দিল। 'আমরা তো ওর দেখাশুনা করব। আমাদের এখানে খুব ভাল ভাল ডাক্তাররা আছেন, তোমার আর চিন্তা করার কিছু নেই।'

ডাক্তার এসে লীলার মাকে পরীক্ষা করলেন, তখনও সে চোখ খোলেনি বা কথা বলেনি, বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে আছে। লীলা ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বোঝার চেষ্টা করছিল ডাক্তারবাবু মিঃ ডি সিলভাকে ইংরাজীতে কী বললেন। একসময় তিনি লীলার দিকে চেয়ে মারাঠিতে বললেন, 'ওকে এখানে আমাদের কাছে রেখে যাও। সেরে উঠতে অনেক সময় লাগবে, খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। প্রথমে নানাধরনের পরীক্ষা করতে হবে, তাহলে কী হয়েছে বোঝা যাবে। এতে কিছুদিন সময় লাগবে। আমরা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে পারি বা তুমিও এক সপ্তাহ পরে আসতে পার। তবে চিন্তা কোরনা — এমন কোন গণ্ডগোল মনে হচ্ছে না যে সেরে উঠবে না।'

লীলা মাথা নাড়ল, কিন্তু মাকে ছেড়ে যেতে তার মন চাইল না। মিঃ ডি সিলভা তখন বললেন, 'বাড়িতে তোমার বোনেরা আছে, তোমার ফিরে যাওয়া খুবই দরকার। কয়েকদিন পর আমি তোমাকে আবার নিয়ে আসব, কথা দিচ্ছি। চলে এস।'

তাঁর কথা অমান্য করার মত সাহস লীলার ছিল না, তাই সে গাড়ির দিকে এগোল। তবে সমস্ত পথটাই সে কাঁদকে কাঁদতে ফিরল।

সে রাতে ওর বাবা বাইরে বেরোবার আগে দেশলাই জ্বালাবার সময় বিছানার দিকে তাকাল এবং গোঁ গোঁ শব্দে বলল, 'তোর মা কোথায় গেল?'

'আমি মাকে আলিবাগে হাসপাতালে নিয়ে গেছি', লীলা আস্তে করে বলল, কিন্তু বাবার দিকে তাকাল না।

দাঁড়িয়ে থেকে সে টলছিল, তবু মুখ দিয়ে বীভৎস গর্জন করে উঠল। ঘরে আগুনের স্বল্প শিখায় দেয়ালে তার বিশাল ছায়া দৈত্যের মত দেখাচ্ছিল, 'আমাকে না জানিয়ে ওকে রেখে এলি কেন?'

'তুমি - তুমি তো ঘুমিয়েছিলে', লীলা ফিস ফিস করে উত্তর দিল।

লোকটি আবার হুংকার দিয়ে উঠল, 'আমি ওর কাছে যাব। আমাকে না জানিয়ে তুই ওকে রেখে এলি কেন? আমি আলিবাগে যাব, ওকে খুঁজে বের করব। ওকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, নির্বোধ মেয়ে।'

'মাকে নার্স ও ডাক্তাররা দেখবে, বাবা', লীলা কেঁদে ফেলল। তার ভয় বাবা মাতাল হয়ে হাসপাতালে গেলে মুস্কিল হবে।

'আমার কথার ওপর কথা বলবি না', সে চিৎকার করে। 'তুই এসবের কি বুঝিস? তুই কি ভাবিস, তুই একাই সব সামলাতে পারবি? কক্ষনো তা পারবি না।' রাগে সে জলের কুঁজোটায় লাথি মারল, ফলে সেটা পড়ে গিয়ে ভাঙল শব্দ করে, আর মেঝে ভরে গেল জলে। তাতে সে যেন আরো রেগে গিয়ে ভাঙা টুকরোগুলোর ওপরও লাথি মারতে লাগল। 'ওকে একা ফেলে এলি কেন তুই? ওর যদি কিছু দরকার হয়, কে দেখবে? যদি ও আমার খোঁজ করে? এসব ভেবেছিস তুই?' চিৎকার করে সে তাক থেকে একটা টিন নামিয়ে ভয়ে জড়সড় লীলার পাশে মেঝেয় রাখল। 'কিছু খাবার তৈরি কর তাড়াতাড়ি, আমি ওর জন্যে নিয়ে যাব।'

'আজ দেরি হয়ে গেছে, বাবা', লীলা কেঁদে বলল।

'না, দেরি হয়নি। মুখের ওপর কথা বোল না', সে আবার চেঁচিয়ে ওঠে এবং তাক থেকে সব পাত্রগুলোই মেঝেতে নামিয়ে দেয়। 'এক্ষুনি খাবার তৈরি কর, আমি আলিবাগে ওর জন্য নিয়ে যাব।' ঘরজুড়ে সে জিনিসপত্র ওলোটপালোট করতে লাগল। আর লীলা দ্রুত রুটি বেলে সেঁকে নেওয়ার চেষ্টা করল। দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছিল তার।

রান্না করার মত তেমন কিছু বাড়িতে ছিল না, তবু সে যা হোক করে খাবারের একটা পুঁটুলি বানিয়ে বাবার হাতে দিল। আর সে সবার মুণ্ডুপাত করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে রাস্তায় — খালের রাস্তার সব কুকুরগুলো চিৎকার করে ডাকতে শুরু করেছিল।

হঠাৎ কিছু মনে পড়তেই লীলা লণ্ঠনটাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে ছুটে বেরোল, খালের কাছে ডাকল, 'বাবা, খানেকাররা যদি আবার টাকা চাইতে আসে, আমি কী করব?'

অন্ধকারে সে বাবার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারল না, শুধু দেখল তার ডাক শুনে বাবা থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত, তারপর পুনরায় এগিয়ে যেতে যেতে হাত নেড়ে বলল, 'বলবি আমার জমি ছেড়ে দিতে, আর কী বলবি?'

'বাবা', কাঁপা গলায় লীলা চিৎকার করল, 'সেদিন ওরা পিন্টোকে মেরে ফেলল কারণ ওরা বলছিল তোমার কাছে তাড়ির টাকা পায়।'

'মিথ্যা কথা! আমি এক পয়সাও ধারি না।' সে চেঁচিয়ে বলে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তে থেমে গলার স্বর নীচু করে বলল 'যাওয়ার পথে ওদের বাড়ি যাচ্ছি, সব

মিটিয়ে দেব। আর হীরাবাইকে বলে যাব হরি না ফেরা পর্যন্ত যেন তোদের দেখাশুনা করে। ওই বাঁদর ছেলেটা গেছে কোথায়, এ্যাঁ?' এবার সে জঙ্গল পেরিয়ে খানেকারদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

লীলা উৎকণ্ঠা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল, তার ভয় হল, এখনই বুঝি ঝগড়াঝাঁটির শব্দ শোনা যাবে। কিন্তু তেমন কিছুই সে শুনতে পেল না। সে বুঝতে পারল এই রাতে খানেকার ভাইয়েরা নিশ্চয় বাড়িতে থাকবে না, মদের দোকানে গিয়ে বসে আছে। সম্ভবত বৃদ্ধা হীরাবাই থাকবে ঘরে। আর সে তার ছেলেদের মত অত খারাপ লোক নয়। লীলা এবার ঘরের দিকে পা বাড়াল — সে নিশ্চিত হল যে তার বাবা এখন সোজা তাড়ির দোকানে গিয়ে অন্য দিনের মতই মদ খেতে শুরু করবে।

পরদিন সে বাড়ি ফিরে এল না, তার পরদিনও এল না। মিঃ ডি সিলভা যখন লীলাকে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন তার মাকে দেখতে ও রিপোর্ট সংগ্রহ করতে তখন লীলা তার মার ওয়ার্ডের বারান্দায় বাবাকে বসে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল। ওদের আসতে দেখে সে উঠে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লীলা ভেতরে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করল, বাবার কাছ থেকে তাড়ির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। ওকে এত মলিন, বৃদ্ধ ও কুঁজো দেখাচ্ছিল যে লীলা এই প্রথম তার জন্যে দুঃখ পেল। ভেতরে গিয়ে দেখল মা জেগে আছে, তাকে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল।

নার্স ওর কাছে এসে হাসল। 'দেখ, তোমার মা এখানেই আছে, আমরা লুকিয়ে রাখিনি। ওকে আগের চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে, না? ওষুধ খাচ্ছে ঠিকমত, এর মধ্যেই অবস্থার উন্নতি হয়েছে।'

লীলা বিছানায় বসে মার হাতটা ধরল, তার মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। তার মাও তার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসল।

বাড়ি ফেরার সময় মিঃ ডি সিলভা ডাক্তারের দেওয়া রিপোর্টের কথা বললেন লীলাকে। 'তোমার মা রক্তাল্পতায় ভুগছে। ডাক্তার বলছিল, খুব খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছিল। ভাগ্যিস আমরা সময় থাকতেই ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম। ওরা অনেকরকমের পরীক্ষা করেছে — এক্সরে করেছে, ব্লাড টেষ্ট করেছে, আরো অনেক কিছু করেছে। তাতে ধরা পড়েছে, টিবির ছোঁয়াও আছে, তবে এতই অল্প যে ওষুধেই সেরে যাবে। এখন ওকে ওরা ইনজেকসান দিচ্ছে, ভাল খাবার দিচ্ছে, ফলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। তবে সময় নিশ্চয় লাগবে — ওরা বলছিল তোমার মাকে ওদের কাছে বেশ কিছুদিন রাখতে হবে। তোমার বাবা বলছিল ও হাসপাতালে থেকে দেখাশুনা করবে, সুতরাং সবকিছুই ঠিকঠাক চলেছে, তাই না?'

লীলা গাড়ির পিছনের সিটে বসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। নরম গদিতে বসে ঝাঁকুনি খাওয়ার অভ্যেস না থাকায় সে খুব অস্বস্তি নিয়ে বসে ছিল। অজস্র

দুঃশ্চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাওয়ার ফলে বিমর্ষ মুখে বসে থাকলেও কিছুই করার ছিল না তার।

মিঃ ডি সিলভা সামনের কাঁচে লাগানো আয়না দিয়ে নিশ্চয় লীলাকে লক্ষ্য করছিলেন। 'বেশি চিন্তা কোর না', খুবই সদয় কণ্ঠে বললেন তিনি। 'তোমার বাবা হাসপাতালে থাকবে বলে আমি ওকে কিছু টাকা দিয়েছি খাওয়ার জন্যে। আমরা শুধু ওষুধের দাম দিচ্ছি, হাসপাতালে থাকাটা ফ্রি। তুমি ও তোমার বোনরা আমাদের যে কাজ করছ তার জন্যে টাকা দেব, তা দিয়ে তোমাদের সংসার খরচ চলে যাবে।'

'কিন্তু — আপনারা তো শীগগীর চলে যাবেন', লীলা বিড়বিড় করে বলল।

'হ্যাঁ। আমরা চলে যাব, কিন্তু আমাদের এক বন্ধু বোম্বাই থেকে আসছেন, 'মন রিপোজে' কয়েকমাস থাকবেন। উনি একাই থাকবেন — ওঁর দেখাশোনার জন্যে কাজের লোকের দরকার হবে। কেননা আমাদের লোক তো আমাদের সঙ্গেই চলে যাবে। তোমরা যদি ওঁর ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা ও রান্নার কাজ করে দাও, উনি তোমাদের মাইনে দেবেন।'

'কয়েক মাসের জন্যে আসছেন?' লীলার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মন রিপোজে কেউ অতদিন থাকেনি। 'বর্ষা এসে যাবে তো?'

'হ্যাঁ উনি বর্ষাতে থালেই থাকবেন। উনি একটা পরীক্ষা চালাচ্ছেন — যাইহোক তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে। উনি বেশ অদ্ভুত মানুষ', বলেই মিঃ ডি সিলভা দ্রুত একটা গরুর গাড়িকে কাটাতে গাড়ি ঘোরালেন। গাড়ি যখন আবার সোজা চলতে শুরু করেছে, তখন তিনি বললেন, 'সুতরাং তুমি এখন চিন্তা কোরনা — তোমার কাজ থাকবে, তুমি টাকা রোজগার করবে, আর হাসপাতালে তোমার মার দেখাশোনা করবে ওরা। তাছাড়া, তোমার বাবাও ওকে দেখার জন্যে থাকছে।' যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এমনভাবে এবার তিনি খুশিতে শিস দিতে লাগলেন। লীলা অবশ্য এতটা নিশ্চিত হতে পারছিল না, আবার কিছু বলারও ছিল না তাই ভাল লাগল তার। নিঃশব্দে সে জানলার বাইরে ফাঁকা মাঠের দিকে চেয়ে আগামী দিনের কথা ভাবল। হরি চলে যাওয়ার পর থেকেই সবকিছু যেন কেমন অনিশ্চিত হয়ে গেছে।

হরির কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখ জলে ভরে উঠল এবং হাতের আঙুলগুলো মুঠির মত করে বেঁকে গেল। হরি যেখানেই থাকুক মনে হয়ে এটা যেন বুঝতে পেরেছিল, কারণ ওরা গাড়ি থেকে নামতেই বেলা ও কমল একটা পোষ্ট কার্ড হাতে তুলে ধরে ছুটে এসে চিৎকার করে বলল। 'হরি — হরি চিঠি লিখেছে।'

'হরি?' জোরে উচ্চারণ করল লীলা। ওদের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'কোথায় আছে হরি? কী করছে?'

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়ের রান্নাঘরে জ্বলন্ত উনুনের পাশে কাজ করা খুব সহজ ছিলনা। রান্নাঘরটা ক্রমশ এত বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, যে রাতেও ঠাণ্ডা হত না। খাবার দোকানটিও কখনও পুরোপুরি বন্ধ হত না, খদ্দেররা যখনই চাইবে, চা-রুটি বা রুটি-ডাল পরিবেশন করতে হবে। তবে জগু তার কথা রেখেছে — হরিকে দিনে এক টাকা হিসেবে মজুরি দিয়েছে, অর্থাৎ সপ্তাহে সাত টাকা — নতুন কাজে আসা একটা ছেলের পক্ষে মজুরি হিসেবে ভাল। একারণে হরি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল — নিজের খাবার বিনা পয়সায় খেত বলে পুরো টাকাটাই তার জমেছিল। এই টাকা সে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে এবং রীতিমত গর্ব হচ্ছিল ওর এইভাবে বাড়ির জন্য টাকা সংগ্রহ করতে পেরে। ওর যা ভাল লাগছিল না, তা হল ও কাজের শেষে খাবারের দোকান ছেড়ে বাড়ি যেতে পারছিল না। দিনরাত ওকে ওখানেই আটকে থাকতে হচ্ছিল — রান্নাঘরে ও সামনের ঘরে সে কাজ করত, পেছন দিকের কলে স্নান করত, কোন খদ্দের দোকানে না থাকলে নিজে খেত এবং বেঞ্চে বা ধুলোভর্তি কালো মেঝেয় ঘুমোত। এটাই ওর কাছে সবচেয়ে কঠিন লাগত।

বাইরে সারারাত যানবাহন চলছে — যখন বাস চলাচল বন্ধ হত, তখনও ঘড়ঘড় শব্দ করে হাতে ঠেলা গাড়ি রেলওয়ে মেশিন এবং গুদামঘর থেকে মাল নিয়ে বাজারে যায় ও প্রাইভেট কার ও ট্যাক্সি চলে সারারাত। সিনেমা হাউসগুলো যখন রাতের শো শেষে বন্ধ হয়, শত শত লোক রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে থাকে। তারা চিৎকার করে, কাগজের বাঁশি বাজায়, যে ছবি দেখেছে তার গান গাইতে থাকে। তারপর শহরে তো কখনও আলো নেভানো হয় না, সবসময় জ্বলছে, ফলে ক্লান্ত চোখে হরি তার সমুদ্রতীরের গ্রামের গভীর অন্ধকার ও নিঃশব্দ রাত কামনা করত। সমুদ্রের মৃদু শব্দ, অথবা নারকেলগাছের বাতাসের আন্দোলন, কিংবা হাত ও পায়ে সমুদ্রতটের পরিষ্কার বালির অনুভূতি — কিছুই যেন আর মনে করতে পারে না সে, যেন কতদিন আগের বহুদূর দেশের ব্যাপার। শীত ও গ্রীষ্মের

মধ্যেকার কয়েকমাস মাত্র সে বাইরে আছে, তবু মনে হচ্ছিল যেন সারাজীবনের ঘটনা।

দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়ত, যদি এক রাতে ও গরমে অতিষ্ঠ হয়ে বাইরের ফুটপাতে গিয়ে না দাঁড়াত। সে রাতে বৃদ্ধ ঘড়িওয়াল্য অনেক রাত অব্দি দোকানে কাজ করছিলেন, কারণ একটা ঘড়ি মেরামত করে রেডি রাখবেন কথা দিয়েছিলেন। স্টীলের শাটার লাগানো দরজা বন্ধ করে তিনি হরির কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন 'কী ব্যাপার, হরি? শরীর খারাপ নয় তো?'

হরি মাথা নেড়ে না বোঝাল, কিন্তু কোন কথা বলল না। ক্লান্তি ও ঘুমের অভাবে শরীরের সমস্ত ক্ষমতা যেন শেষ হয়ে গেছে।

'ভেতরে ঘুমোতে পারছ না, তাই না? নিশ্চয় খুব গরম ভেতরটা। বর্ষার আগে এই যে মাসটা খুবই খারাপ।' জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন এবং সবুজ রুমাল দিয়ে মাথার টাকটা মোছার জন্য কালো টুপিটা খুললেন। আমার ঘরটাও তোমাদের দোকানের মত খারাপ, বাড়ির একেবারে ওপরের তলায় — ওই যে গ্র্যান্ট রোড ষ্টেশনের দিকে মুখ করে যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, ওখানে', বলে তিনি রুমাল সুদ্ধ হাতটা দিয়ে দিক সংকেত করে রুমালটা ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন। 'তোমাকে বলি কী, তুমি ওই পার্কে গিয়ে শোও না কেন? ওখানটায় গরম কম হবে, আমারও ইচ্ছে হয় ওখানে গিয়ে শুই, কিন্তু আমার বেড়ালটা আবার আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।' স্বগতোক্তির মত শোনায় তার কথা এবং তিনি খুশির ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন।

ঘড়ির দোকানের ভদ্রলোকের কাছে হরি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবে, কেননা পার্কে গিয়ে শোওয়ার উপদেশ তিনিই দিয়েছিলেন এবং তার ফলে ওর থাকাটা সহজ ও সহনীয় হয়েছিল। এটা শহরের মামুলি একটা পার্ক মাত্র — ধুলোয় ভর্তি, দু'এক জায়গায় জীর্ণ ঘাস, বেঞ্চগুলো লোহার, কয়েকটা নারকেল গাছ আছে। চারপাশে জীর্ণ বাড়ি। এটিকে কোনমতেই গ্রামের সমুদ্রতট ও নারকেল বাগানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কিন্তু এখানে শুয়ে থাকার মত বেঞ্চ আছে, গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, পায়রা ও কাকের দেখা মেলে এবং শহরের গরম না কমলেও খাবারের দোকানের চেয়ে এখানটা সহনীয়।

বেঞ্চের কাঠের তক্তায় শুয়ে হরি মাথার ওপর ধূলিধূসর নারকেল গাছের পাতা দেখতে পাচ্ছিল। সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার পায়ের নীচে নিষ্ঠুর শহরের শক্ত কংক্রীটের বদলে ঘাস অনুভব করল।

খাকি পোশাক পরা একজন পুলিশ পার্কে টহল দিচ্ছিল। বয়সেও তরুণ সে, ছুঁচলো গোঁফ বাঁকা করে রেখেছে, বগলের মধ্যে একটা ছোট লাঠি রেখে লক্ষ্য করে যারা পার্কের ভিতর আসছে বা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের। প্রথম রাতে হরি যখন বেঞ্চে শুয়েছিল ঘুমোবার জন্যে, ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'এই
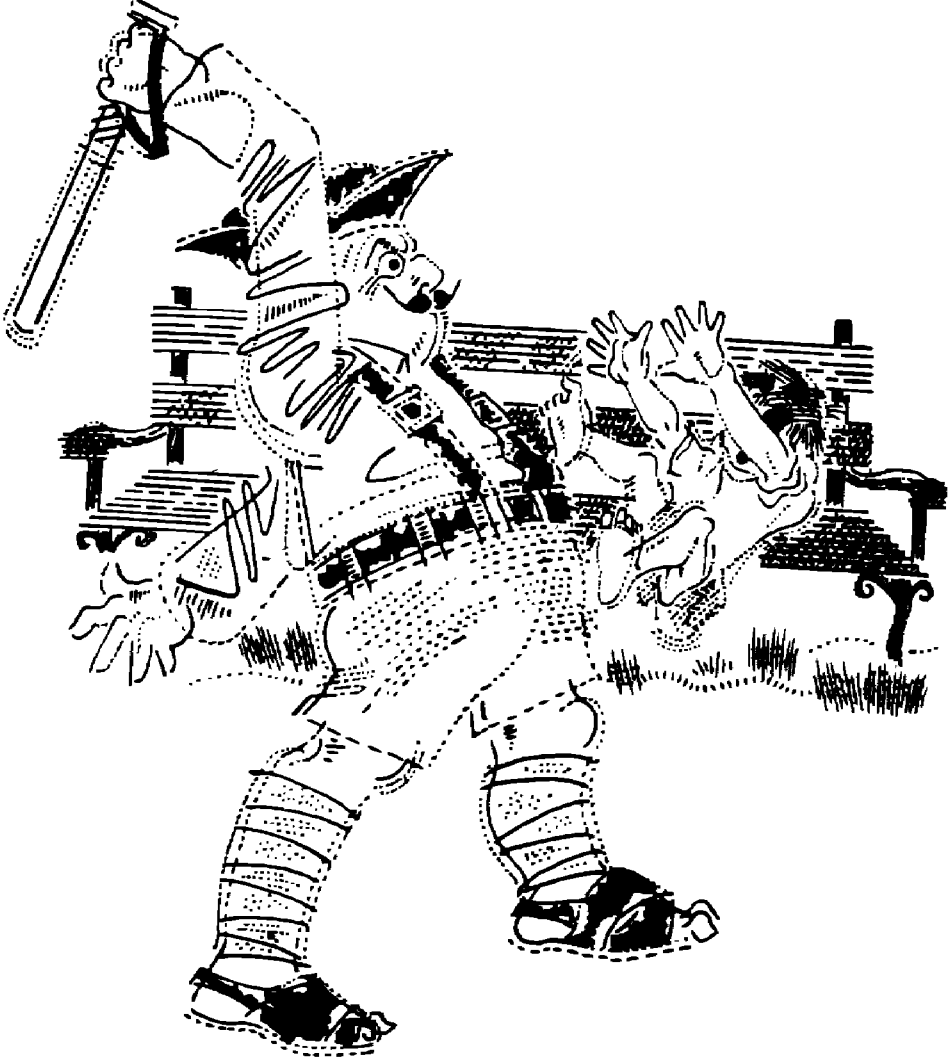
ছেলে, উঠে পড়। বাড়ি যাও। এটা ঘুমোবার জায়গা নয়। তাড়াতাড়ি ওঠ। না হলে থানায় নিয়ে যাব। সেখানে যত খুশি ঘুমোতে পারবে।'

হরি ঠিক তখনই আরামে পা সোজা করে ওপরে তুলে রেখেছে, দোকানে সারাদিনের পরিশ্রমের পর এটা তার কাছে শৌখিনতার মত ছিল। পুলিশের কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে উঠে বসল। 'আমার কোথাও যাওয়ার নেই, আমি এখানেই থাকি', সে বলল।

'কোথাও যাওয়ার নেই? আমি দেখাচ্ছি কোথায় যাবে তুমি!' রেগে রেগে বেশ জোরে বলল পুলিশটি। হরির মাথার ওপর ইতিমধ্যেই তুলে ধরেছে লাঠিটা, আর

একটু হলেই লাঠিটা ওর মাথাতেই পড়ত, কিন্তু সেইসময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক লাঠি ধরে ওই দিক দিয়ে হাঁটছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে পুলিশকে বললেন, 'এই নিরীহ গরীব ছেলেটিকে ভয় দেখাচ্ছো কেন হে, পালোয়ান পুলিশ মহাশয়?' শিশুর মত তীক্ষ্ণ সরু গলায় কথা বললেন তিনি। 'এই শহরে ঠগ, খুনি, চোর, জোচ্চোর, মাতাল অনেক রকমের খারাপ লোক আছে, ওদের কাছে যাচ্ছ না কেন? এই পার্কের কোণেই মাতালগুলো তাস খেলছে, ওদের দিয়েই শুরু কর দেখি। এই এলাকার লোকেদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে এরা। এদের জন্যেই আমরা পার্কে আসতেই ভয় পাই, এই গরীব ছেলেটির জন্যে নয়', তিনি বললেন।

কী করবে ঠিক করতে না পেরে পুলিশটি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে গোঁফের ডগায় জিভ ঠেকিয়ে 'হুঁ' শব্দ করল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ওকে লজ্জায় ফেলেছে শহরের সত্যিকারের অপরাধীদের কাছে না গিয়ে একটা ছেলেকে ভয় দেখানোর জন্যে। 'হুঁম' সে আবার বলল, তবে এবার জোরে। 'ওরা কারা? কোথায় আছে? আমি বরং গিয়ে দেখছি।' এবার সে চলে যায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক মৃদু হেসে হরির দিকে তাকালেন, হাতের লাঠি ঠুকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোলেন।

সেই ঘটনার পর থেকে হরি কাজ শেষ করে পার্কে ঢুকলে পুলিশটি ওকে সম্ভাষণ করত। হরি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারত। এমন কি তার খুব ভাল লাগত এই ভেবে যে সে ঘুমোবার সময় একজন পুলিশ তাকে পাহারা দিচ্ছে।

যখন সে সকালে চোখ মেলে চাইত, তখন ধূসর জীর্ণ আকাশে পায়রাদের পাক খাওয়া দেখত। তারা ঘুরতে ঘুরতে ঝাঁক বেঁধে এসে নামত পার্কের ষ্ট্যাচুটার ওপর। সেখানে একটা লোক ওদের জন্যে শস্য কণা ছড়িয়ে দিত। হরি দেখত পায়রাগুলো নেমে এসে খাচ্ছে। রোজ সকালেই লোকটি পায়রাদের খাবার খাওয়াতে আসত। এক বৃদ্ধ মহিলাকে বিধবার পোশাকে পার্কে দেখা যেত ঝোলাভর্তি আটা নিয়ে এসে ধৈর্য ধরে একটু একটু করে আটাটা ছড়িয়ে দিচ্ছে উইপোকার ঢিবির ওপরে। খুব ঝুঁকে দুর্বল চোখে হামাগুড়ি দিয়ে কষ্ট করে দেখতেন পিঁপড়েরা কিভাবে আটা খাচ্ছে। হরি অবাক হয়ে তাকে দেখত — সে নিশ্চয় কখনো নিজের টাকা খরচ করে পাখি ও পিঁপড়েকে খাওয়াবে না। ওকে চিন্তা করতে হয় বাড়ির লোকের কথা। তাই সে রোজগারের প্রতিটি টাকাই জমিয়ে রাখছে।

কিছুক্ষণ পর হরি পার্কের কোণের কলের জলে মুখ ধুতে যায়। তখন সে দেখে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে। তাদের কাঁধে ঝুলছে বইয়ের ব্যাগ। সবার একই রঙের পোশাক — ধূসর রঙের প্যান্ট বা স্কার্ট এবং হাল্কা নীল জামা বা ব্লাউজ। সবার চুলে তেলের ছোঁয়া আর সোজা করে আঁচরানো। কেউ হাসতে হাসতে যাচ্ছিল, কেউ যাচ্ছে দৌড়ে, দল বেঁধে, কাউকে কাউকে তাদের মা-বাবা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমা পার্কের পাশে স্কুল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। ওদের দেখে তার দুই বোন বেলা ও কমলের কথা মনে হত — ওরাও তাদের মত তুঁতে নীল স্কার্ট

পরে লাফাতে লাফাতে, কখনো দৌড়তে দৌড়তে গ্রামের পথ ধরে পাহাড়ের পাশে স্কুলে যাচ্ছে। ভাবত, কবে ওদের সঙ্গে দেখা হবে। ওর ইচ্ছে হত ওদেরকে তার ঠিকানাটা জানায়। তাহলে ওরা তাকে চিঠি লিখতে পারত ও বাড়ির খবর জানাতে পারত।

রান্নাঘরের ছেলেদুটো এতদিনে বুঝে গেছে যে হরির জন্যে ওদের কাজ যাবে না, সে এসেছে ওদের কাজে সাহায্য করতে। এখন তাই ওরা ওকে শত্রু হিসেবে ভাবছে না। জগুও হরির প্রতি সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। সে দুপুরের দিকে হরির দিকে চায়ের গ্লাস এগিয়ে দেয়। দু'এক মুহূর্ত অবসর পেলে জগু লম্বা কাঠের টেবিলে বসে টেবিল বাজাতে বাজাতে হরির অজানা কোন ভাষায় গান ধরে। যখন দেখে হরি শুনে হাসছে, তখন সেও হাসে। হরি তারপর জেনেছে জগুরও কোথাও নিজের গ্রাম আছে যাকে সে ঘর বলে উল্লেখ করে, তার কথা ভাবে এবং মনে পড়লে খুশি হয়। কোন কারণ ছাড়াই সে চুপচাপ থাকে। কর্মঠ মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে বেশি। এমনিতেই তার সময় নেই, তার ওপর বাকপটুতা না থাকায় তার কোন বন্ধু নেই, মুরুব্বিও নেই।

সবার মধ্যে একমাত্র ঘড়ি সারানোর ভদ্রলোক, যার নাম মিঃ পানওয়ালা, হচ্ছেন সত্যিকারের উপকারি, দয়ালু ও সাহায্যকারী মানুষ। ওই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই একদিন বিকেলে খাবারের দোকানে কোন খরিদ্দার না থাকায় হরি দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে অলসভাবে রাস্তার যানবাহন দেখছিল। এত ক্লান্ত লাগছিল যে অন্য কিছু করতে ভাল লাগছিল না তার। মিঃ পানওয়ালা ওকে ডেকে তাঁর দোকানে কাউন্টারের পিছনে নিজের পাশে বেঞ্চে বসতে বললেন।

'আমার কাজে সাহায্য করবে?' তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কী করে ঘড়ি সারাতে হয় শিখবে নাকি? আমি এখুনি এই বড় গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়িটা খুলব, এটা এক পার্শি পরিবার সারাতে পাঠিয়েছে আমার কাছে। তুমি চাও তো দেখতে পার কী করে এটার কাজ হয়। এই ধরনের জিনিস সচরাচর দোকানে আসেনা। দেয়াল ঘড়ি, ইলেকট্রিক জিনিসপত্র পাবে, কিন্তু এধরনের ঘড়ি তেমন দেখতে পাবে না। ভাগ্য ভাল যে এমন একটা ঘড়ি আমি তোমাকে দেখাতে পারছি।' 'দেখ', তিনি ঘড়ির পেছনের দরজাটা খুলে হরিকে বললেন। ঘড়ির ভেতরের যন্ত্রপাতি দেখে হরি চমৎকৃত হল, যেন অচেনা অদ্ভুত একটা বাড়ি তার চোখের সামনে। মিঃ পানওয়ালা ওকে দেখালেন ঘড়িটার কোথায় গণ্ডোগোল হয়েছে এবং কেন থেমে গেছে। 'মজার, তাই না? কিন্তু তুমি শিখবে কী করে? আমি বলি কী — বিকেলে যখনই তোমার কাজ থাকবে না, আমি তোমাকে এ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে নেব। বেলা দুটো ও চারটের মধ্যে তোমার তেমন কোন কাজ থাকে না, তাই না? তবে জগুকে অবশ্যই ব্যাপারটা বলতে হবে। আমি তোমাকে সামান্য কিছু টাকা দেব, বেশি না, আর তুমি দিনে দু ঘন্টা আমাকে সাহায্য করবে। পছন্দ হচ্ছে কি, এ্যাঁ?'

হরির বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে উনি সত্যিই প্রস্তাবটা দিয়েছেন এবং ঘড়ি সারানোর সব গোপনীয়তা বলবেন এক গ্রাম্য বালকের কাছে, যে খাবার দোকানের রান্নাঘরে পাচকের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। জীবনে সে একটা কিছু করতে পারবে। নিজের হাত দুটো ব্যবহার করে সুক্ষ্ম, জটিল মেশিনপত্রের কাজ করবে — এই সম্ভাবনা তার সামনে এসেছে, সেই সঙ্গে ভদ্রলোকের দয়ার কথাও স্মরণ করে সে নিজে এত হতবুদ্ধি হয়ে গেল যে কথা বলতে পারল না, মাথা নাড়ল শুধু।

'তাহলে এখুনি একবার পরখ করে দেখা যাক কাজটা তোমার ভাল লাগে কিনা', বৃদ্ধ মুখ টিপে হাসলেন, কাচের মত চকচকে সবুজ হাতলওয়ালা একটা স্ক্রু-ড্রাইভার তার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

'আমার হাত দুটো খুব ময়লা', হরি সসঙ্কোচে বলে।

খুব ময়লা তাই তো?' মিঃ পানওয়ালা হাসলেন। 'এই কাপড়টা দিয়ে মুছে নাও, তাহলেই হবে। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে।' একজন শিক্ষানবিশ পেয়ে আনন্দিত তিনি। তিনি জগুর মত নন, মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে তাঁর।' তোমার আঙুলগুলো তো দেখছি খুবই চটপটে, এই নাও, একটা দরকারি জিনিস এইভাবে এটাকে ধর, তারপর আমি দেখাব এটা দিয়ে কী করতে হবে।'

এইভাবে ঘড়ি সারানোর কাজে হরির শিক্ষানবিশী শুরু হল। সে বুঝেছিল এই কাজে তার ভবিষ্যৎ আছে — একজন কখনও একজায়গায় আটকে থাকে না, সে এগিয়ে যেতেই থাকে। এজন্যে অনেক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভাগ্য সামান্য সহায়তা করলে সুবিধে হয়। সে সহজেই জগুর অনুমতি পেয়ে গেল বিকেলে দুঘন্টা ঘড়ির দোকানে কাজ শেখার। চাপা স্বভাবের হলেও জগুর মনটা ভাল। হরিও দৃঢ় ইচ্ছে নিয়েই কাজ শিখতে আরম্ভ করল। সে হাসিখুশি, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে লাগল। তাকে গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে দেখে বৃদ্ধ মিঃ পানওয়ালা হাসেন।

'ভাল, খুব ভাল, হরি', তিনি বারবার বললেন যাতে সে উৎসাহ পায়, 'খুব ভাল করছ। বর্ষা আসার আগেই আমার শেখানোর প্রথম পাঠ শেষ হয়ে যাবে। আর বর্ষা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি নিজে নিজেই ঘড়ি সারাবে।'

হরি তাঁর দিকে নিঃশব্দে তাকায়, মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করে তাঁর কথার জন্যে।

'সত্যি', ওর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন।' এবার মনে হয় তোমার মুখে হাসি দেখব, কী বল?'

বর্ষায় যে ভদ্রলোকের 'মন রিপোজ'-এ এসে থাকার কথা ছিল তিনি এসে পৌঁছলেন ডি সিলভারা চলে যাওয়ার আগের দিন। তাঁর আসার খবর লীলা ও তার বোনেরা সঙ্গে সঙ্গে পায়নি। তিনি বোম্বাই থেকে বাসে এসে নেমেছেন, তারপর নিজেই ব্যাগ বয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে বাড়িতে ঢুকেছেন। ফলে তাঁর

আসার মধ্যে বড়সড় এবং চমকদার কোন ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া ডি সিলভা পরিবারে লোকজন অনেক, ফলে হৈ হট্টগোলের মধ্যে কোন বাড়তি লোকের আগমনে তেমন কোন পার্থক্য ঘটেনি। মিশা নামের কুকুরটিকে শুধু মনে হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি চিৎকার করেছে এবং উত্তেজিতভাবে ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে।

লীলা রান্নার লোককে সাহায্য করা, রান্নাঘর পরিষ্কার করা এবং ওদের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে ব্যস্ত ছিল। মেমসাহেব চলে যাবেন বলে তাঁর জন্যে ফুল জোগাড় করে আনতে গিয়েছিল বোনেরা, জুঁইফুলের মালাও আনবে ছেলেমেয়েদের জন্য। ছেলেমেয়েরা বারান্দায় ছিল। সাজিতে কুড়ানো ঝিনুক ও নুড়ি পাথরের ভাগ নিয়ে ঝগড়া বেধে ছিল নিজেদের মধ্যে। এদিকে ওদের মা কিছুতেই এতসব জিনিস বোম্বাইয়ের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে দেবেন না।

'সব নিয়ে যেতে পারবে না, যেগুলো ভাল শুধু সেগুলোই বেছে নাও', তিনি ওদের বলেছেন। এর ফলে ওরা খুব বিমর্ষ হয়েছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না। এইসব দেখে বেলা ও কমল খিলখিল করে হেসেছে। তাদের বালির ওপর এত ঝিনুক ও নুড়ি পড়ে থাকতে দেখেছে ওরা যে কোনদিন ভাল করে লক্ষ্য করেনি সেসব।

এক সময় গাড়িতে মালপত্র তোলা হলে সবাই উঠে বসেছেন। লীলা ও তার বোনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য ওঁরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন।

'তোমার মাকে নিয়ে ভেবো না', মিঃ ডি সিলভা বারবার বললেন। 'ওকে বর্ষার সময়টা হাসপাতালেই রেখে দাও, বুঝেছ?' বৃষ্টি হলে তো তোমাদের কুটির স্যাঁতসেঁতে ও ভিজে হয়ে থাকে, ও বরং হাসপাতালেই ভাল থাকবে। তোমার বাবা তো দেখাশোনা করছেই। যাওয়ার পথে আমি আলিবাগে থেমে তোমার বাবাকে কিছু টাকা দেব। তোমার মা ভাল না হওয়া পর্যন্ত ও ওখানেই থাকবে। ডাক্তারের ধারণা দেওয়ালির সময় তোমার মাকে বাড়ি পাঠাতে পারবে। কী, সব ঠিক আছে তো?'

লীলা মাথা নাড়ে বারবার। উনি আগে বলা কথাগুলোই পুনরায় বলার জন্যে লীলা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল। স্বস্তিকর কথাগুলো পুনরায় শুনতে তার ভাল লাগছিল। বাড়িতে হরি নেই, মা-বাবাও নেই, এমনকি পিন্টোও নেই। ফলে নিশ্চুপ হয়ে আছে ওদের কুঁড়েঘর। 'মন রিপোজ' থেকে ডি সিলভারা এখন চলে যাওয়ায় ওরা আরো নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে।

'সৈয়দ আলি সাহেবের দেখাশোনা ভাল করে কোর', মিসেস ডি সিলভা ডেকে বললেন। 'খাবার-দাবার যেন ঠিকমত খায় অবশ্যই দেখবে। এ ব্যাপারে উনি খুবই ভুলোমানুষ, তাই তোমাকেই মনে করিয়ে দিতে হবে। উনি কিন্তু বিখ্যাত লোক — খুব ভাল করে যত্ন করবে। আমি তোমাকে যা টাকা দিয়েছি তাতে রোজ ওঁকে মাছ,

ডিম, দুধ দেবে। আঁর উনি সব্জি খেতে খুব ভালোবাসেন, অনেক সব্জি নিয়ে আসবে। রোজ রাতে রান্নাঘরে তালা দেওয়ার আগে ভাল করে পরিষ্কার করবে যাতে আরশোলা, ইঁদুর ও সাপ-টাপ না আসতে পারে।'

পেছনের সীটে বসে ছেলেমেয়েরা সাপের কথা শুনে আঁতকে উঠল। ওদের মনে পড়ে গেল যে গতরাতে ওদের মা একটা সাপ দেখেছেন — তাকের ভিতরে কোথাও দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেছিল। 'ওহ্ — সাপ!' ওরা চিৎকার করল। এখন যাওয়ার সময় হয়েছে ভেবে ওদের বাবা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। গাড়িটা ধাক্কা খেয়ে চলতে শুরু করতেই কুকুরটা গাড়ির ভিতর থেকে উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে লাগল। নারকেল গাছের সারির মধ্যে দিয়ে গাড়িটা যাওয়ার সময়ও লীলা, বেলা ও কমল খালের কাঠের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছিল হাত নেড়ে।

গাড়িটা চলে যেতেই ওরা তিন বোনই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। তখনই ওরা দেখতে পেল তাঁকে, যিনি 'মন রিপোজ'-এ থাকতে এসেছেন। পাতলা চেহারার বয়স্ক এক মানুষ। মুখে সাদা দাড়ি ও নাকের ওপর চশমা। তিনি ওদের লক্ষ্য করেননি কারণ তাঁর চোখে বাইনাকুলার লাগানো রয়েছে, তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মেয়েরাও গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ওদিকে কী দেখছেন উনি। ওদিকে কিছু দেখা যাচ্ছে মনে হলনা ওদের। কিন্তু তখনই একটা খস খস শব্দ শুনল, আর একটা ধূসর ও পাটলবর্ণের পাখি ঘনপাতার ভিতর থেকে বেরিয়ে লম্বা লেজ নাড়িয়ে উড়ে গেল বাড়ীর পেছন দিকে। লোকটি বাইনাকুলার নামিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপর পকেট থেকে বই বের করে তাতে কীসব লিখতে লাগলেন।

লীলা ও তার বোনেরা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটে বাড়িটার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে এসে ঢুকল রান্নাঘরে, যাতে লোকটির কাজে বিঘ্ন না ঘটে।

'উনি কী করছেন?' খুব আস্তে আস্তে, শব্দ না করে ওরা বাসন মাজছিল।

'কে জানে!' লীলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'কিছু একটা পরীক্ষা করতে এসেছেন, সাহেব বলছিলেন।'

'কী পরীক্ষা করবে? পাখি?' বেলা জিগ্যেস করল। মজা পেয়ে কমল হাসল। ব্যাপারটা কেমন যেন হাস্যকর ওদের কাছে।

'যাই হোক, উনি কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করবেন না। আমাদের রান্না করতে হবে ওঁর জন্যে, তারপর খেতে ডাকতে হবে,' লীলা বলল।

বাস্তবে তাই করল ওরা। এখন ওদের মাকে দেখাশোনা করার দরকার হয় না। বাবা ও হরি কেউ নেই এখানে। ওরা এখন নিঃশব্দে রান্না করে, বাজার করে আনে, ঘর মোছে, বাসন ধোয়। এসব যাঁর জন্যে ওরা করে তিনি কখনো ওদের সঙ্গে কথা বলেন না। খাবার দিয়ে ওরা যখন ডাকে, তখন তিনি শুধু চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখেন। কখনও সারাদিনের মত কোথাও উধাও হয়ে যান কাঁধে

বাইনাকুলার ও ব্যাগভর্তি বই পেনসিল নিয়ে। কখনও ওরা ওঁকে জলার ওপর দিয়ে কাদা ছিটিয়ে হাঁটতে দেখে ছুটে গেছে ওঁর কাছে। তিনি কখনও গাছের নীচে একটা পাথরের ওপরে নিবিষ্ট মনে বসে থেকেছেন, মনোযোগ দিয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছেন, শুধু মানুষ বাদে। থাল গ্রামে যে লোকজন বাস করে তা যেন তিনি জানেনই না। ওদের সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই তাঁর। কিন্তু তিনি খুবই ভদ্র ও শান্ত,
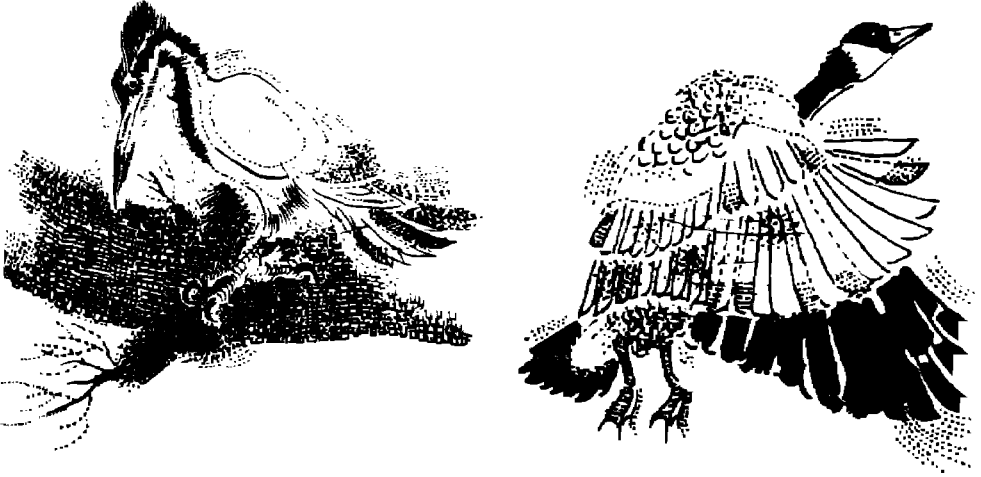
কোন ঝামেলায় ফেলেন না ওদের, কেননা কোন অভাব অভিযোগ করেন না তিনি। তাই ওরাও ওঁর অদ্ভুত আচরণে কিছু মনে করে না, ওঁকে দেখে হাসেও না তেমন। তবে একবার যখন উনি খালের কাঠের পুলের ওপর পিছু হটতে গিয়ে জলের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন, তখন ওদের ছুটতে হয়েছিল ওঁকে উঠতে সাহায্য করার জন্যে। ওরা ওঁর ব্যাগ ও কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে বারান্দায় শুকানোর জন্যে বিছিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা লক্ষ্য করেছিল, ওঁর সমস্ত কাগজেই পেনসিল দিয়ে যত্ন করে আঁকা আছে পাখিদের ছবি। ওরা বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছিল।

'দেখ, উনি পাখি নিয়ে পরীক্ষা করছেন,' বেলা ফিসফিস করে বলেছিল। ওরা তখন বারান্দার মেঝেয় হাঁটু মুড়ে বসে ভিজে কাগজগুলোকে আলাদা আলাদা করছিল রোদে মেলে দেওয়ার জন্য।

'পাখি নিয়ে পরীক্ষা?' কমল ফিসফিস করে বলেই খিক খিক করে হাসতে থাকল। লীলা ওদের দিকে চেয়ে ভ্রুকুটি করল। সে ওদের সাবধান করে দেয় সুন্দর ড্রয়িংগুলোর একটাও যেন নষ্ট না হয়।

আশ্চর্য মানুষটি শুকনো জামাকাপড় পরে বেরিয়ে আসেন তাঁর ঘর থেকে। উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন ড্রয়িংগুলো। তারপর ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে বেলা ও কমলকে দেন। 'মিষ্টি খেও,' মৃদু স্বরে কথাটা বলে তিনি অস্বস্তির সঙ্গে নিজের ঘরে ঢুকে যান।

একইরকম অস্বস্তির মধ্যে ওরা ওঁকে দেখল যখন উনি মাসের শেষে লীলাকে মাইনে দিলেন। লীলা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে চলে যায়। তারপর বাড়িটা ঘুরে খাল পেরিয়ে দৌড়ে নিজেদের বাড়িতে চলে যায়। আনন্দে তার মুখে হাসি ফুটেছিল। টাকা রোজগার করাটা খুবই চমৎকার ব্যাপার। ওরা যা টাকা পেয়েছে তাতে এখন চাল, চা ও চিনি কিনে রান্নাঘরে জমিয়ে রাখা যায়। লীলা এখন প্রতি সপ্তাহে বাসে করে আলিবাগ গিয়ে বাবাকে টাকা দিয়ে আসে, সেই টাকা দিয়ে মার জন্য বাড়তি দুধ ও ফল কেনা হয়। টাকাতেই শুধু এতসব সম্ভব হয়েছে। লীলার আশা, ভদ্রলোক অনেক অনেকদিন এখানে থাকবেন, আর সে টাকা রোজগার করেই চলবে।

কেউ বর্ষাকালে এখানে থাকে না, কমল বলল, 'সবাই বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। আমরাই শুধু থাকি।'

দশম পরিচ্ছেদ

একটা বড় ঢেউ এসে সমুদ্রের ধারের দেয়ালে আছড়ে পড়তেই বেড়ানোর জায়গা জুড়ে যেসব লোকজন দাঁড়িয়েছিল তাদের গায়ে জলের ফেনা ছিটকে পড়ল। তাদের সঙ্গে মিঃ পানওয়ালা পিছু হটতে হটতে বললেন, 'মৌসুমী বাতাস আসছে। হরি দেখ, মৌসুমী বাতাস।'

জলের ছাঁটে ভিজে গিয়ে হাসতে হাসতে হরি মাথা নাড়ল। একটার পর একটা ঢেউ এসে বাঁধানো দেয়ালের গায়ে শব্দ করে ভেঙে পড়তে শুরু করলে লোকজন সব দূরে সরে গেল। গোটা সমুদ্রটাই উত্তাল হয়ে উঠছে। বিশাল কালো ঢেউ সেখান থেকে ঝড়ের বেগে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। আকাশে এখনো মেঘ দেখা যায়নি। কিন্তু সমুদ্র দেখে বোঝা যাচ্ছিল, মেঘ আর খুব বেশি দূরে নেই।

মিঃ পানওয়ালা হরিকে বর্ষার প্রারম্ভ দেখাতে ওয়ার্লির দিকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রতি বছর তিনি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ওখানে যান। সেদিন তিনি বেশ তাড়াতাড়িই দোকানের শাটার ফেলে দিয়েছেন। মাথার কালোটুপিটা সোজা করে নিয়ে জগুর কাছে গিয়ে বলেছেন হরিকে সন্ধ্যাবেলা ছুটি দিতে। তারপর তিনি হরিকে সঙ্গে নিয়ে বাসে উঠেছেন। হরিকে ওখানে তিনি জোর করে ডাবের জল খাইয়েছেন, কাগজের ঠোঙায় মুড়ি কিনে দিয়েছেন। হরি ঠোঙাটা ঝাঁকিয়ে একটু একটু করে মুড়ি মুখে ঢেলেছে। এসব তিনি করেছেন যেভাবে বাবা-মা ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যায়, দোলনায় চড়তে দেয়, বেলুন ও আইসক্রীম কিনে দেয়, ঠিক সেইভাবে। নিজেকে একটি শিশুর মত মনে হল হরির, সে তখন আর বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাওয়া কঠোর বাস্তব দুনিয়ার এক কিশোর নয়। সমুদ্র থেকে উঠে আসা মৌসুমী বাতাসেরগর্জন ভেঙেপড়া ঢেউয়ের ফেনা এবং দূর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাগরের দৃশ্য হরির মনটাকে হাল্কা করেছে, সে খুশি হয়েছে। এমন অনুভব দীর্ঘদিন হরির হয়নি। মনে মনে সে মিঃ পানওয়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল।

ওই সন্ধ্যায় হরি জানতে পারেনি বর্ষায় বোম্বাইয়ের লোকজনের জীবনযাত্রা কত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। জুনের দশ তারিখে মৌসুমী বাতাস উত্তাল হয়ে উঠল সমুদ্রে। মিঃ পানওয়ালা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি হল। প্রবল বর্ষণ ভেঙে পড়ল শহরের ওপরে। বোম্বাই শহরের সব লোকের মত হরিও ঘরবন্দী থাকল। শহরের ওপর বিশাল সাদা চাদর বিছিয়ে দেওয়ার মত বৃষ্টি হতে দেখল সে। রাস্তায় জল জমতে শুরু করল। শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়ের সামনের রাস্তা প্রথমে একটা নর্দমা হয়ে উঠল — সারা বছরের সমস্ত আবর্জনা উঠে এসে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তারপর রাস্তাটা একটা নদীর রূপ নিল। নর্দমাগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে জোয়ারের তোড়ে। বড় বড় নর্দমার জল ঠেলে শহরের রাস্তায় ঢুকে পড়ছে। ফলে রাস্তায় বান ডেকেছে। গাড়ি রাস্তায় আটকে গেছে খারাপ হয়ে। স্টলগুলো সব হাঁটু জলের মধ্যে।

শহরের অনাথ গৃহহীন শিশুরা প্রথমদিকে কিছুক্ষণ বৃষ্টির মধ্যে মজা করে কাটাল, তারা কাঁধ দিয়ে গাড়ি ঠেলে ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, বিনিময়ে পয়সা পেল গাড়ির চালকদের কাছ থেকে। হরি ও রান্নাঘরের ছেলে দুটিও বাইরে বেরিয়েছিল, অন্যদের মত ওরাও কিছু পয়সা রোজগার করেছে। এই প্রথম হরি ওর সঙ্গী দুজনকে হাসতে দেখল —— ওদের জামাপ্যান্ট জলে ভেজা, চুল দিয়ে জল গড়াচ্ছে, ওরা জলে আটকে যাওয়া ট্যাক্সি ঠেলে দিয়ে ড্রাইভারের কাছে পয়সা চাইছিল।

বৃষ্টিতে শহরের বছরকার আবর্জনা শুধু নয় গ্রীষ্মের তাপও ধুয়ে দিয়েছে, তাপমান যন্ত্রের পারদ এক ধাক্কায় হঠাৎ নীচে নেমে গেছে। প্রত্যেকেই নতুন জীবন পেয়েছে — এটা যেন একটা চড়ুইভাতি কিম্বা ছুটির দিনের মত। বস্তুত, স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে দিনটা ছুটির দিনই ছিল — কাউকে স্কুলে পাঠানো হয়নি। অফিসের লোকজনও যেতে পারেনি, কারণ জল জমার জন্যে বাস ও ট্রেন আটকে পড়েছে। 'শীগগীর আমাদের নৌকো লাগবে', জলের মধ্যে ছোটাছুটি করতে করতে রাস্তার ছেলেগুলো মন্তব্য করেছে।

হরি ও তার সঙ্গী ছেলে দুটোর কাছে দিনটা কিন্তু ছুটির দিন ছিলনা। মুটে ও ঠেলাওয়ালাদের কোন কাজ না থাকায় তারা শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়ে বসে থেকেছে। চা চেয়েছে, গরম গরম খাবার খেতে চেয়েছে। জগু ছেলেদের রাস্তা থেকে ডেকে এনে কাজে লাগিয়েছে। অন্যদিনের চেয়ে সেদিন বেশি কাজ করতে হয়েছে ওদের, কোন বিশ্রাম পায়নি। কয়লা ও কাঠ ভিজে ভিজে হয়েছিল, তাই আগুন জ্বালাতে অসুবিধে হচ্ছিল। ধোঁয়ায় ওদের চোখ জ্বালা করছিল, গলায় ঢুকে যাওয়ায় ওরা কাশছিল। কালিমাখা হাতেই চোখ ঘষতে হচ্ছিল বারবার। খদ্দের যারা আসছিল তাদের পায়ে পায়ে কাদা চলে আসছিল ঘরের ভিতরে, তাও ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হচ্ছিল ওদের কাপড় ভিজিয়ে, ফলে বালতির জলটা কিছুক্ষণের মধ্যেই কাদায় ভর্তি হয়ে

গেছে। ওদেরকে আবার বাইরে পাঠানো হচ্ছিল সিগারেট আনতে, ফলে জলে ভিজে ভিজে ওদের শরীরে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল।

সন্ধ্যা নাগাদ হরি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করল, যা তার কখনও হয়নি। এদিকে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। হঠাৎ তার মনে হল, আজ রাতে সে আর পার্কে ঘুমোতে পারবে না — এই বর্ষায় হয়তো আর কোনদিনই নয়।

রাতের মত দোকান বন্ধ করে জগু যখন আলো নিভিয়ে দিল, হরি তখন বুঝতে পারল বৃষ্টিতে সে বাইরে যেতে পারবে না, তাকে ওই দমবন্ধ ঘরে বেঞ্চের ওপর শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে। নিশ্চয় তার ঘুম আসবে না। জেলখানায় কয়েদীর প্রথম রাতের মতই এই রাতটাকে মনে হল হরির।

দিনরাত সপ্তাহের পর সপ্তাহ বৃষ্টি হয়ে চলল। প্রবল বৃষ্টির পর ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। বন্যার জল সরে গেল, তখনও কিছুই শুকনো হল না। সবকিছুই ভিজে ভিজে কাদার গন্ধমাখা। হরি যখনই ময়লার বালতি খালি করতে কিম্বা খদ্দেরদের সিগারেট কিনতে বাইরে যায়, তখনই তার জামা ভিজে যায়, সারাদিন সে ভিজে কাপড় গায়েই কাটিয়ে দেয়। এই করে একদিন তার খুব বাজে কাশি শুরু হয়, কাশির চোটে বুকে ব্যথা করে।

পাশের দোকানে মিঃ পানওয়ালার অবস্থা আরো খারাপ। তিনি একনাগাড়ে হাঁচি ও কাশির কবলে পড়েছেন। একদিন তিনি দোকান খুলতে পারলেন না, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হরি দেখেছিল তার চোখ লাল, জ্বর জ্বর ভাব। পরদিন তিনি আসতে পারলেন না। কিন্তু রান্নাঘরের কাজ থেকে হরির নিস্তার নেই, কেননা ঘড়ির দোকান বন্ধ, পার্কেও যাওয়ার জো নেই। রাতদিন শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়ে আটকে থাকতে থাকতে তার মনে হল জেলখানার সেলে যেন তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

জগু এটা টের পেয়েছিল। এক রাতে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে থেমে গিয়ে সে হরির দিকে তাকাল। হরি তখনও না শুয়ে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে কাশছিল।

'তোমার শরীর খারাপ। তুমি বরং আমার সঙ্গে এস। আমার বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাব।' জগু বলল।

বাইরে যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে হরি কৃতজ্ঞ বোধ করল। তাই সে উঠে গিয়ে জগুকে অনুসরণ করে হাঁটতে লাগল। জগু কোথায় থাকে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। তাই সে জানত না কোনদিকে তারা যাচ্ছে। শুধু কৃতজ্ঞ বোধ করছিল কারো বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে।

জগু একটা 'রেস্তোরা'-র মালিক — শহরের এক ব্যস্ত রাস্তায় তার খাবারের দোকান, প্রচুর খদ্দের তার। কিন্তু থাকে সে বস্তিতে টিনের ঘরে, বোম্বাই শহরে যাকে বলা হয় 'ঝোপড়পট্টি'। শহরের লাখ লাখ লোকের থাকার জন্যে বাড়ি বা

ফ্ল্যাট নেই, অথচ তারা এখানে থাকে, কাজ করে, জীবননির্বাহ করে। ফলে খুব ছোট ফ্ল্যাটের ভাড়াও জগুর মত লোকের কাছে বড্ড বেশি। ঝোপড়পট্টিতে একটা চালা ভাড়া পেয়ে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে।

ঝোপড়পট্টি সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের পাশে গড়ে উঠেছে। রাস্তার উল্টোদিকেই সমুদ্রের ধারে হরিকে নিয়ে গিয়েছিলেন মিঃ পানওয়ালা সমুদ্রে মৌসুমী বায়ুর প্রাদুর্ভাব দেখাতে। প্রশস্ত রাস্তার ওপারে পাহাড়ের দিকটায় নানা রঙের বড়বড় বাড়ি — গোলাপী, সবুজ, হলদে ও আরো কত রঙের। এই বাড়িগুলোর নামও আছে। যেমন সানসাইন, সীগাল — এখানে ধনী পরিবারগুলো বাস করে। পাহাড়ের অন্য পাশে সামনেই দরিদ্র মানুষের বস্তি, নীচে নেমে গেছে ব্যস্ত রাস্তা ও খোলা নর্দমা পর্যন্ত।

অপ্রশস্ত গলিতে জগুকে অনুসরণ করতে গিয়ে হরির পা ভিজে নরম মাটিতে পিছলে যাচ্ছিল। গোটা পাহাড়টাই যেন কাদায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বস্তির চালাঘর হেলে গেছে নর্দমার দিকে। এই নর্দমাটাই ঝোপড়পট্টিকে রাস্তার থেকে আলাদা করে রেখেছে।

দুপাশে চালাঘরের সারি, মাঝে সরু গলি। জগু হরিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিল। জামার হাতায় নাক মুছল হরি, তারপর চোখ থেকে চুল সরিয়ে ভাবল, এই রকম কোন একটা ঘরেই কি জগু থাকে? তার চিন্তা হল, হরিকে সে আনল কী করে এমন একটা জায়গায়? জগু একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের কাঠামো টিনের, চট ও প্লাষ্টিক শীট লাগানো আছে। দরজার ঝোলানো চট সরিয়ে ঝুঁকে সে ঢুকল ভিতরে, তারপর হরিকে ভিতরে আসতে ইঙ্গিত করল। হরিও মাথা নীচু করে ভিতরে ঢোকে।

ঘরের দরজার কাছে জমে আছে বৃষ্টির জল ও কাদা। জল ঢুকেছে দেয়ালের ফাঁক ও ছাদ দিয়ে। বস্তুত, মাটির মেঝে বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে, জলের সঙ্গে রাস্তার নোংরাও ঢুকেছে ঘরে। জগুর পরিবারের সবাই একটা দড়ির খাটের ওপর গাদাগাদি করে বসে আছে। টিন ও কার্ডবোর্ডের বাক্সে রাখা তাদের সব জিনিসপত্র একধারে ইট ও পাথরের ওপর রাখা আছে। কয়েকটা পুঁটুলি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বাঁশের খুঁটিতে। হরি অসহায়ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিল ওকেও ওই দড়ির খাটের ওপর সবার সঙ্গে বসতে হবে কিনা — এমনিতেই সেখানে কোন জায়গা ছিল না।

কিন্তু না, একটা কাঠের বেঞ্চিও ছিল। সেটা বাসনপত্র, বাক্স-পেঁটরায় ঠাসা ছিল। 'এখানে বোস, হরি', জগু ওকে বলল। তারপর সে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে কথা বলল। কয়েকজোড়া চোখ কাপড়ের ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখছিল। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে তারা মাথা ঢেকে রেখেছিল। ভিতরটা খুব অন্ধকার হয়েছিল, যদিও বাইরে থেকে রাস্তার আলো আবছাভাবে এসে পড়েছিল।

এবার এক মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল। হরি প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারছিল না কী বলা হচ্ছিল, কেননা মহিলার গলার স্বর খুবই তীক্ষ্ণ এবং কথাও বলছিল খুব চেঁচিয়ে আর অতি দ্রুত। কথার মধ্যে ছিল শাপশাপান্ত শুধু, যা হরি ভাল করেই জানে। সে খুবই বিমর্ষ হয়ে গেল এবং সাহায্যের জন্যে জগুর দিকে তাকাল।

'চুপ কর,' জগু ধমক দিল। 'আমার খাবার নিয়ে এস, আর এই ছেলেটার জন্যে একটা বাড়তি থালা দাও। ওর শরীর খারাপ। কাল সকালে আমি ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাব। আজ রাতে ও এখানেই থাকবে।'

মহিলার তীক্ষ্ণ, চিল-চিৎকার থামল না। ইতিমধ্যে অবশ্য দড়ির খাটের ওপর দলা পাকানো শরীরগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। তার মধ্যে থেকে একজন মাটিতে নেমে ওদের দুজনের জন্যে খাবার আনতে গেল।

'আমাদেরই জুটছে না, আর তুমি লোক আনছ খাওয়ার জন্যে', মহিলা ওদের সামনে দুটো থালা রেখে বলে। 'তুমি ভাবছ আমি তোমার সঙ্গীটিকে খেতে দেব ছেলেমেয়েদের ভাগ থেকে? তুমি কি ভাব যে তুমি খাবে তুমি থাকবে আর আমরা উপোস করব?'

'চুপ', জগু রেগে গিয়ে বলে। 'মুখ সামলাও বলছি, না হলে তোমার এই খাবার রেখে এখুনি তাড়ির দোকানে গিয়ে মদ খাব।'

'যাও, যাও', মহিলা চেঁচায়। 'আমি যেন ইচ্ছে করলেই তোমাকে আটকাতে পারব। এটাই তো চাও — তাড়ির দোকানে গিয়ে গিলবে। শুধু একটা অজুহাত পেলেই হল। তুমি গিয়ে বিষ গিলবে। তাতে আমার কী? যাও পয়সা দিয়ে ওই বিষ কিনে খেয়ে নিজেকে মার। তুমি চিতায় উঠলে হাসব আমি — ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাঁয়ে চলে যাব। জমিতে গিয়ে উপোস করে মরব, শকুনে খুঁটে খাক ...'

হরি থালার সামনে মাথা নীচু করে বসে থাকল, খেতে ইচ্ছে হল না তার। জগু কিন্তু গবগব করে গিলে সব খেয়ে ফেলল। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যখন আমাকে বাধ্য করছ, আমি চলে যাচ্ছি।' হরিকে একা ওই মহিলার কাছে ফেলে রেখে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জগু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মহিলা চুপ করে গেল। দড়ির বিছানার ওপর উঠে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলল নিজেকে। কাপড়ের ভিতর থেকে সে হরির দিকে তাকাল। তারপর জোরে শ্বাস নিয়ে পাশের শিশুটির গায়ে মৃদু চাপড় দিতে থাকল। হরি তার জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল।

'যাও, ঘুমোও', সে বলল। হরি বুঝতে পারল না কথাটা তার উদ্দেশে বলা না শিশুকে।' তুমি আর কী করবে, শুয়ে ঘুমোও। নাকি তুমিও মরতে যাবে তাড়ির দোকানে? আমরা তো তা পারবনা, আমাদেরকে তাই এখানেই শুয়ে ঘুমোতে হবে।' মহিলা কথাগুলো বলেই আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

হরি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। সে জানে এমন তিক্ত ও বেদনার্ত সুরে

মহিলা কেন কথা বলছিল। এইভাবে সে ও লীলা অনেক রাতে বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে কথা বলত। ওদের বাবা অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি ফিরত অনেক রাতে। হরির মনে হল, মহিলা যেন ওর ও লীলার মনের কথা বলছে। কথা বলছে যেন ওদের মার হয়ে। তাই সে ভয় পেল না আর।

'ও কি রোজ রাতে মদ খায়?' হরি বিড় বিড় করে অবশেষে কথা বলল।

মহিলা মাথা নাড়ল। 'না, ঝোপড়পট্টির আর সবার মত ও তত খারাপ নয়, শুধু মন খারাপ থাকলে বা খুব বেশি চিন্তা করলে মদ খায়।'

'আমার বাবা রোজ রাতে মদ খায়', হরি তাকে বলল। কখনও সে এ কথা আগে বলেনি কাউকে। কিন্তু যে মহিলা তাকে দেখে চিৎকার করেছে এবং খাবার খাওয়ার জন্যে অপমান করেছে, দেখা গেল তাকেই সে খোলাখুলি সব কথা বলছে।

'তাই না কি? তোমার মাকে মারেও বুঝি? আর তোমাদেরকে উপোসে রাখে?' আগ্রহ নিয়ে মহিলা জিগ্যেস করে।

সে মাথা নাড়ে, তারপর কথা বলার পরিবর্তে কাশতে থাকে। তার আর বলার দরকার নেই, মহিলা সব জেনে গেছে।

'এখন শুয়ে পড় বাছা। সকালে ডাক্তারখানা থেকে তোমার জন্যে ওষুধ নিয়ে আসব। ওখানে ডাক্তারের কাছে সর্দি কাশির ওষুধ আছে। আমি বাচ্চাটাকেও নিয়ে যাব — ওর শরীরটা ভাল নেই, জ্বর আছে গায়ে।' ঘুমন্ত শিশুর গায়ে হাত দিয়ে মহিলা আবার জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন।

বেঞ্চের ওপর জড়সড় হয়ে শুয়ে হরি ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। সে অবাক হচ্ছিল জগু কেন তার পরিবারের কষ্ট বাড়াতে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

পরদিন সকালে হরি জগুব সঙ্গে কর্দমাক্ত পাহাড়ের অন্য পাশে ডিস্পেনসারিতে পৌঁছল। এদিকটা বেশ সুন্দর ও আরামদায়ক। 'আমি দোকানে যাব জগুদা,' হরি বলল। 'এখানে আমার জায়গা হবে না। আমি ফিরে যাই।'

জগু রূঢ়ভাবে ওর দিকে তাকাল। 'ওই মেয়েলোকটা তোমাকে চলে যেতে বলেছে? ওর কথা শুনবে না — ও একটা শয়তান, শয়তান মেয়ে।'

'না, আমাকে তা বলেনি,' হরি তাড়াতাড়ি বলল। 'তবে তোমার বাচ্চাটা অসুস্থ, এমনিতেই ওর হাতে অনেক কাজ। আর ঘরটা ...'

'হুঁ', জগু চিন্তা করতে করতে বলে। 'ঘরটা বর্ষায় খুব খারাপ হয়ে যায়। শুকনো দিনে ততটা খারাপ নয়। তবে আমাদের জলের লাইন নেই, তাই ওকে পাম্প থেকে জল বয়ে আনতে হয়। বর্ষায় চারপাশে জল দাঁড়িয়ে অবস্থাটা খুবই খারাপ হয়ে ওঠে।' হরি অনুভব করল জগু যে ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভুল করেছে তা এখন বুঝতে পেরেছে। দয়াপরবশ হয়ে সাহায্য করতে চেয়ে এটা সে করেছে — হরি বোঝে, তাই সে জগুকে ধন্যবাদ জানাতে চায়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

টিনের ছাদ দেওয়া একটা ভাঙা বাড়িতে ডাক্তারখানা। বৃষ্টি হলে টিনের ওপর বেশ জোরে শব্দ হয়। ওরা গিয়ে দেখল, সেখানে বেশ বড় লাইন পড়েছে। বারান্দায় পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চারা সব দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টির মধ্যে ডাক্তার দেখাবে বলে। লাইন দেখে জগু নিরাশ হয়ে বলল, 'এতো অনেক সময় নেবে দেখছি।'

'আমি অপেক্ষা করব,' হরি বলল, 'তুমি দোকানে যাও, আমি এখানে একা দাঁড়াতে পারব।' জগু চলে গেলে হরি দেখল জগুর স্ত্রী বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এসে লাইনের ঠিক শেষে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াল। তার হাতে একটা খালি ওষুধের শিশি। এগিয়ে গিয়ে হরি বলল, 'আমি ওষুধ নিয়ে দেব। বাচ্চাটাকে আমি ধরছি।' অবাক হয়ে সে হরির দিকে তাকাল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না - না, আমি দাঁড়াতে পারব।' হরি সরে গেল, সে জানে ওকে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সারা বর্ষাকালটাই হরি জগুর খাবার দোকানে কাটাল। শহরের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না তার। তার একমাত্র বন্ধু মিঃ পানওয়ালা — তার দোকানও বন্ধ থেকেছে। যে বড় বাড়িটার দারোয়ান হরিকে প্রথম এখানে এনেছিল, সে একদিন এখানে এসে থেমেছিল। মাথায় ছাতা দিয়ে দাঁড়িয়ে হরিকে ডেকেছিল।

'কেমন আছ, খোকা?' বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দিয়ে তার কথা শোনানোর জন্যে সে জোরে কথা বলছিল। 'এখানেই তো আছ, দেখছি? কাজ পছন্দ হয়েছে? সব ঠিক আছে তাহলে?'

হরি মাথা নেড়ে হাসার চেষ্টা করল। এই লোকটির জন্যই হরি আশ্রয় পেয়েছিল, কাজ পেয়েছিল, খাবার খেতে পেয়েছিল, বন্ধু পেয়েছিল। কাজ, আশ্রয় ও খাবারের তুলনায় তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হলেও সে জানে, লোকটির কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' সে বলল, 'সব ঠিক,' সে জানে বোম্বাইয়ের অনেক লোকের তুলনায় সে ভাল আছে।

'তুমি কি জান, সীবার্ড-এ সেই রাতে তুমি যাদের খোঁজে গিয়েছিলে তারা ফিরে এসেছে? গত সপ্তাহেই ওরা বিদেশ থেকে ফিরেছে। একদিন এসে দেখা করে যাও। ওদের ফ্ল্যাটে একটা কাজ তোমাকে দিতেও পারে।'

হরি খুব অবাক হয়ে গেল। কতদিন ওদের কথা মনে করেনি সে। তার সমস্ত সময় ও মন জুড়ে থেকেছে রান্নাঘরের কাজ, মিঃ পানওয়ালার কাছে ঘড়ি মেরামতির কাজ ও বাড়ির জন্যে টাকা জমানোর চিন্তা। এমন কোন সময় তার নেই যাতে সে আগামীকাল বা তার পরদিনকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে। এখন তার মাথায় বোম্বাইয়ে প্রথম রাতের চিন্তা ফিরে এল। কত অবাকই না হয়েছিল সেদিন ইলেকট্রিক আলো, বড় বড় অট্টালিকা ও মানুষের ভিড় দেখে। তার মনে পড়ল ফ্ল্যাটবাড়ির কথা, লিফ্‌টের কথা। লিফ্‌টে করে সে যেন ম্যাজিকের মত গিয়ে পৌঁছেছিল ঝকঝকে দরজার সামনে, সুন্দর ঘরের ভিতর থেকে সাদা

পোশাকপরা মেজাজী চাকরটা বেরিয়ে এসেছিল। হরি ময়দা মাখতে মাখতে এ সবকিছুই ভাবল। রুটি বেলার সময় এবং ডাল কিম্বা চা পরিবেশন করার সময় পর্যন্ত সে ভেবেই চলল। এই সবকিছু ছেড়ে সে কি চলে যেতে পারবে? ওই বিত্তশালী আকাশসমান এ্যাপার্টমেন্টের জগতে তার কি স্থান হবে? সে কি ওই চাকরি, গাড়ি, ছুটি, অর্থ ও স্বাধীনতার স্বপ্নময় জগতে অংশ নিতে পারবে?

এসব ভাবতে গিয়ে জ্বর জ্বর ভাব হল তার। সে রাতে সে ঘুমোতে যেতে পারল না। ভাবল, ঘড়ির দোকানের ভদ্রলোকের উপদেশমত সে কি অবসর সময়ে ঘড়ি মেরামতির কাজে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করবে?

সেই রাতে ভারত মহাসাগরে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, এবং তা শহরেও এসে আছড়ে পড়ল। আকাশে জমে ওঠা কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের তরবারি ঝলসে উঠল। একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল বাজ পড়ার শব্দ। পরদিন খুব সকালে দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই বৃষ্টি শুরু হল। রাস্তাঘাট আবার জলমগ্ন হল। সমুদ্র থেকে ঝোড়ো হাওয়া এসে শহরের জানলা ও দেয়ালে আছড়ে পড়ল তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে। পার্কের একটা বিশাল গাছ ভেঙে পড়ল পাশের রাস্তা জুড়ে, ফলে যানবাহন আটকে গেল রাস্তায়। হর্ন বাজিয়ে চিৎকার করে কোন ফল হল না। সমস্ত রাস্তায় বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হল। জলমগ্ন রাস্তায় যেখানে সেখানে বাস ও প্রাইভেট কার আটকে থাকল। তাদের দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে হরি সব দেখছিল, ভিজে কাপড়ে কাঁপছিল সে।

সেদিন তেমন খদ্দের ছিল না ওদের। এমনকি পথচারীও দেখা যায়নি রাস্তায়। একজন লরিচালক চা খেতে এসে আটকে গিয়েছিল সারাদিন তার লরিটি কোমর অব্দি জলে আটকে পড়েছিল। ওর সঙ্গে ছিল একটা ট্রানজিস্টার রেডিও। সেটাকে টেবিলে রেখে শুনতে শুনতে সে চা ও খাবার খাচ্ছিল। রান্নাঘরের ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে শুনছিল। তারা বোম্বাই সিনেমার গান শুনল। টুথপেষ্ট, গুঁড়োসাবান, রান্নার তেল ও মুখে মাখার ক্রীম ইত্যাদির বিজ্ঞাপন শুনল। রাজা রানী ও যুদ্ধে হার জিতের কাহিনী দিয়ে তৈরি নাটকও শুনল তারা। তারপর নাটকের শেষে রাজা যখন মারা গেল এবং রানী শেষ গানখানা শেষ করল, তখন ঘোষকের কণ্ঠে সংবাদটা শোনা গেল।

সংবাদ ঝড় বিষয়ে — কিভাবে গত বার ঘন্টায় দশ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে শহরে, কিভাবে সমস্ত শহর অচল হয়ে গেছে। তারপর শোনা গেল — 'দশটি মাছধরার নৌকো সমুদ্রে নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে অনেক জেলে প্রাণ হারিয়েছেন।' হরি আঁৎকে উঠে রেডিওর কাছে কান নিয়ে গেল। 'কোথায়?' সে আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। যেন সে সংবাদপাঠকের কাছে উত্তর দাবি করছে।

অন্য ছেলেরা ওর দিকে চেয়ে হাসতে থাকল। লরিচালকও বিরক্তিসূচক

হাসল। হরি কিন্তু তার উত্তর পেয়ে গেল। 'ঝড় কমে এলেই আলিবাগ থেকে অনুসন্ধানকারী দল পাঠানো হবে।'

'আলিবাগ', হরি চিৎকার করে উঠল। 'আমার বাড়ি, আমাদের দেশ!'

'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে।' লরি চালক শিখ, বড় গোঁফ ও লাল পাগড়ি তার মাথায়, হরিকে বোঝাল, 'তুমি তো জেলে নও, তাই না? আর তুমি নৌকোতেও নও। তুমি রেষ্টুরেন্ট খাবারদাবার ও গরম চা নিয়ে নিরাপদে বসে আছ। তোমার বিচলিত হওয়ার কারণ নেই।'

জগু ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তার বাড়িতে হরিকে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার পর থেকে সে কথা বলেনা বললেই চলে। কিন্তু এখন সে বলল, 'কী ব্যাপার? তোমার বাবা কি মাছ ধরতে যায়? তার কি নৌকো আছে?'

'না', হরি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'না', তারপর সে নিজের মনে চিন্তা করার জন্য রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। ওই নৌকোগুলোর একটিও তাদের নয়, তাদের কোন নৌকো নেই, এ সবই সত্যি। কিন্তু যারা নিরুদ্দেশ হয়েছে তাদের সে চেনে, বন্ধু বা প্রতিবেশী মানুষ। হঠাৎ তার বিজুর নৌকোর কথা মনে পড়ল। এতদিনে নিশ্চয় সেটাকে জলে ভাসানো হয়েছে এবং গভীর সমুদ্রে পাঠানো হয়েছে।

দূর চক্রবালে দেখা নৌকোর পালগুলোর কথা ভাবল সে — রাতে সারি সারি নৌকোর আলো দেখা যেত তটে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যায় মাছ ধরা নৌকো দল বেধে ফিরে আসত মাছ নিয়ে। বালির ওপর রাখা টাটকা চকচকে মাছের ঝুড়ি নিয়ে মেয়েদের চেঁচামেচি ঝগড়া সব মনে এল তার। নিজে জাল নিয়ে তীরের অগভীর জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেত। তার ধরে রাখা কাঁকড়া কাকেরা এসে নিয়ে চলে যেত। জলের ঢেউয়ের ওপর গাঙচিল ছোঁ মারত মাছের খোঁজে। তার মনে এল তাদের বাড়ির কাছের পুকুরে একটা পাথরের ওপর বসে থাকা বকটার কথা, আর এক ঝলক নীল রঙের আভা ছড়িয়ে গাছ থেকে নেমে আসত একটা মাছরাঙা পাখি। এবার লীলার কথা মনে এল — ফুলের ঝুড়ি নিয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রতীরের পাথরের ওপর ফুল ছড়াতে। বেলা ও কমল ছোট পাথরের ঢিবির ওপর বসে শামুকের ওপর ঢিল ছুঁড়ছে। তার মনে হল যেন সে পিন্টোর ডাক শুনল। ওদের সবার জন্যে তার মন আকুল হয়ে উঠল। আগুনের পাশে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসে সে হাঁটুর ওপর মাথা রাখল। তারপর আবার গ্রামের দৃশ্যগুলো দেখার চেষ্টা করল।

বর্ষা শুরু হতেই মেয়েরা দ্রুত নারকেল গাছের পাতা জোড়া দিয়ে তাদের পুরনো জীর্ণ চালার ওপর চড়াল। সমুদ্রের দিক থেকে ধেয়ে আসা বৃষ্টির আঘাত থেকে বিশেষ করে রক্ষা করা দরকার ছিল দরজা ও জানলার ওপরে ছাদের অংশটা। যেভাবে দিনরাত অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে তা থেকে বাড়িটাকে রক্ষা করা দরকার ছিল। বিশাল কালো মেঘ মনে হয় যেন সমুদ্র থেকে উঠে আকাশ ঘিরে

ধরে। জলের বিশাল বিশাল ঢেউগুলো যেন উঁচু হয়ে উঠে ওই মেঘকে ধাওয়া করছে। ফলে সমুদ্র ও পৃথিবীময় জলের এক বিশাল চাদর যেন বিস্তৃত বলে মনে হয়।

বর্ষায় জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পাশের খালটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নৌকোগুলোকে তাই খাল বেয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ভিতরে। জলের ওঠানামার সঙ্গে নৌকোগুলো একটা আর একটার সঙ্গে ধাক্কা খায়। তাদের পাল খুলে রাখায় মাস্তুলগুলো খালি হয়ে আকাশের দিকে উঠে থাকে। গ্রামের লোকেরা যতক্ষণ সম্ভব ঘরেই আবদ্ধ থেকেছে। যখন বাধ্য হয়ে বেরিয়েছে, তখন তাদের মাথায় থেকেছে কালো রঙের ছাতা। পুকুর ও জলা জায়গাগুলো সব জলমগ্ন হয়ে গেছে। বুনো গাছ, লতাপাতা যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে আর রাতভর ব্যাঙ ডেকেছে। আগুন জ্বালালে ধোঁয়া হয়েছে খুব বেশি। ঘরগুলো স্যাঁতসেঁতে ও শ্রীহীন হয়েছে। বৃষ্টির আঘাতে আঘাতে ছাদ ফুটো হয়ে ঘরে জল পড়েছে। জিনিসপত্র এত ভিজে গেছে যে মনে হচ্ছিল যে এসব আর কোনো দিন শুকোবে না।

যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, তাদের এখন কোন কাজ নেই। এই ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রে যাওয়া সম্ভব নয়, আর মাছও তেমন উঠবে না। তাই পুরুষদেরও দেখা গেল দড়ি দিয়ে নারকেল গাছের পাতা বুনছে ছাদে চড়ানোর জন্যে। সাধারণত একাজ মেয়েরাই করে থাকে। বাড়িতে থাকার জন্যে হয়তো ওদের তাড়ি বেশিই খাওয়া হচ্ছিল। লীলার বাবা অবশ্য ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

হাসপাতালের বাইরে বসে সে ডাক্তার ও নার্সদের আসা যাওয়া দেখছিল। স্ত্রীর যা কিছু দরকার তার ব্যবস্থা করছিল। সে একটা ছোট হাতে তৈরি মাটির হুঁকো খাচ্ছিল বারান্দায় কুঁজো হয়ে বসে। বাইরে তখন বৃষ্টি হয়ে চলেছে। লীলা নিয়মিত সপ্তাহে একদিন করে আসে, 'মন রিপোজে' কাজ করে যা পায় তা থেকে কিছু টাকা বাবাকে দেয়। এই টাকায় তার চা, তামাক ও জলখাবার হয়ে যায়। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে কাদা মেখে আসতেও লীলার ভাল লাগে কেননা বাবা এখন শান্ত, মদ খায় না, আর মাও প্রতি সপ্তাহেই আবো সুস্থ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই আসায় তাই আনন্দ ছিল। অবশ্য প্রতিবারই ফিরে আসার সময় তাদের কান্নাকাটি চলে।

বোনেরা মাঝেমাঝে একসঙ্গে মিলে জিনিসপত্র আনতে গ্রামে ঢুকেছে। এর জন্যে অবশ্য বৃষ্টি থামা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। গোটা গ্রামটাই যেন বাড়ির মধ্যে বসে আছে, রাস্তাঘাট এত ফাঁকা।

মৎস্যজীবীরা বর্ষার তিনমাস ঘরে থাকবে, তা অবশ্য সম্ভব নয়। জমানো খাদ্য শস্য কমে যেতে থাকলে খাবারের থালায় টান পড়ে একসময়। শুকনো মুখে তাদের থাকতে দেখা যায়। বৃষ্টি যখন কমে আসে, তারা সমুদ্রের ধারে যায়, নৌকোতে চড়ে বসে। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে আবহাওয়া নিয়ে কথা বলে।

একদিন বৃষ্টি ছিল না, ধূসর রঙের মেঘে শুধু আকাশ ছেয়ে ছিল, মনে হয়নি তা থেকে বৃষ্টি নামবে এখনই। কয়েকজন জেলে তাদের নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। লীলা গ্রামের দোকান থেকে ব্যাগে করে চালডাল ইত্যাদি নিয়ে ফিরছিল। হঠাৎ সে দেখল নৌকোগুলো ঢেউয়ের মধ্যে প্রবলভাবে দোল খাচ্ছে। নৌকোর পাল উড়ছে খুব জোরে। আর মানুষগুলো নৌকোকে শক্ত করে ধরে রাখতে এদিক ওদিক করছে। বৃদ্ধ বিজু এই ভরা বর্ষায় তার নতুন নৌকো সমুদ্রে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেয়নি। সে খালের মুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল। 'এই বোকারা, ফিরে আয়। এই আবহাওয়ায় চালানোর মত করে তোদের নৌকো তৈরি হয়নি।'

'আবহাওয়া তো ভালই, দেখছ না?' একজন চিৎকার করে উত্তর দিল। 'বুড়ি মেয়েমানুষদের মত আর বাড়িতে বসে থাকতে পারছি না।'

'ডুবে যাবি তোরা,' বিজু তবুও বলল, 'তোদের নৌকো ভেসে যাবে।' পুনরায় সমুদ্রে যাওয়ার রোমাঞ্চ অনুভব করে ওরা হাসল শুধু।

লীলা আর কিছু দেখার জন্যে দাঁড়াল না। ঢেউয়ের ওপর লাফাতে থাকা ছোট নৌকোগুলোকে দেখে সে ভয় পেল। খুব বেশিক্ষণ হয়নি সে বাড়িতে ফিরেছে। এমন সময় একটানা গম্ভীর শব্দে অশুভ বজ্রপাতের শব্দ শুনতে পেল। সারারাত ধরে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা গেল, শোনা গেল কড় কড় শব্দে বজ্রপাত। নারকেলগাছগুলো এমন পাগলের মত মাথা নাড়তে লাগল যে মনে হল যেন গাছগুলো ওদের কুটিরের ওপর ভেঙে পড়বে। ঝড়ের শব্দের সঙ্গে উত্তাল সমুদ্রের গর্জন মিলে এমন ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যে মেয়েরা কাঁথার ভিতরে ঢুকে শুয়েছিল। 'শব্দে কানে ব্যথা করছে?' মুখে এমন কথা বললেও আসলে খুব ভয় পেয়েছিল ওরা।

সেদিনই খুব সকালে সবচেয়ে মারাত্মক ঝড়ের প্রকোপ শুরু হল। এক সময় ওদের মনে হচ্ছিল ওদের বাড়িটা যেন ঝড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। লীলার ভয় হচ্ছিল নারকেল গাছ একটা ভেঙে পড়বে ওদের কুটিরের ওপর। প্রতি মুহূর্তেই খালের জল বেড়ে যাচ্ছে, ফলে খালটা বেশ বড় নদীর চেহারা নিচ্ছিল। বেলা ও কমল পাশাপাশি ভয়ে ও উত্তেজনায় বসে ছিল। লীলা কিন্তু নিশ্চুপ হয়ে থাকল। নৌকোগুলোকে সে সমুদ্রে যেতে দেখেছে, কিন্তু বোনদের সেকথা সে জানায়নি।

তিনদিন লাগল ঝড় কমতে। আরো দুদিন লাগল মেঘ সরে গিয়ে ম্লান রোদের দেখা পেতে। তিন বোনে তীরের দিকে ছুটল শিলায় ফুল ও আবির ছড়াতে। ওরা ঢেউয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজে যেতে যেতে চিৎকার করছিল। তখনই গ্রাম থেকে ফেরার পথে হীরাবাই ওদের কাছে দাঁড়িয়ে নৌকোগুলোর ভাগ্যে কি ঘটেছে সেই কথা শুনিয়ে গেল। ছোট মেয়েদুটি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। আর লীলা বিশদভাবে সব জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল। প্রায় চারদিন হয়ে গেল নৌকোগুলো

নিরুদ্দেশ হয়েছে। ঝড় কমতে শুরু করলে নৌ ও উপকূল রক্ষী বাহিনী থেকে অনুসন্ধান দল আলিবাগ থেকে যাত্রা শুরু করল। বিজু ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করায় ওকে নেওয়া হয়েছিল। সে-ই প্রথম নৌকোগুলোকে দেখতে পেয়েছিল। তিনটে নৌকো ডুবে গেছে, আর বাকিগুলোকে ভাঙা চোরা অবস্থায় দেখা গেছে। তিন জন ডুবে মারা গেছে, আর বাকিদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল। তারা তখন অনাহারে ও প্রাণ বাঁচানোর ধকলে গুরুতর অসুস্থ।

নৌ ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর লোকেরা খুবই প্রশংসা করল বিজুর — তারা ওকে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু উদ্ধার পাওয়া মানুষগুলো তখন এত ক্লান্ত যে একটা কথা বলারও ক্ষমতা ছিল না তাদের। তারা নীরবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরে গেল।

'আমি ওদের বলেছিলাম — আমি ওদের যেতে নিষেধ করেছিলাম। ওই দেশলাই কাঠির মতো নৌকোগুলো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত ছিল না।' খালের ধারে দাঁড়িয়ে বিজু ওদের নৌকোগুলো বেঁধে রাখার কাজের তদারকি করতে করতে জোরে জোরে কথাগুলো বলল। দিনটা ওর কাছে খুবই উল্লেখযোগ্য, কেননা সে ওর নিজের নৌকোটির ক্ষমতা দেখাবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তার দুঃখ যে মাথামোটা লোকগুলো সেকথা স্বীকার করছিল না। 'স্বীকার কর এবার — তোমাদের এবার স্বীকার করতেই হবে।' সে জোর দিয়ে বলে। এইসব আবহাওয়ার জন্য ডিজেল ইঞ্জিন লাগানো নৌকো তোমাদেরও বানাতে হবে। না হলে নৌকোর পালই তোমাদের ডুবিয়ে মারবে।'

জেলেদের স্ত্রীরাও বালির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। বিজুর কথা শুনে তাদের মধ্যে থেকে একজন মন্তব্য করল, 'তা ঠিক, কিন্তু তোমার নৌকোর মত নৌকো ক'জন বানাতে পারবে?'

'আমাদের নৌকোগুলো পলকা, কোন কাজের নয় এ-কথা মানছি', অন্য একজন বলল, 'কিন্তু আমাদের তো খেতে হবে। আমাদের পুরুষদের মাছ ধরতে যেতেই হবে।'

বিজু তাকাল। আর অহমিকা দেখানোর সুযোগ পেল না। 'একদিন সবাইকে আমার মত নৌকো বানাতে হবে। অবস্থা পাল্টাবে। তখন এসবেরও উন্নতি হবে' ওদের চলে যাওয়ার সময় বিজু বলল। তারপর সে খালের কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে নিজের নৌকোর দিকে এগোল — ঝড় ও বৃষ্টির ওপর নৌকোটিকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায় না। হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিও একটু একটু করে শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে।

হঠাৎ ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের মধ্যে একজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে ডাকল। 'তুমি, এই যে তোমাকে বলছি আমার নৌকোটা যে খুবই ভাল হয়েছে, তা দেখছ তো?' সে জোরে শব্দ করে হাসতে লাগল কেননা যাকে দেখে সে

কথা বলছিল সে কোন উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিল দ্রুত। এ হল কারখানার সেই চৌকিদার লোকটি যে নৌকো তৈরির সময় নানা মন্তব্য করে হাসাহাসি করেছিল। সে এখন বুঝতে পেরেছে গ্রামের লোক, তাদের নৌকো, হাতের কাজ সে যেমন ভেবেছিল প্রথমে, তেমন খারাপ কিছু নয়। অবশ্য সে মুখে একথা স্বীকার করতে চাইবে না, তাই সে দ্রুত তার কুটিরের দিকে এগোচ্ছিল।

মেয়েদের কাছে বিশদভাবে এ সব বর্ণনা ক'রে হীরাবাই বলল, 'হ্যাঁ, আজকের দিনটা বিজুর গর্বের দিনই বটে।'

'ঠিক', লীলা বলল। 'কিন্তু অন্যান্য লোকেরা ও তাদের বৌরা কী বলছিল?'

হীরাবাই আকাশের দিকে হাত তুলল। 'যা ওরা সব সময়ই করে', সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'সব ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়া আমরা আর কী-ই বা করতে পারি, বল।' সে ধীরে ধীরে নারকেলগাছের সারির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল।

লীলা, বেলা ও কমল সেই রাতে ঠেসাঠেসি করে ধোঁয়া ওঠা উনুনের পাশে বসেছিল। 'মন রিপোজ'-এর ভদ্রলোক ওদের যে টাকা দিচ্ছেন তা দিয়ে ওদের খাওয়া জুটছে এটা মনে করে ওরা কৃতজ্ঞবোধ করছিল। বর্ষাতেও ভদ্রলোক চলে যাননি, বৃষ্টির মধ্যেও ঘুরে বেড়িয়েছেন, যেন কিছুতেই তাঁর নজর নেই। ওঁর এই উপস্থিতির জন্যেই ওরা কৃতজ্ঞ, কেননা ওদের বাবা ও ভাই এখন নেই। বাইরে ঝড়ের শব্দ শুনতে শুনতে ওরা হরির কথা ভাবল। সে বোম্বাইয়ে নিরাপদে আছে, একথা চিঠি লিখে জানিয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসছে না কেন? ওরা নীরবে বসে রইল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে ব্যাঙের ডাক তাদের কানে আসছিল। আর নারকেলগাছের পাতা থেকে গড়িয়ে বৃষ্টির জল তাদের ছাদে পড়ছিল, ঘরেও জল চুইয়ে পড়ছিল।

একসময়ে বেলা মেঝের কাদায় আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বলল, 'হরি কবে আসবে মনে হয়?'

'ও তো এখন আসতে পারবে না। বর্ষায় ফেরি বন্ধ আছে,' লীলা বুদ্ধি করে উত্তর দিল — 'হয়তো বর্ষা শেষ হলে আসবে। ও হয়তো দেওয়ালির সময় আসবে।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

'**এত চিন্তা করছ** কেন খোকা, একদিন তো বাড়ি যাবে, মিঃ পানওয়ালা স্নেহমাখা **কণ্ঠে বললেন**।' 'তুমি বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে আসোনি, সহজেই ফিরে যেতে পার।'

'কবে?' হরি উত্তেজিত হয়ে বলে, 'আমি এখনই যেতে চাই।'

'বৃষ্টি থামলে যেও। বর্ষায় রেওয়াস পর্যন্ত ফেরি চলে না। বৃষ্টি যখন শেষ হবে, তখন তুমি যেতে পার। ততদিনে তোমার আরো বেশি টাকা জমবে, তাই না? আমার শরীরটাও ভাল হয়ে যাবে, আমি দোকানে বসতে পারব, তুমিও ঘড়ি মেরামতির কাজ শিখবে। তুমি একবার নিজে নিজে ঘড়ির কাজ করতে শিখলে যা টাকা পাওয়া যাবে তা তোমার হবে। আমি নেব না। এটা ভাল হবে, না? তারপর তুমি গ্রামে ফিরে গিয়ে ওখানে ঘড়ি সারানোর কাজ করতে পারবে।'

হরি বৃদ্ধ মানুষটির অজ্ঞতা দেখে হাসল। গ্রামে সেখানে সবাই সূর্য দেখে সময় ঠিক করে, সেখানে ঘড়ি দরকার হবে কার? বৃদ্ধ বিজুর নিশ্চয় একটা ঘড়ি আছে, কিন্তু সেটাতে বোধহয় লোনা আবহাওয়ায় মরচে ধরেছে। টেলিভিসন সেটের মত ঘড়িও ওখানে কোন কাজে লাগেনা। তথাপি সে খুব খুশি হল। মনে মনে মিঃ পানওয়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

বাড়ির জন্যে যখন তার মন খুবই উতলা হয়ে উঠেছিল, তখনই সে মিঃ পানওয়ালাকে দেখতে ছুটেছিল। বুড়ো মানুষটি অসুস্থ হবার পর থেকে আর দোকানে আসেনি। তখন থেকেই তার দোকানের দরজা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু একদিন একজন লোক তার ঘড়ির খোঁজে এসে পাশের খাবারের দোকানে জগুর কাছে মিঃ পানওয়ালার কথা জানতে চাইল। হরি শুনল জগু তাকে মিঃ পানওয়ালার ঠিকানা জানাচ্ছে।

ঘরমোছার কাপড়টা হাত থেকে ফেলে দিয়ে হরি ছুটে এসে বলল, 'কোথায়, কোথায় থাকেন উনি?' তার মাথায় আগে এটা আসেনি যে জগু ঠিকানাটা জানতে

পারে। জগু ঠিকানাটা আবার বলল। হরি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আধঘন্টা ছুটি দেওয়ার জন্য মিনতি করল যাতে সে মিঃ পানওয়ালাকে দেখে আসতে পারে। দোকান থেকে দূরে নয়, গ্র্যান্ট রোডে স্টেশনের ঠিক পাশে রাস্তার শেষে, ঠিকানাটা সহজেই খুঁজে পেল হরি। সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সে তরতর করে ওপরে উঠে গেল। তাকে পেরোতে হল নীচের তলার মিষ্টির দোকান, দোতলার পশু নিরাময় কেন্দ্র। দরজায় ঝুলছিল গাঁদা ফুলের মালা, নীচে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি আলপনা। ওপরের

তলায় ব্যালকনিসহ একটা ছোট ঘরে থাকেন মিঃ পানওয়ালা। ব্যালকনিতে পুরনো টিন ও বাক্সে নানা গাছপালা লাগিয়েছেন তিনি।

পুরনো একটা বেতের চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ পানওয়ালা। তাকে খুবই ফ্যাকাশে ও রোগা দেখাচ্ছিল, তবে তিনি সেরে উঠছিলেন। প্রথমে তার ফ্লু হয়েছিল, পরে খুব খারাপ অবস্থায় পৌঁছে ব্রোঙ্কাইটিসে পরিণত হয়। প্রতিবেশিরা ভয় পেয়েছিল হয়ত বা তাকে হাসপাতালেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তাকে এত দুর্বল দেখাচ্ছিল যে তারা তাকে ওখানেই রেখে দেয় এবং পালা করে তারা তাকে খাবার, গরম দুধ, চা ইত্যাদি জোগায়। নীচের তলায় যে ডাক্তার থাকেন তিনি বিনা পয়সায় তার চিকিৎসা করেন। আসলে তারা পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একে অপরের প্রতিবেশী। তাছাড়া মিঃ পানওয়ালা ওখানে সবার প্রিয় তাও প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই তিনি সেরে উঠতে সবাই স্বস্তি পেয়েছে। তবে তারা ওকে বর্ষার আবাহাওয়ার মধ্যে কাজে না গিয়ে বাড়িতেই বিশ্রাম নিতে বলেছে। হরি ওর ঘরে ঢুকতেই তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। এতক্ষণ তিনি রেলওয়ে স্টেশনের করোগেটেড টিনের ওপর পায়রাগুলোর দিকে চোখ রেখেছিলেন। দলবেঁধে পায়রাগুলো বসছিল টিনের ওপর, আবার কোন ট্রেন যাওয়ার শব্দে দলবেঁধে উড়ে যাচ্ছিল।

হরি তাঁর পায়ের কাছে একটা মোড়ায় বসে চা খাচ্ছিল একটা কাপ থেকে। নীচের চায়ের দোকান থেকে এই চা এনে দিয়েছে গৃহহীন একটা ছেলে, যে কোন একসময় মিঃ পানওয়ালা কাছ থেকে উপকার পেয়েছে। হরি চায়ে চুমুক দিতে দিতে থালের কথা বলছিল। মিঃ পানওয়ালা খুব মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ চতুর পাখির মত মাথাটাকে একদিকে হেলিয়ে রেখে কথা শুনছিলেন আর সারাক্ষণ কোলের ওপর শায়িত ধূসর রঙের বেড়ালটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

'হ্যাঁ', তিনি মাথা নাড়ালেন, 'কদিন বাদেই নারকেল উৎসব আসছে, বর্ষার শেষে সবাই তখন সমুদ্রে নারকেল অঞ্জলি দেবে যাতে নৌকোগুলোও নিরাপদে যাত্রা করতে পারবে। তখন তুমি বাড়ি ফেরার ফেরি ধরতে পারবে। তোমার এভাবে বাড়ি ছেড়ে আসা ঠিক হয়নি। মা ও বোনেদের ছেড়ে এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি। কত রোগা ও দুর্বল হয়ে গেছ তুমি, দেখ।' এই বলে তিনি মুখে সমবেদনাসূচক চুক চুক শব্দ করলেন। 'ওখানে আমার কিছুই করার ছিল না' হরি বোঝাবার চেষ্টা করল। 'আমার বাবা মাছধরার নৌকো অনেকদিন আগে বিক্রি করে দিয়েছে। গরুটাকেও বিক্রি করেছে। আমার কোন কাজ ছিল না। একটুকরো জমি, এত ছোট যে কখনো কোন সব্জির চাষ করা যায় না। আর এখন থালে বিশাল কারখানা তৈরি হবে, আমাদের সব জমি ওরা নিয়ে নেবে। সবাই বলছে, মাছধরা বা জমিচাষের কোন সুযোগ আর থাকবেনা। আমি তাই কাজের খোঁজে বোম্বাই চলে এসেছি।'

'কাজ তুমি যে কোন জায়গাতেই খুঁজতে পার', মিঃ পানওয়ালা বললেন। তিনি এবার সোজা হয়ে বসেছেন এবং হরির দিকে তাঁর পাখির মত চোখদুটো স্থির করে রেখেছেন। 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার হাতদুটো ব্যাবহার করতে পারবে', নিজের হাতদুটো তুলে দশটা আঙুল নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, 'ততদিন এগুলোর কাজ থাকবে। তোমার কাজ শেখার ইচ্ছে থাকা চাই, অবস্থার পরিবর্তন করার ইচ্ছে থাকা চাই। ওরা যদি তোমাদের জমি নিয়ে নেয়, কারখানায় কাজ করা শিখতে হবে। তোমরা যদি জোর করে কারখানা বন্ধ না করতে পার, এটাকেই কাজে লাগাতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।'

'গ্রামের বড়রা বলছিল, ইঞ্জিনীয়ার ও কলেজে পাশ করা লোকেরাই শুধু চাকরি করবে ওখানে। ওখানে কোন চাষী বা জেলের দরকার হবে না। আমরা তাই কোন কাজ পাব না।'

'হুঁম-ম...' মিঃ পানওয়ালা কিছুক্ষণ তার ঠোঁট চেবালেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ তা ঠিক, কিন্তু কারখানা ছাড়াও আরো অনেক কাজ আছে যা তুমি করতে পার। ওরা যখন কারখানার জন্য বাড়ি তৈরি করবে, তুমি বাড়ি বানানোর কাজ বা রাস্তা তৈরির কাজ করতে পার। পরে ইঞ্জিনীয়ার ও মেকানিকরা নতুন হাউজিং কলোনীতে বাস করার জন্য আসবে, তখন তাদের কাজ করার লোকের দরকার হবে। তাদের খাওয়ার জিনিসপত্রেরও দরকার হবে, যেমন সব্জি, দুধ, ফল ও ডিম। তখন দেখবে তুমিই সব্জি বিক্রি করছ, নারকেল বিক্রি করছ। তুমি যদি একটা গরু কিনতে পার, কিম্বা মুরগি কিনলে, তা দিয়ে তোমাদের চলে যাবে। হ্যাঁ, এরকম সব বিষয়েই ভাবতে হবে তোমাকে, দেখবে কত কাজ। দেখবে ওদের হাতঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি সব তোমার কাছেই সারাতে নিয়ে আসছে।' এবার তিনি তার দন্তহীন গোলাপী মাড়ি বের করে হাসলেন। তোমার ঘড়ি সারানোর কাজের দক্ষতা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে না তাহলে। হয়ত থালের প্রথম ঘড়িমেরামতির দোকানটা তোমারই হবে, কী বল?'

হরিও বিস্ময়ে হাসল। সে কেন এসব আগে ভাবেনি?

'ওহ্ পানওয়ালা সাব', সে জোরে বলল, 'আপনি কবে দোকানে আসছেন? আমাকে আরো শিখিয়ে দেবেন তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়', মিঃ পানওয়ালা হাসতে হাসতেই তার বিড়ালের গায়ে হাত বুলালেন।' আমি আসছি, এসে তোমাকে শেখাব। তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যেওনা বেটা, আমার জন্যে অপেক্ষা কর।'

'আমি চলে যাবনা, আমি আরো শিখতে চাই।'

'খুব ভাল', মিঃ পানওয়ালা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন', এ কথাই তো শুনতে চেয়েছিলাম আমি। শেখ, আরো শেখ, তাহলেই তুমি বড় হবে, তোমার অবস্থা বদলাবে। সবকিছু বদলে যায় বেটা, কিছুই একরকম থাকবে না। যখন আমাদের পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, সব প্রাণী এখানে সাঁতার কেটে বাস করত। জল সরে গিয়ে

যখন ভূমি দেখা দিল, জলের প্রাণীরা হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে শ্বাস নিয়ে বাঁচতে শিখল। লতা যখন গাছের মত বড় হয়ে গেল তখন তারা গাছে চড়তে শিখল। যখন খেয়ে বেঁচে থাকার মত লতাপাতা থাকল না, তারা শিকার করে খেতে শিখল। ভেবনা সব এখানে এসে থেমে গেল। তা হলনা বেটা, এখনও তারা বদলে যাচ্ছে — বদলাতে থাকবে। তুমি যদি বেঁচে থাকতে চাও, তোমাকেও বদলাতে হবে। চাকা ঘুরছে, শুধুই ঘুরছে — কখনও থেমে থাকছেনা একেবারে। দেখ বোম্বাইও আগের মত নেই। পঞ্চাশ বছর আগে এখানে পাহাড় ছিল, বাগান ছিল, সুন্দর প্রাসাদ ছিল, ভিলা ছিল। এখন সেখানে দেখছ বস্তি, দোকান, অসংখ্য যানবাহন, ভিড়। একসময় আমি বাগান, গোলাপফুল ও ফোয়ারা ঘেরা বাড়িতে বাস করতাম, এখন আমি রেলওয়ে স্টেশনের ওপর একটা পায়রার খোপে থাকি।' এতক্ষণ যা বললেন তা সব যেন ঠাট্টা, এমনভাব দেখিয়ে তিনি শব্দ করে হাসলেন। 'সুতরাং জেলে হরি চাষী হরিকে হতে হবে মুরগি পালক হরি কিংবা ঘড়িওয়ালা হরি।'

হরি মিঃ পানওয়ালাকে খুব উত্তেজিত ও প্রাণবন্ত দেখল। তিনি ভালমানুষ বলেই হয়তো শীগগীর দোকানে ফিরে এসে হরিকে আবার কাজ শেখাতে শুরু করবেন। হরি জানে তাকে আরো অনেককিছু শিখতে হবে।

'তুমি ভাগ্যবান', মিঃ পানওয়ালা চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে হেসে তাকালেন হরির দিকে। 'কেননা তোমার বয়স কম — তুমি বদলাতে পারবে, শিখতে পারবে, এগোতে পারবে। বুড়োমানুষেরা তা পারবে না, কিন্তু তুমি পারবে। আমি জানি তুমি পারবে।'

মিঃ পানওয়ালা যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই অবশেষে চাকা ঘুরল। অবস্থার উন্নতি হল, বৃষ্টি কমে এল। মিঃ পানওয়ালা আবার ফিরে এসে তার দোকান খুললেন। তাকে খুবই ফ্যাকাসে ও দুর্বল দেখালেও পুনরায় কাজে ফিরে আসার আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছিল। তার কাজ এত জমে গেছে যে হরিকে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়ের চেয়ে বেশি সময় দিতে হচ্ছিল।

জগু এজন্য কিছু মনে করত না। হরিকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার পর থেকে সে হরিকে দেখতে বা তার সঙ্গে কথা বলতে খুব পছন্দ করত তা মনে হত না। হরি তার বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রী ও পরিবারের সবাইকে দেখেছে এটার জন্য হয়ত সে দুঃখিত হয়েছিল। এ কারণে প্রায়ই সে হরির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকত। হরি ঘড়ির দোকানে বেশি সময় কাটানোর অনুমতি চাইলে সে কথা না বলে শুধু মাথা নেড়েছিল।

হরি পাহাড়ের দিকে মিঃ ডি সিলভাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে গেল না আর। সে অনুভব করেছে, ওখানে গিয়ে কাজ চাওয়ার মত লজ্জা ও অপমানজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারবে না সে। এখন আর সে ভীত ও বিভ্রান্ত বালকটি নয় যে আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্যে গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি দেবে। সে জানে এখন সে পছন্দ

করে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। ধনীলোকের বাড়িতে চাকরের কাজ করে বাঁচার ইচ্ছে এখন আদৌ নেই তার। তার কারণ হল ওখানে সে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করবে মাত্র — গ্লাস ও চিনামাটির বাসন ভাঙবে, ঝকঝকে বাড়িঘরে নোংরা হাত ও পায়ের ছাপ ফেলবে, লিফট, দরজার বেল, টেলিফোন ও গাড়ি বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে ফেলবে। শহরের ছেলে সে নয়, শহরের ছেলে হতেও চায় না সে। যেদিন থেকে সে রেডিওতে মাছধরা নৌকো সমুদ্রে হারানোর খবর শুনেছে, সেদিন থেকে সে মানসিক ক্লেশের মধ্যে থেকেছে যেন নৌকোগুলো তার, নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে যেন তারই পিতা ও ভাইয়েরা। সেদিন থেকে সে জেনেছে থালের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ আছে, তাকে ফিরে যেতে হবে। তুমি জীবনে যা চাও তা পছন্দ করে নেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করার মধ্যে চরম আনন্দ মেলে, হরিও এই সামর্থ্য অর্জন করবে।

'বর্ষা শেষ হলে আমি বাড়ি যাব' হরি একদিন জগুকে বলল।

'আমি আগে থেকে বলে রাখছি, যাতে আমার জায়গায় তুমি ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে নিতে পার।'

জগু মাথা নেড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল। 'কবে?' সে বিড়বিড় করে জিগ্যেস করে।

'নারকেল উৎসবরে পর', হরি বলল।

'দেওয়ালি পর্যন্ত থাক', নোংরা টেবিলটার দিকে চেয়ে জগু বলল। 'তখন দেশ থেকে আমার ভাই আসবে আমাকে সাহায্য করতে। ততদিন পর্যন্ত থাক।'

হরির ইচ্ছে ছিলনা, সে অতদিন পর্যন্ত থাকার কথা ভাবেনি। কিন্তু জগুর প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। জগু ওর সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করেছে — খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছে, ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে এবং সফল না হলেও সে হরিকে তার পরিবারেরই একজন করতে চেয়েছিল। সে তাই প্রস্তাবে সায় দিল। টেবিল থেকে নোংরা থালাগুলো নিঃশব্দে তুলে নিয়ে সেগুলোকে ধুতে নিয়ে গেল।

'জগু আমাকে দেওয়ালির আগে ছাড়বে না।' খুব মন খারাপ করে হরি বলল মিঃ পানওয়ালাকে।

'ছাড়বে না?' মিঃ পানওয়ালা বললেন, 'ওহ্, তাতে এত মন খারাপ করার কি আছে? দেখতে দেখতে দেওয়ালি এসে যাবে। আকাশে তাকিয়ে দেখ — মেঘ গড়িয়ে যাচ্ছে। নারকেল উৎসব শীগগীর হবে, তারপরেই দেওয়ালি। অনেক উৎসব, একটার পর একটা। আমার মনে হয় এটাই ভাল — দেওয়ালিতে তুমি যাবে। ততদিন পর্যন্ত কাজ শেখ — আমার অনেক কিছু শেখাবার বাকি আছে। গতকাল ঘড়িটা খুব ভাল সারিয়েছ। ঘড়ির মালিক নিতে এলে টাকাটা আমি তোমাকেই দিতে বলব। তবে আরো অনেক শেখার আছে। এটা দেখ, জাপানের ঘড়ি। ইলেকট্রনিক — দেখ, এই বুড়ো বয়সেও আমাকে নতুন জাতের ঘড়ির কাজ

শিখতে হচ্ছে। তুমিও শিখতে পার। বসো। হাত দুটো মুছে নাও। আমি এখন ঘড়িটা খুলছি, দেখ —' তারপর দুজনেই ঘড়িটার রহস্যময় অন্দরমহলে চোখ রাখল, দেখতে লাগল, কিভাবে এর ছোট ছোট যন্ত্রাংশ নিখুঁতভাবে কাজ করছে।

কাজ করতে করতে হরি বলল, 'পানওয়ালা সাব, আপনি নারকেল উৎসব ও দেওয়ালি পালন করেন কিন্তু আপনি তো হিন্দু নন। আমি ভেবেছিলাম পার্সি বলে আপনি শুধু পার্সিদের উৎসব পালন করেন।'

'ওহ্, না, না বেটা, মিঃ পানওয়ালা মজা করে বললেন, 'এতে মজা কই? হিন্দু মুসলমান সবার উৎসবের মজাটা বাদ দেব কেন? না, না, সবার সঙ্গে সবকিছুই উপভোগ করে যেতে চাই। এটাই তো মজা। দেখ, আমার কোন দুঃখ নেই!'

ওরা তখনও জাপানী ঘড়িটা মেরামতির কাজ করছিল। সেই সময় রোলেক্স ঘড়ির মালিক হাজির হল। এই ঘড়িটা হরি সারিয়েছে। মিঃ পানওয়ালাও কথামত টাকাটা হরিকে দিতে বললেন। লোকটি একটা দশ টাকার নোট হরির হাতে দিল। হরি টাকাটার দিকে চেয়ে থাকল — তার মনে হল সে আর ছোট নেই, সে বড় হয়ে গেছে। তাই মিঃ পানওয়ালা যখন জোরে বললেন, 'কি, খুশি হওনি বুঝি? হাসছো না কেন?' হরি হাসতে পারলনা। মাথা নেড়ে টাকাটা খুব সাবধানে পকেটে রেখে দিল।

'বাড়ি যাওয়ার আগে আমি বোনেদের জন্য উপহার কিনব', সে বলল, 'ঘড়ি সারানোর সব টাকা আমি সেজন্য জমিয়ে রাখব।'

অবশেষে নারকেল উৎসব এল। বৃষ্টি তখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বর্ষার মত দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে না, তবে কখনও কখনও ঝির ঝির বৃষ্টি হয়। কালো মেঘ এখন আকাশ ছেয়ে থাকেনা। টুকরো মেঘ শুধু আকাশে রোদ ও হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। সমুদ্র অনেক শান্ত, ঢেউগুলো এসে বাঁধানো রাস্তার উপর আছড়ে পড়েনা, ক্লান্ত ও ঝড়বিধ্বস্ত হয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। শহরের বাড়িঘরগুলো এখনও ভিজে ভিজে হয়ে আছে। কিন্তু কয়েক ফুট জলের ওপর দাঁড়াতে হচ্ছে না আর। ক্রমশ সব শুকনো হয়ে উঠছে।

নারকেল উৎসবের দিনে সকালে ঝিরঝির বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেসময়ে লোকজন সব বাড়ির ভিতরে — তারা বোম্বাইয়ের পৃষ্ঠপোষক দেবতা হস্তীমুখ গণেশের সামনে ধূপকাঠি, গাঁদাফুলের মালা ও মিষ্টির থালা রেখে পুজো করছিল। বিকেলে লোকজন সব রাস্তায় বেরোল সমুদ্রে নারকেল ছোঁড়ার জন্যে। আকাশে সূর্য তখন বিধ্বস্ত ও অপরিষ্কার শহরকে সোনালী ছটায় ঢেকে দিচ্ছে।

হাজার হাজার লোকজনের সঙ্গে হরি ও মিঃ পানওয়ালাও সমুদ্রের ধারে চৌপাটিতে এসেছেন। এই জায়গাটাকে হরি বোম্বাই শহরে প্রথমদিন এসে ভেবেছিল মেলার মাঠ। আজ পুরো জায়গাটা মেলার চেহারা নিয়েছে। রাস্তায় পুলিশ নেমে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে, মানুষের মিছিলকে পথ করে দিচ্ছে মেরিন ড্রাইভ পেরিয়ে

বীচের দিকে আসতে। দেখে হরির আবার প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ল। বালির প্রতিটি ইঞ্চি ভরে গেছে — সাধারণত যা ফেরিওয়ালা ও স্টলওয়ালা থাকে, তার চেয়ে এখন তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। গরম নোনতা স্ন্যাকস, আইসক্রীম, রঙীন পানীয়, বেলুন, টিনের বাঁশি ও কাগজের শিং তারা ছোটদের কাছে বিক্রি করছে। আর বিক্রি হচ্ছে ডাব। সমুদ্রে অঞ্জলি দেওয়ার জন্যে প্রত্যেকেই ডাব কিনছে। বর্ষার সমাপ্তিতে সমুদ্রকে এই অঞ্জলি প্রদান করা হয়। রোগভোগের পর মিঃ পানওয়ালাকে খুবই ফ্যাকাসে ও কুঁজো দেখালেও পুনরায় তিনি হাসিখুসি ও অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন। হরিকে তিনি একটা ডাব কিনে দিলেন। 'তোমার টাকায় তুমি বাড়ির জন্যে উপহার কিনবে, রেখে দাও', হরি দাম দিতে গেলে তিনি বললেন। তারপর দুজনে সমুদ্রের তীরের দিকে এগিয়ে গেল। কেউ কেউ কাঁধের ওপর থেকে ফিতে দিয়ে ঢাক ঝুলিয়ে বাজাচ্ছিল, তাদের আগে ও পিছনে অনেকেই নাচতে নাচতে আসছিল। নাচতে নাচতে কেউ কেউ গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ছিল আর মুখে নানারকমের আনন্দব্যঞ্জক শব্দ করছিল। স্ত্রীলোকেরা তাদের সবচেয়ে ভাল শাড়ি পরে এসেছে, নানা রঙের শাড়ি — গোলাপী, হলুদ, বেগুনী ও কমলা রঙের, আর প্রত্যেকের খোঁপায় ফুল আছে। তাদের কেউ কেউ ওপর দিকে আবীর ছুঁড়ে দিচ্ছিল, সেসব এসে পড়ছিল তাদের মাথায় ও কাঁধে আর বিকেলের রোদে চকচক করছিল।

জোয়ারের জল অনেক অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর তারা প্রশস্ত ভিজে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভিজে বালি চকচক করছে, তার ওপরে রোদ্রৌজ্জ্বল আকাশে ভাসমান গোলাপী মেঘের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা খালি পায়ে জল পর্যন্ত ছুটে যাচ্ছে। জেলেরা তাদের নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছে, যারা নৌকো করে কিছুটা গিয়ে গভীর জলের মধ্যে ডাব বিসর্জন দিতে চায় তাদের জন্যে। অন্যরা জলে নেমে এগিয়ে গিয়ে ডাব জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। হাজার হাজার ডাব জলে ভাসছিল, ডুবছিল, ওঠানামা করছিল। আর শতশত অনাথ শিশু ঢেউয়ের ওপর ঝাঁপাচ্ছিল ও ডাব ধরার জন্যে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ হরি তার দুপাশের দুজন ছেলেকে সরিয়ে সামনের একজন লম্বা লোককে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করল, 'এটা আমার এটা আমার।' তারপরই ঝাঁপ দিয়েছে জলের মধ্যে অন্যের ভাসানো একটা ডাব ধরার জন্যে। সেটিকে ধরতে ইতিমধ্যেই তিন চারজন ছেলে নেমে পড়েছিল। হরি তখন কোমর অবধি জলে, ঢেউয়ের ফেনা ছড়িয়ে পড়েছে তার চারপাশে। ডাবটিকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে সে মিঃ পানওয়ালার দিকে বিজয়ীর মত হাসল।

খুব বিস্মিত হয়ে মিঃ পানওয়ালা হাসলেন। হরি উঠে এলে তিনি বললেন, 'তুমি তাহলে পুরোপুরি একজন শহুরে ছেলে হয়ে গেছ, তাই না? শহরের

ছেলেদের ধাক্কা দিয়ে লড়াই করে তুমি এগিয়ে যেতে শিখেছ, তাই তো? হরি, হরি — আমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি এমন করবে।'

হরি লজ্জা পেতে শুরু করল। চারপাশে তাকিয়ে একজন ভিখারিকে খোঁজার চেষ্টা করল, যাকে সে ডাবটা দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মিঃ পানওয়ালা দুঃখ পাননি, তিনি হাসছিলেন।

'হ্যাঁ, এখন তুমি সব নিজেই সামলাতে পারবে', খুশিমনেই তিনি বললেন, 'সব তুমি ঠিকমতই সামলে নেবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাকে আর তোমার জন্যে চিন্তা করতে হবে না।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেষ পর্যন্ত হরি ফিরল, অবশ্য ফেরিতে নয়, বাসে চেপে। জগু ও মিঃ পানওয়ালা দুজনে মিলে ওর বাস ভাড়ার ব্যবস্থা করেছে। মিঃ পানওয়ালা তার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়েছে, সে সময় তিনি বিদায় উপহার হিসেবে একটা দশ টাকার নোট হরির হাতে দিয়ে নিজে চোখের জল আটকাবার চেষ্টা করেছেন। এদিকে জগু সকালের কাজ ছেড়ে বাস ডিপো পর্যন্ত হরির সঙ্গে এসেছে এবং ঠিক বাসে বসিয়ে দিয়েছে। 'টাকা সব যত্ন করে রেখেছ তো হরি?' বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই সে জিগ্যেস করেছে। 'পকেটমারদের থেকে সাবধানে থাকবে। পকেটে হাত দেবে না তাহলে কেউ বুঝতে পারবে না তোমার পকেটে টাকা আছে। হরির মত জগুরও চিন্তা ছিল কিভাবে থালের বাড়িতে টাকাগুলো নিয়ে হরি নিরাপদে পৌঁছবে। তাই বারবার সে হরিকে সাবধান করে দিচ্ছিল। হরিকে কথা দিতে হয়েছে যে সে থালে ফিরেই একটা পোষ্টকার্ড ছাড়বে এবং জগুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। বাসটা যখন ছেড়েছে, দুজনেই নিঃশব্দে হাত নেড়েছে।

শহরটা ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় হরি দেখছিল বস্তি, রংওঠা বাড়িঘর, খোলা নর্দমা, রাস্তার ধারের বাজার, বাস-ডিপো ও যানবাহন। জানলায় সারাক্ষণ চোখ রেখে সে অপেক্ষা করছিল কখন শহরের বাইরে উন্মুক্ত গ্রামাঞ্চল দেখতে পাবে। তারা একটা লম্বা প্রশস্ত সাঁকো পেরিয়েছিল, যার নীচে ছিল সমুদ্র। যে সমুদ্র সে থালে দেখেছে তা নয়, এ সমুদ্র বোম্বাইকে অন্য জায়গা থেকে আলাদা করেছে — একটা জলাভূমির মত, জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে বেড়েছে কমেছে। তবু এখান থেকে বালির সঙ্গে কাদার গন্ধ পাওয়া যায়, জলের কিনারায় কেবল নলখাগড়ার ঝোপই নেই, মাছ ধরার নৌকো আছে, জাল আছে, আর আছে অনেক চকচকে ঝিনুক। হরি উত্তেজনায় কাঁপল। কিন্তু তারপর আবার শুরু হয়েছে ক্লান্তিকর একটা এলাকা — থানা-র কারখানা অঞ্চল। দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া ও কেমিক্যাল বিবর্ণ আকাশে মিশে যাচ্ছে। সারা এলাকাতে কোথাও কোন গাছপালা নেই, এমনকি একটা ঘাস পর্যন্ত

কোথাও দেখা যায় না। রেওয়াস থেকে আলিবাগ পর্যন্ত সবুজ উপকূল জুড়ে কারখানা গড়ে উঠলে এমনি দেখাবে হয়ত, হরি ভাবল।

পরিবর্তন যে শুরু হয়েছে, তার কিছু ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। হাইওয়ে চওড়া করা হচ্ছে, একটা রেলওয়ে ব্রীজ তৈরি হচ্ছে। বড় বড় গাছ কাটা হয়েছে, বুলডোজার দিয়ে জায়গা সমান করা হচ্ছে। তবে মাঠের ধান এখনও দাঁড়িয়ে আছে পেকে সোনালী হয়ে, মাঠ পেরিয়ে যে ছোট ছোট পাহাড়গুলো আছে সেগুলোকে বেগুনী ও ব্রোঞ্জের মত দেখাচ্ছে এবং আকাশ এখনও পরিচ্ছন্ন ও নীল। ওরা একটা অপ্রশস্ত স্রোতহীন নদী পেরোল, নদীটা ঘুরে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। বাসটা তারপর বড়বড় পাতাওয়ালা শালগাছের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অবশেষে উপকূলের কাছে পৌঁছয়। নারকেল গাছের সারি দেখতে পাচ্ছিল হরি এবং দূরে ঝাপসা নীল হয়ে দেখা যাচ্ছিল সমুদ্র।

মন্দির আছে যে পাহাড়টার ওপরে, তার নীচে হাইওয়েতে বাস থেকে নামল হরি। পুরনো ধুলিধূসর রাস্তাটা চওড়া করা হচ্ছিল পীচ ঢেলে এবং দুপাশের অনেক শাল ও কলাগাছ তারজন্যে কাটা পড়েছিল, থাল গ্রামটি কিন্তু অপরিবর্তিত থেকেছে। হরি বড় রাস্তা ছেড়ে মাটির পথ ধরল। গরুর গাড়ির চাকার দাগ পথ জুড়ে। নারকেল গাছ ও পানের বরোজের মাঝখান দিয়ে পথটা চলে গেছে নিস্তব্ধ গ্রামটির দিকে।

হরি পথ ধরে এগিয়ে নারকেল গাছের সারির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর সে সমুদ্রতীরের ঝাউ গাছগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছল। এখানকার সতেজ বাতাসে সে লবণের গন্ধ পেল, সমুদ্র তার সামনেই। সত্যিকার সমুদ্র, বিশাল ও উন্মুক্ত — বোম্বাই শহরকে ঘিরে রাখা সমুদ্রের মত এটা নয়। হরি গাছের নীচে বসে চিবুকে হাত রেখে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। সে নিশ্চিত হতে চাইছিল এই সমুদ্রই রয়েছে তার মনের ভিতরে যাকে সে চেনে। এবার নিশ্চিত হল সে। জোয়ার আসছিল, তার গম্ভীর শব্দ রুপালি বালির ওপর আছড়ে পড়ছিল যেন। পাথরের স্তূপ তিনটে জলে ডুবে গেল। শুধু তাদের চূড়াগুলো ফেনিল ঢেউয়ের মধ্যে উঁকি মারছিল। দূর চক্রবালে মাছধরার অসংখ্য নৌকোর পালগুলোকে আকাশের গায়ে শঙ্খচিল বা প্রজাপতির ডানার মত দেখাচ্ছিল। তীরের কাছে উন্ধেরি ও কুন্ধেরি নামের দ্বীপ দুটো দেখা যাচ্ছিল। ছোট ছোট মাছধরার ডিঙি দ্বীপের পাশ দিয়ে ফিরে আসছিল তীরের দিকে, গ্রামের দিকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হরি উঠে দাঁড়াল। বালিয়াড়ি পেড়িয়ে বাড়ির পথ ধরল সে। নিজেদের ছোট জমিটা পেরিয়ে আসার সময় দেখল, জমিতে বাঁশের মাচা করে টিন্ডলি গাছ লাগিয়েছে তার বোনেরা, আঙুর গাছের মত লতানো গাছ থেকে টিন্ডলি ঝুলছে। তারপর সে 'মন রিপোজ' বাংলো বাড়িটার কাছে এল। সাদা বাড়িটা চারপাশের সবুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। খালপারে এসে দেখল, জলের

মধ্যে পাথরটার ওপর বকটা একইভাবে বসে আছে, আর মাছরাঙাটা নীল রঙের ঝলক দিয়েই জলে ডুব মারল। খালটা পেরিয়ে বাড়ির দিকে চোখ রাখল সে — বরাবরের মতই ছায়াছন্ন ও বিষন্নতায় ভরা, মাটির দেয়াল খসে পড়েছে ও পাতার ছাওয়া ছাদ দেয়ালের ধারে ঝুলছে।

হরি সব বদলে দেবে। সে নতুন করে কুটিরটি বানাবে। সে বাড়ি ফিরে এসেছে। এখন সে এদিকে নজর দেবে — তাদের বাড়িকে সে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।

'লীলা, বেলা, কমল!' সে ডাকল।

মুহূর্তের মধ্যে লীলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তার পরনে বেগুনী রঙের সেই পুরনো শাড়িটা। তার চোখেমুখে কৌতূহলের ছাপ। হরিকে দেখতে পেয়েই সে আবেগাপ্লুত হল। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়েছিল। লীলা এবার চিৎকার করে ছুটে এল 'হরি, হরি, আমি জানতাম তুই আসবি। আগামীকাল দেওয়ালি, আমি জানতাম তুই আসবি।'

'কী করে জানলি? আমি তো লিখিনি।'

'সে আমি ঠিক জানতাম', লীলা হাসল, 'আমরা তোর জন্যে মিষ্টি বানিয়ে রেখেছি। আয়, খাওয়াব।'

একসঙ্গে একশোটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল হরির। মা, বাবা, বেলা ও কমলের কথা সে জানতে চায়, জানতে চায় গ্রামের কথা, বিজুর নৌকোর কথা, আরও কত কি সব জিজ্ঞাসা তার মনে। পরিবর্তে সে লীলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল। পুরনো ও জীর্ণ হলেও কত ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক তাদের ঘর। সে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিল। কেবল শোনা যাচ্ছিল পায়রার বকবকম — বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল গানের মত কোমল তাদের ডানার ঝাপটানি।

লীলা একটা পিতলের থালা হাতের তালুতে ধরে সামনে এগিয়ে এল। থালায় বাড়িতে তৈরি অনেকগুলো পিঠে রাখা আছে। পিঠেগুলো তারা বাড়িতে চালের গুড়ো, ঘি, চিনি, আটা ও নারকেল দিয়ে বানিয়েছে।

হরি বলল, 'আমি আগে হাত-মুখ ধোব। খুবই ময়লা হয়ে আছে।' পিছনের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে মাটির বড় পাত্রে যেখানে জল রাখা আছে ভর্তি করে, সেখানে গেল। হাত মুখ ধুয়ে নিল ভাল করে, তারপর কিছুটা ঠাণ্ডা হল সে। মাথাতেও জল ছিটিয়ে নিল। তার মনে হল, গত ন'মাস বোম্বাইয়ে থাকার সময় সে এত শীতল ও আরাম বোধ করেনি।

পিছনে ফিরে দেখল, লীলা হাতে একটা গামছা নিয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সে এসে গামছাটা নিয়ে গা হাত পা মুছল।

'এখানকার জলটা কি যে ভাল লাগল।' সে বলল।

'আমাদের এখানকার কুয়োর জলটা বরাবরই তো মিষ্টি, তুই জানিস।' লীলা হেসে বলল।

'এত মিষ্টি, আমার মনেই ছিল না', সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। 'আমি সব ভুলেই গেছিলাম, মা কোথায়?' লীলার মুখের দিকে তাকাতে তার সাহস হচ্ছিল না পাছে ওই মুখে কোন দুঃসংবাদের চিহ্ন ফুটে ওঠে। লীলা কিন্তু সোজাসুজি ওর দিকে তাকাল।

'মা আলিবাগের হাসপাতলে। ডি সিলভারা ওদের গাড়িতে করে নিয়ে গেছিল। বাস ভাড়া থাকলে আমি মাঝেমাঝে মাকে দেখতে যাই। এখন বেশ ভালই আছে।'

'কী করে?'

'মনে হয়, ভাল খাবারদাবার আর ওষুধে কাজ হয়েছে। ডাক্তার বলছিল, তেমন খাবার না খেতে পেয়ে মা রক্তাল্পতায় ভুগছিল।'

হরি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল। তারা যে খাবার খেত তা পর্য্যাপ্ত ছিল না, এটা সে জানত। কিন্তু সেই কারণে কেউ অসুখে পড়ে এটা সে জানত না। যাতে তারা এখন থেকে ভালকরে খেতে পায় তার ব্যবস্থা তাকে করতে হবে।

'আমার অনেক রকম প্ল্যান আছে, লীলা', সে এবার বলল, 'আমি সব বলব তোকে।'

'আয়, আগে মিষ্টি খেয়ে নে। এগুলো দেওয়ালির জন্য করেছিলাম, কিন্তু আজ থেকেই দেওয়ালি মানানো যাক।' লীলা হেসে মিষ্টির থালা আনতে গেল।

বেলা ও কমল যখন হাজির হল, হরির মুখের মধ্যে তখনও মিষ্টি পোরা আছে। ওরা বুঝতে পারছিলনা তাদের কী করা উচিত। হরিকে এতদিন পর দেখে তারা জড়িয়ে ধরবে না কথা বলবে, কিংবা ওর সঙ্গে বসে মিষ্টি খাবে, কিছুই ঠিক করতে না পেরে একসঙ্গে সবকিছু করতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলল। মিঃ পানওয়ালার সাহায্য নিয়ে হরি যে উপহারগুলো কিনেছিল, এখন সেগুলো বের করল। ছোট বোনদের জন্যে হাতের বালা এনেছে। ধাতুর ওপর সোনা ও রুপোর রং করা বালাগুলো। আর লীলার জন্যে এনেছে একটা শাড়ি। মোটা কাপড়ের তাঁতে বোনা কাপড় যা গ্রামে কিনতে পাওয়া যায় এটা তা নয়। শাড়িটা মিলের তৈরি খুবই হালকা, রেশমের মত নরম, তাতে গোলাপী ও সাদা রঙের সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের সঙ্গে দাগ আঁকা। তিন বোনই এই শাড়িটা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল — এত সুন্দর! দামী ও হাল ফ্যাশনের শাড়ি কোনদিন তাদের বাড়িতে আগে ঢোকেনি। লীলা উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল আর ছোট বোনেরা মুখের ওপর হাত চাপা দিয়েছিল অবাক হয়ে।

'হরিদা, এত টাকা তুমি কোত্থেকে পেলে? এতটাকা খরচই বা করলে কী করে?'

'আমি টাকা নিয়েও এসেছি।' সে ওদের আশ্বস্ত করে। 'বোম্বাইয়ে যা রোজগার

করেছি সবটাই জমিয়েছি। ওখানে কোন খরচ আমি করিনি। কখনও সিনেমা দেখতে যাইনি, একটা সিগারেট পর্যন্ত কিনিনি। আমার দুটো চাকরি ছিল।' হরি গর্ব না করে পারল না, সে জানে বোনেরা এটা খুবই উপভোগ করেছে।' আমি একটা খাবার দোকানে কাজ করতাম, সেখানে মালিক আমাকে থাকতে ও খেতে দিত, সেই সঙ্গে মাইনেও দিত। আর আমি পাশেই একটা ঘড়িওয়ালার দোকানেও কাজ করেছি, সেখানে ঘড়ি সারিয়ে টাকা পেয়েছি। আমি ঘড়ি সারানোর কাজ শিখেছি, জানিস।'

'ঘড়ি সারানো?' বেলা ও কমল অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'ঘড়ি সারানো?' লীলাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, তার মুখেও বিস্ময়। মাছধরা লোকের গ্রাম থালে কেউ এমন কাজ শিখে এসেছে, তাদের কাছে এটার কোন অর্থ ছিল না। কেননা নৌকো কখন নিয়ে যেতে হবে আর কখন ফিরিয়ে আনতে হবে তা জানার জন্যে ঘড়ি দেখার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেনি, জোয়ার ও সূর্য তাদের এসব জানিয়ে দেয়।

হরি বুঝতে পারল, লীলা আশাহত হয়েছে। তাই সে বলল, 'আমি জানি গ্রামে এখন কোন ঘড়ি নেই, কিন্তু অপেক্ষা কর কিছুদিন, কারখানাগুলো তৈরি হোক, হাউজিং কলোনি তৈরি হোক, তখন দেখবি প্রচুর লোক হাতে ঘড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থাল গ্রামে আমিই তখন একমাত্র লোক যে ঘড়িতে অয়েলিং করতে পারবে ও মেরামত করতে পারবে। এসব করানোর জন্যে কাউকে কষ্ট করে বোম্বাই যেতে হবে না। এখানেও সব বদলে যাবে, লীলা।'

'সব বদলে যাবে?' লীলা অবিশ্বাসের সুরে জিগ্যেস করে, 'কখন? কতদিন লাগবে? আর ততদিন পর্যন্ত আমরা কী করব?'

'আমি সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে এসেছি। কী করা যায় তা দিয়ে সে সম্পর্কে তোর সঙ্গে পরামর্শ করব। মার সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বলব, যখন হাসপাতালে দেখতে যাব।' হরি বাবার কথা তুলল না। সে জানে বাবা কোন কাজেই আসবে না। 'টাকাটা আমরা কাজে লাগাতে পারি। আমি ভাবছিলাম মুরগি কিনে পোলট্রি ফার্ম করব আমাদের জমিতে। আমরা গ্রামে ডিম বিক্রি করা দিয়ে শুরু করতে পারি। তার মধ্যে কারখানা তৈরি হয়ে যাবে, ওয়ার্কাররা এখানে থাকতে শুরু করবে। তখন আমরা মুরগিও বিক্রি করব। পোলট্রি ফার্ম দিয়ে আমাদের সংসার চলে যাবে।'

বেলা ও কমল আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তাদের ধারণা হল এটা একটা দারুণ ব্যাপার হবে। তারা মিষ্টির থালাটা আর একবার ঘুরিয়ে সবাইকে মিষ্টি এগিয়ে দিল।

'আমি যখন ঘড়ির দোকান খুলব, তোরা দুজনে তখন মুরগির দেখাশোনা করবি।' হরি ওদের বলল। 'আমি পোলট্রি ফার্ম খুলে দিয়ে তারপর তোদের হাতে চালাবার ভার দিয়ে দেব।' সে ওদের দিকে হেসে তাকায়। ওরা যে ব্যাপারটা পছন্দ করেছে, তা হরি বুঝতে পেরেছে।

'এটাই হবে থালের প্রথম পোলট্রি ফার্ম।' কমল চিৎকার করে বলল। 'কিহিমে একটা আছে, আর আলিবাগে বেশ কয়েকটা আছে। কিন্তু থালে একটাই হবে প্রথমে, সেটা হবে আমাদের।'

'আমাদের এখানে কিন্তু একটা হয়েছিল', লীলা ওদের মনে করিয়ে দিল। বুড়ো সাবু একটা তৈরি করেছিল। ওর বাগানে এখনও ভাঙা ঘরটা দেখা যায়। জালও আটকানো আছে গায়ে। ওটা চলেনি।'

'চলেনি এই জন্যে যে থালে ডিম ও মুরগি কেনার লোক ছিলনা', হরি ব্যাখ্যা করে, 'তারপর ওর ভ্যানগাড়ি ছিল না যাতে করে সে ওগুলো বোম্বাই নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখন লোকেরাই থালে আসবে — হাজার হাজার লোক আসবে। আমরা এত খদ্দের পাব যে সবাইকে দিতে পারব না। লীলা, তুই দেখবি এটা খুব চলবে। মার খাবার জন্যেও ডিম ও মুরগি থাকবে।' হরি এইসব বলে লীলার মনে আনন্দ জাগাতে প্রাণপন চেষ্টা করে।

লীলা এবার হাসল হরির কথায়। 'মার পক্ষে এটা ভালই হবে।' সে একমত হয়। 'মার শরীর ভাল হলে মাও সাহায্য করতে পারবে।'

'আমাকে সব খুলে বল এবার। সব খবর বল। তুই তো আমকে চিঠিও লিখিসনি!'

'তুই কোথায় আছিস আমরা জানব কী করে? যে-ই বোম্বাই গেছে আমরা তার হাতে খবর পাঠিয়েছি। কিন্তু কেউ তোকে খুঁজে পায়নি।'

হরি মাথা নাড়ে। 'আমি কিছুদিন আমার মত করে থাকতে চেয়েছিলাম। বাবা —', অবশেষে সে যে শব্দটি বলতে চায়নি তাই বলল — 'বাবা কোথায়?'

বোনেরা যেভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করে আনন্দ প্রকাশ করছিল তাতে স্পষ্ট হয়েছিল যে বাবা মাতাল হয়ে এসে ঘরে ঘুমিয়ে নেই।

'বাবা আলিবাগে আছে', লীলা ধীরভাবে জবাব দিল। 'ডি সিলভারা যখন মাকে নিয়ে গিয়েছিল, বাবা খুব রেগে গেছিল। আমার ওপর খুব চেঁচামেচি করে সব মাটির জিনিসপত্র ভেঙে ফেলল। খুবই মাতাল হয়ে ছিল — বুঝতেই পারছিস। কিন্তু তারপরই মদ খাওয়া ছেড়ে দিল। সেই থেকে ওখানেই থেকে গেছে, আর ফিরে আসেনি। আমি যখন মাকে দেখতে যাই, দেখি মার ঘরের সামনে বারান্দায় বসে আছে, না হয় হাসপাতালের মধ্যেই বেরিয়েছে। সেদিন বলছিল, মা দরকার হলে ডাকতে পারে এই জন্যে দূরে যায়না।'

'ওখানে মদ খাচ্ছে না?'

লীলা মাথা নাড়ে, 'আমার মনে হয় না। বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া মদ খাওয়ার টাকা পাবে কোথায়? ডি সিলভারা কিছু টাকা দিয়েছিল, আমি সামান্য কিছু দিয়েছি, তাতে খাবার জোগাড় হতে পারে, মদ জুটবে না। বেশি টাকাও চায়নি। আমার মনে হয় না আর মদ খেতে চাইবে।'

'আর ওই খানেকাররা — ওরা কি আর এসেছিল?'

'না, আমাদের আর বিরক্ত করেনি', লীলা স্বস্তির ভাব দেখাল। 'আমার ধারণা, পিন্টোর ব্যাপারটা ঘটার পর ওদের নিজেদেরই খারাপ লেগেছিল।

ওরা সবাই চুপচাপ বসে থাকল। পিন্টোর কথা, বাবার কথা মনে করল, আর তাদের জীবনে যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে ভাবল। লীলা তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হরি, চল বীচে যাই, তোর বাড়ি ফেরার উপলক্ষে রাতের

জন্যে মাছ কিনে আনি। চল, সবাই মিলে যাই। যেতে যেতে তোর আর সব কথা শুনব।'

কিন্তু সমুদ্রের ধারে পৌঁছে ওরা যখন দেখল গোটা আকাশটা সূর্যাস্তের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং ভিজে বালির ওপর গোলাপী ও বেগুনী আভা প্রতিফলিত হচ্ছে, হরি আনন্দে কথা বলতে পারলনা। সে ভিজে বালির ওপর ছুটে গিয়ে মনের আনন্দে খালি পা দিয়ে ভিজে বালির স্পর্শ অনুভব করল। বেলা ও কমলও ওর পিছন পিছন তাড়া করে ছুটেছে। হরি ওদের কাটিয়ে অন্যদিকে ছুট লাগিয়েছে। দেখে লীলা হাসতে শুরু করেছে। হরি তারপর মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে জোরে মুখ দিয়ে শব্দ করতেই তীর থেকে গাঙচিলেরা আকাশে উড়তে শুরু করেছে। হরির নিজেকে একজন নতুন মানুষের মত মনে হচ্ছিল — যে এতদিন একটা বন্ধ বাক্সের মধ্যে থেকে এখন আলোয় বেরিয়ে এসেছে, মুক্ত হাওয়ায় প্রথম শ্বাস নিচ্ছে। রেশমের গুটি থেকে মথ যেমন ভাবে বেরিয়ে আসে, সেও এক নতুন জীবন লাভ করেছে। বেলা এসে ওর একটা হাত ধরেছে, অন্য হাত ধরেছে কমল।

হাসতে হাসতে ওরা বেলাভূমি ধরে এগিয়ে গেল। জলের ওপর ছোঁ মেরে গাঙচিলের মাছ ধরা দেখল। লম্বা বানমাছের মত এই মাছগুলো গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বাঁশের জাফরির থেকে ঝুলিয়ে রোদে শুকায়। একটা গাঙচিল মাছ ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যেতেই অন্য একটা চিল কেড়ে নেওয়ার জন্য তাকে ধাওয়া করে, ফলে মাছটা নীচে পড়ে যেতেই সব চিলেরাই একসঙ্গে নীচে নেমে পড়ে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে ঠিক মুরগি ছানার মত কোঁচকোঁচ শব্দ করে।

'এবছর কি মাছ ভাল হয়েছে?' হরি জিগ্যেস করে।

'মরসুম তো সবে শুরু হয়েছে — মনে হয় ভালই হবে।' লীলা উত্তর দেয়।

তারপর নীচুস্বরে খুবই দ্বিধা নিয়ে ভয়ে ভয়ে হরি জিগ্যেস করল, 'ওরা কি ঝড়ে হারিয়ে যাওয়া নৌকোগুলোর খোঁজ পেয়েছিল?'

'তুমি খবর পেয়েছিলে নাকি?' বোনেরা অবাক হয়ে বলল। তারপর ওরা অনুসন্ধানকারী দলের কথা বলল। জানাল কীভাবে বিজুর নতুন শক্ত নৌকো আগে আগে গেছিল খুঁজতে এবং ভাঙাচোরা নৌকোগুলো সবই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, শুধু আলিবাগের তিনজন জেলেকে পাওয়া যায়নি।

'বিজুর নৌকো তাহলে কাজে লেগেছে', হরি স্বস্তি পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল। তার মনে হচ্ছিল যেন তাকেই সমুদ্রের ঝোড়ো আবহাওয়া থেকে টেনে তুলে আনা হয়েছে তীরে।

'নৌকোটা দারুণ!' বেলা ও কমল একসঙ্গে বলে উঠল। লীলা কিন্তু বলল, 'তাই বলে সবসময় তাই নিয়ে গর্ব করে বেড়ানোর মানে হয় না।'

'না, তবে এতগুলো মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওর কাছে সবার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।' হরি লীলাকে মনে করিয়ে দেয়। সে নিজেও কৃতজ্ঞ বোধ করে।

তারপর সে বোনেদের কাছে গল্প করল কীভাবে সে রেডিওতে ঝড়ের খবর শুনেছে এবং থালে ফিরে আসার জন্যে তার মন কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এর থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে সে থালেরই লোক এবং সবসময় এখানেই থাকবে। তা শুনে বোনেদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ফেরার সময় হওয়ায় মাছধরা নৌকোগুলো ফেরার চেষ্টা করছিল কিন্তু জোয়ারের জল নেমে যাওয়ায় বেশ ভিতরেই তাদের নোঙর করতে হল। জেলেদের স্ত্রীরা কোমরে শাড়ি গুঁজে নিয়ে জলে নেমে এগিয়ে গেল নৌকোর কাছে মাছের ঝুড়ি নিয়ে আসার জন্যে। চেঁচামেচি হৈ চৈ চলল ঝুড়িগুলো নিয়ে এসে বালির ওপর ঢাকনা খোলার সময়।

'গাঙচিলের চেয়েও বেশি চেঁচায় এরা', লীলা বলল।

'আমরা মাছ কিনব তো? আমার কাছে টাকা আছে।' হরি বেশ গর্ব করেই বলল।

'তা তো থাকবে, তুমি শহর থেকে বড়লোক হয়ে ফিরেছ', বোনেরা হাসতে হাসতে মজা করে দাদার পিছনে লাগল।

'অন্তত কটা দিনের জন্য বড়লোক', হরি বলল। 'দিদি আয়, বেছে নে। একটা পমফ্রেট কিংবা একটা সুরমাই বা কাঁকড়াও নিতে পারিস।'

লীলা কিন্তু একদিনের জন্যেও বড়লোক হওয়ার অভ্যাস নেই। সে দাঁড়িয়ে দেখল, সবাই দরদাম করছে ধাক্কাধাক্কি করে। গলদা চিংড়ি ও পমফ্রেটের ঝুড়িগুলো সব বিক্রি হয়ে গেলে সে কিছু কুচো চিংড়ি যাকে ওরা জাওলা বলে, কিনল। এগুলো দামে শস্তা। বেলা ও কমল মন খারাপ করল। কিন্তু হরি বলল, 'কতদিন জাওলা খাইনি।' লীলা কোন কথা না বলে মাছগুলোকে পুঁটুলি করে বেঁধে নিল।

বাড়ির দিকে যাওয়ার আগে ওরা হাঁটতে লাগল খাল বরাবর। এই খালটাই থাল গ্রামকে আলিবাগের সী বীচ থেকে আলাদা করেছে। ছোট-হাল্কা ডিঙিনৌকোগুলোকে খালের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এগুলোর পাল খুবই নীচু কিন্তু শাড়িকে লম্বা করে ছিঁড়ে পতাকা বানানো হয় বলে সেগুলো বাতাসে ওড়ে। তার পেছনে সোনালী আকাশের গায়ে বাদামী রঙের পাহাড়গুলোকে দেখাচ্ছে তামাটে, লালচে।

হরি ও তার বোনেরা খালের মুখ পর্যন্ত এগোল। এখানে সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় গাদাগাদি ঝিনুক বালির ওপর উঠে আসছিল। বেশিরভাগই জলের ঝাপটায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মুক্তোর মত চকচক করছিল। হরি ঝুঁকে এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার সমুদ্রে ছুড়ে দিচ্ছিল। খালের ওদিকটায় আলিবাগ বীচ। বীচে ঝাউয়ের জঙ্গল। জঙ্গল পেরিয়ে আলিবাগ টাউন। একটা দুর্গও আছে ওখানে — অনেকদিন আগে মুঘল আমলে জলপথে যুদ্ধ করার জন্যে আংগ্রেজরা তৈরি করেছিল।

আলিবাগের দিকে তাকিয়ে লীলা বলল, 'কাল দেওয়ালি, কাল আমরা মাকে বাড়ি নিয়ে আসব।'

'এখন বাড়িতে এসে থাকতে পারবে? একেবারে ভাল হয়ে গেছে?'

'এখন ভালই আছে। ডাক্তার বলেছে, দেওয়ালির সময় ছেড়ে দেবে।'

'তাহলে আমি গিয়ে নিয়ে আসব।'

'হ্যাঁ, সকালে যাস। আমরা ততক্ষণ দেওয়ালির জন্যে সবকিছু তৈরি রাখব।'

'এখন বাড়ি ফেরা যাক। খেতে হবে', বেলা হঠাৎ খিদে অনুভব করে বলে উঠল।

'দৌড়ে যা, আমি ধরব।' হরি বলতেই সবাই মিলে ছুট লাগাল।

আকাশের সব সূর্যালোক যেন গলানো কাঁচের মত সমুদ্রে মিশছিল।

হালকা হলদে রঙের মত ফ্যাকাশে হয়ে ছিল আকাশ। পূর্বদিকটা ইতিমধ্যেই ফিকে লাল হয়ে গেছে। একটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাচ্ছিল, ধ্রুব তারা।

ছুটতে ছুটতে থেমে গেল হরি। হাঁফাতে হাঁফাতে সে লীলার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

'বাড়ি পৌঁছে তুই কিন্তু আমাদের কাছে বোম্বাইয়ের গল্প করবি', লীলা বলল।

'তার আগে বাড়ির সব কথা বল', হরি বলে।

রাতের খাওয়া শেষ হলে তাই তারা লণ্ঠনটা নেভাল না, জ্বালিয়েই রাখল ঘরে। ওরা বাইরে গিয়ে বসল খোলা আকাশের নীচে — মাথার ওপর অসংখ্য তারা তখন নারকেলবাগান ও জলাভূমির স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য জোনাকি আলো জ্বেলে ঘুরছিল। ওরা কথা বলতে থাকল — গত কয়েক মাসে যা যা ঘটে গেছে সব কথা।

শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয় ও ডিং ডং ওয়াচ ওয়ার্কস, মিঃ পানওয়ালা ও জগু, পার্ক ও নারকেল উৎসব — সব গল্প করল হরি। এবার লীলার পালা, সে হরির অনুপস্থিতিতে যা যা ঘটেছে সব জানাল।

'সবসময় আমরা তোর জন্যে অপেক্ষা করেছি। আমি ভেবেছিলাম তুই দেওয়ালিতে আসবি', লীলা তার কথা শেষ করল।

'আর সত্যিই তুমি এসেছ', কমল হরির হতটা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল। তার হাতের নতুন চুড়িগুলো বেজে উঠল।

'নিশ্চয়', হরি ওর হাত ধরে রেখে বলল। 'আর আগামীকালই দেওয়ালি। আমি আলিবাগে যাচ্ছি মাকে দেখতে।'

'মাকে নিয়ে আসবে না?' বেলার কণ্ঠে কাকুতি।

'আনব বইকি', হরি কথা দেয়। সে বেলার দিকে তাকায় তারপর অন্য বোনেদের দিকে। 'তোরা সবাই দারুণ। এই ক'মাস যেভাবে তোরা চালিয়েছিস, তাতে বোঝা যায় তোরা সত্যিই অসাধারণ।'

লীলা না হেসে পারল না, তবে হাসিটা গর্বের। 'আমরা চালিয়েছি', বলে এবার সে অস্বস্তি বোধ থেকে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'না, একা আমাদের পক্ষে চালানো সম্ভব ছিল না। ডি সিলভারা মাকে খুব সাহায্য করেছেন, ওরা চলে গেলে বাংলোতে সৈয়দ আলি সাহেব এসেছেন। এঁরা সবাই না থাকলে আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হত না।'

'সৈয়দ আলি সাহেব?' হরির নামটা শোনা শোনা লাগল। কিন্তু সে মনে করতে পারল না কোথায় ওই নামটা শুনেছে। বোম্বাইয়ে শুনেছে, নাকি বোনেদের কাছেই আগে শুনেছে? বাংলোয় আসা ব্যাক্তিটির সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হল হরি। সে বলল, 'আলিবাগ থেকে ফিরে আমি ওঁর কাছে যাব কৃতজ্ঞতা জানাতে।'

'না, না', বেলা জোরে বলে উঠল। 'আমরাই তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওঁরও দেখাশুনো করেছি।'

'তা তো করেইছো', হরি ওর কথা মেনে নেয়। হেসে বলে, 'তুই সত্যিই অসাধারণ, তোরা সবাই!'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দেওয়ালির দিন সকালে বোনেদের ওপর সব কাজের ভার দিয়ে হরি আলিবাগের বাস ধরতে গ্রামের রাস্তা দিয়ে এগোল। সে ওখান থেকে কিছু কিনে আনবে কিনা জিগ্যেস করেছিল লীলাকে। লীলা উত্তর দিয়েছিল, 'যা দরকার সবই আছে।' কিন্তু নারকেল গাছের মধ্যকার রাস্তা দিয়ে এগোনোর সময় বেলা পেছনে ছুটে এল। সে হরির কনুই ধরে ফিসফিস করে বলল, 'হরিদা, দেওয়ালির সময় আলিবাগে যে চিনির খেলনা বিক্রি হয় তা কিনে আনবে? তুমি তো জান, ওই যে চিনির ঘোড়া ও হাতি পাওয়া যায়? আমার কাছে টাকা আছে, সৈয়দ সাহেব দিয়েছিলেন, আমি যখন ওকে জল থেকে টেনে তুলেছিলাম।'

'ওই টাকা যখন তুই পেয়েছিস, রেখে দে, হরি হাসল।' আমি আমার টাকা দিয়েই তোদের জন্যে চিনির খেলনা কিনে আনব, গর্বের সঙ্গে বলে সোজা হাঁটতে থাকল।

বর্ষা শেষ হলে যেমন সুন্দর সোনালী সকালের দেখা মেলে এই দিনটা তেমনই। ভিজেভিজে আবহাওয়া আর নেই, সব শুকিয়ে আসছে। শীত আসবে শীগগীর — এখনই ঘাসের ওপর শিশির পড়ে আছে এবং বাতাসে সতেজ ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওর জমিটা পেরোতে গিয়ে হরি এক কোণে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে ভাবল কিভাবে সে এখানে মুরগির খামার তৈরি করবে। মুরগি সম্পর্কে কিছু না জানলেও সে ঠিক শিখে নেবে, নিশ্চয় কোন অসুবিধে হবে না। অল্প কয়েকটা মুরগি কিনে সে খামারটা শুরু করবে। তারপর যেমন যেমন শিখবে, তেমনি তেমনি খামারের আকার বাড়াবে। যতদিন না কারখানা তৈরি হচ্ছে ততদিন তাদের এভাবেই চলে যাবে। তারপর কারখানা ও হাউসিং কলোনি তৈরি হলে সে গ্রামে ঘড়ি মেরামতের কাজ শুরু করবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে তার মন আশা ও আনন্দে ভরে উঠল। গ্রামের রাস্তার দিকে মোড় নিয়ে সে নারকেলগাছের সারি ও পানের বরোজের মধ্যে দিন এগিয়ে

চলল। তার ভাল লাগল দেখে যে পুরনো বাড়িগুলো একই রকম আছে — বৃদ্ধ লোকেরা তাদের বাড়ির বারান্দায় বসে আছে। আর স্ত্রীলোকেরা টালির ওপর দেওয়ালির আলপনা আঁকছে ও দরজায় কাগজের লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিচ্ছে। মুরগি চরছে এদিক ওদিক আর ছায়া খুঁজে নিয়ে বিড়াল সেখানে ঘুমোচ্ছে। রাস্তার শেষে পুকুরটা এখনও তেমনি সুন্দর আছে — গোলাপী ও সাদা পদ্ম ফুটে আছে জলে, স্ত্রীলোকেরা জলের ধারে সমান পাথরের ওপর আছড়ে কাপড় কাচছে। রাস্তাটা মেয়েদের স্কুল ও ছেলেদের স্কুল ছাড়িয়ে যেতেই এবড়োখেবড়ো ও ধুলোয় ভর্তি হয়ে আছে। এরপর রাস্তাটা গ্রামের মোড়ে গিয়ে হাইওয়েতে মিশেছে। এখান থেকে হরি বাস ধরবে।

হরি দাঁড়িয়ে দেখছিল পাহাড়ের মন্দিরের ওপর একজোড়া ঘুড়ি নীল আকাশে উড়ছে, পাক খাচ্ছে, পাক খেয়ে নীচে নামছে। এইসময় খুব জোরে জোরে বেল বাজাতে বাজাতে একটা সাইকেল ছুটে এল। রামু সাইকেল থেকে নেমে ওর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'আরে হরি, হরি ফিরে এসেছে! কোথায় গেছিলি, হরি? কবে ফিরে এলি?'

রামু যখনই কোথাও যায় হৈ চৈ করে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। হরি হেসে বলল, 'আমি বোম্বাইয়ে ছিলাম, রামু।'

'এখনই ফিরে যাচ্ছিস নাকি?'

'না, আমি এখন আলিবাগে যাচ্ছি হাসপাতালে মাকে দেখতে।'

'আমিও আলিবাগে যাচ্ছি দেওয়ালির বাজি কিনতে, আয় বোস, আমি নিয়ে যাব তোকে।'

হরি পিছনে উঠে বসতেই রামু প্যাডেল করল। পুরনো মরচে ধরা সাইকেল থেকে নানা আওয়াজ বেরোচ্ছিল একটু লাফাতেই, কথা বলা তাই সম্ভব ছিল না। তবু সাইকেলের শব্দ ছাপিয়ে ওরা চিৎকার করে করে কথা বলছিল।

'কবে এসেছিস বললি তুই?'

'গতকাল, দেওয়ালি তো, তাই এলাম।'

'তারপর আবার চলে যাবি?'

'না, থাকব বোধ হয়। কিছু টাকা কামিয়েছি, সঙ্গে নিয়ে এসেছি এখন এখানে কিছু একটা কাজের চেষ্টা করব।' হরি কিছু খুলে বলল না।

'এখানে কাজ করবি? কী কাজ তুই করবি এখানে?'

'কিছু একটা করব'।

'নিজে নিজে তো কিছু করতে পারবি না। অপেক্ষা কর, কারখানা হলে কাজ পাবি।'

'আমি তো ভেবেছিলাম আলিবাগের জেলে ও চাষীরা ওসব এখানে হতে দেবে না।'

হ্যাঁ, এইজন্যেই তো তুই বোম্বাই গিয়েছিলি, যাতে গরমেন্ট কারখানা না খোলে, তাই না? গ্রামের কিছু লোক কী করে গরমেন্টকে বাধা দেবে? কীকরে তারা গরমেন্টের কাজে বাধা দেবে?'

রামু তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চিৎকার করে যাচ্ছিল। হরি কথা না বলে শুনছিল। 'এখানে সব বদলে যাবে — সবকিছু অন্যরকম হয়ে যাবে।'

'কিন্তু রামু—,' হরি ওকে বাধা দেয়, 'আমাদেরও তো বদলাতে হবে, আমাদেরকেও তো অন্যরকম হয়ে যেতে হবে।'

এই কথায় রামু চুপ করে গেল। হরি সাইকেলের সীটটা ধরে রেখে চারপাশে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল — রাস্তার দুপাশে মাঠ, বলদে লাঙল বইছে মাঠে, ধান লাগানোর জন্যে জমি তৈরি করা হচ্ছে। হরি কল্পনা করল এইসব দৃশ্য বদলে গেছে। এই জীবন আর নেই।

ওরা আলিবাগে পৌঁছল। জেলার বড় শহর এটা — সাদা রঙের বাংলোবাড়ি, চওড়া রাস্তাঘাট, বাজার ও দোকান ফ্যাকটরির তৈরি রুটি, বাজি, যা যা দরকার সবই পাওয়া যায়। হরি সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। তারপর রামুকে বিদায় জানিয়ে বোনেদের জন্যে চিনির তৈরি খেলনা খুঁজতে গেল। রামুও কথা না বলে হাত নেড়ে চলে গেল, তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সেও নিশ্চয় হরির মত বদলে যাওয়া অবস্থাটা কল্পনা করেছিল। ফুটপাতের ধারে ঠেলাগাড়ি থেকে ব্যাগভর্তি জিনিসপত্র কিনে হরি সোজা রাস্তা দিয়ে হেঁটে হাসপাতালের গেটে গিয়ে পৌঁছল।

ভেতরে গিয়ে হরি হাসপাতালের উর্দি পরা কাউকে খুঁজছিল যার কাছে সে তার মার কথা জিগ্যেস করতে পারে। তখনই একজন বৃদ্ধ লোক তার কাছে এসে কাঁপা হাতে তার কনুইটা ধরে বলল, 'তুই হরি, না?'

তার কোঁচকানো মুখ ও মাথার ধূসর চুলের দিকে পুরো একমিনিট তাকিয়ে থেকে হরি মুখ খুলল। 'বাবা'।

'তুই ওকে দেখতে এসেছিস?' বৃদ্ধ কম্পিত গলায় বলল, 'অবশেষে এলি তাহলে?'

'আমি বোম্বাইয়ে ছিলাম বাবা।'

'একবারও ওকে দেখতে এলি না রে!'

'আমি কালকেই ফিরেছি। লীলার কাছে শুনলাম মা এখানে আছে। এখন কি মাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব?'

'তুই ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে জিগ্যেস কর।' লম্বা বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বৃদ্ধ বলল। ঘরের দরজায় সবুজ পর্দা ঝুলছিল। হরি আস্তে আস্তে সেদিকে এগোল। পর্দা সরিয়ে ভিতরে দেখল। সেখানে একজন ডাক্তার টেবিলের সামনে বসে ব্যাস্তভাবে কিছু লিখছিলেন, আর কয়েকজন নার্স ঘরের

অন্যদিকে জলের বেসিনে কিছু পরিষ্কার করছিল। ওরা হরির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল 'তুমি কে? কী চাও?'

হরি বিড়বিড় করে তার মার নাম উচ্চারণ করল। সে ভাবছিল ওরা তার মাকে জানে কিনা। কিন্তু ওরা চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গেই। কেননা গত সাত মাস ধরে ওর মা হাসপাতালে আছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও দেখ — দুনম্বর ওয়ার্ডের বেড নম্বর পঁয়তাল্লিশ'। একজন দীর্ঘাঙ্গী চশমাপরা নার্স বিরক্ত না হয়ে চেঁচিয়ে বলল।

ডাক্তারবাবু এবার লেখা থামিয়ে হরির দিকে তাকালেন, 'তুমি কে? ওর গ্রাম থেকে এসেছ?'

'আমি ওর ছেলে, বোম্বাই থেকে এসেছি।' এতদিন পর কেন এসেছে এটা বোঝাতেই হরিকে একথা বলতে হল।

'ওহ্, বোম্বাই থেকে? কেউ তো বলেনি ওর ছেলে বোম্বাইয়ে থাকে?' ডাক্তার বললেন। 'আমি তো শুধু ওর মেয়েকে দেখছি, থাল থেকে আসে। দেওয়ালিতে মাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছ, তাই তো?'

ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে হরি বোঝার চেষ্টা করছিল উনি ছাড়বেন কিনা তার মাকে। তাই শুধু মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, নিয়ে যেতে পার। এখন শরীরের যা অবস্থা বাড়ি নিয়ে যেতে পার। কিন্তু প্রতিমাসে একবার চেক-আপের জন্যে এখানে নিয়ে আসতে হবে। আমরা ওকে গাঁয়ের হাতুড়েদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। এখন ভাল হয়ে গেছে তোমার মা, তবে আমাদের দেখতে হবে যাতে পরেও ভাল থাকে।'

'আমি নিয়ে আসব,' হরি আগ্রহের সঙ্গে কথা দেয়। 'আমি বোম্বাই ফিরে যাচ্ছি না। আমি এখন থেকে এখানে থাকব, আমাদের গাঁয়ে। মাকে প্রতি মাসেই এখানে নিয়ে আসব।'

'তাই কোর,' ডাক্তার বললেন, 'কেননা ওর দেখাশোনার দরকার হবে।' কথা বলে তিনি নার্সদের দিকে ফিরলেন। যখন সব কাগজ তৈরি হল ও সইসাবুদ করা হল, তখন হরিকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল।

মাকে হরি প্রায় চিনতেই পারছিল না। অনেকদিন ধরে তাকে শুধু বিছানাতে শুয়ে থাকতেই দেখেছে, কখনও আধঘুমে, কথা ছিল না মুখে। তাই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না বিছানার পাশে বসে তার দিকে চেয়ে হাসছে যে মহিলা সে তার মা হতে পারে। অনেক বছরের অসুস্থতা যেন উধাও হয়ে গেছে। সে আবার অসুস্থ হওয়ার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। তার মাথার চুলগুলো নিশ্চয় ধূসর হয়েছে, মুখে ভাঁজ পড়েছে কিন্তু শরীরে মাংস লেগেছে এবং চোখদুটো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

'হরি, হরি! তুই কি দেওয়ালিতে বাড়ি এসেছিস?'

'হ্যাঁ মা, দেওয়ালিতে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আমি কি যেতে পারব?' নার্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে ব্যগ্র হয়ে জিগ্যেস করে।

'নিশ্চয়! দেওয়ালিতে আমরা তোমাকে হাসপাতালে রেখে দেব না। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের কাছে যাওয়ার সময় এটা।' নার্স বলে। 'এস, জিনিসপত্র গুছিয়ে দিই — তোমার কাপড়, তোমার চিরুনি, তোমার ওষুধপত্র—'

তার কিছুক্ষণ পরই হরি ও তার বাবা গেটের কাছ থেকে একটা টাঙ্গা ভাড়া করে তাকে ওতে বসাল। তার পা দুটো তখনও দুর্বল, অনেকদিন হাঁটার অভ্যেস নেই, তাই রাস্তায় বেরোতেই কাঁপছিল। কিন্তু হরি ও তার বাবা দুজনে দুপাশে বসে ছিল টাঙ্গার প্রশস্ত পেছনের সীটে, তারা তাকে ধরে রেখেছিল শক্ত করে যাতে সে পড়ে না যায়। টাঙ্গা চালক ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগাতেই টাঙ্গা চলতে শুরু করে দেওয়ালিতে ওদের থালের বাড়িতে পৌঁছে দিতে।

ওরা যখন বাড়ি পৌঁছল, তিন বোনে মিলে সব কাজ করে রেখেছে। বারান্দার মেঝেতে লাল, হলুদ ও সাদা গুঁড়ো রং দিয়ে আলপনা আঁকা হয়েছে, কড়িকাঠ থেকে কাগজের কুপি ঝোলানো হয়েছে। ঘরে রান্নার জন্যে যেসব পিতলের বাসনকোসন ছিল সব ঝকমকে করে মাজা হয়েছে। আর লীলা উৎসবের মিষ্টি সাজিয়ে রেখেছে থালায় থালায়। নারকেল কুরে তার পুর দিয়ে পিঠে বানানো

হয়েছে, ছোলার ডালের হালুয়া, কুমড়োর মিষ্টি, বাদাম ও কিসমিস দেওয়া ক্ষীর — এসব তৈরি করা হয়েছে। এরপর লীলা গরম তেলে জিলাপি ভেজে নিয়ে পাশে রাখা চিনির রসের পাত্রে ডুবিয়ে রাখছিল। হরি এই সময়েই বাবা-মাকে সঙ্গে করে বাড়ি ঢোকে।

বেলা ও কমল মার জন্যে জুঁই, গোলাপ ও গাঁদা ফুলের মালা তৈরি করে রেখেছিল। এখন মার গলায় পরাতে গিয়ে তারা কেঁদে ফেলল, তারপর হাসতে লাগল। ওরা অবাক হয়ে দেখল, ওদের বাবাও এ দৃশ্য দেখে ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদতে শুরু করেছে, ওদের মা অবশ্য তখনও হাসছে খুশিতে। তারপর সে সোজা রান্নাঘরের কোণে গিয়ে যেখানে গণেশ ও লক্ষ্মীর মাটির মূর্তি রাখা ছিল সেখানে গিয়ে মালাটা পরিয়ে প্রার্থনা করল।

সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায়, নীচু দেয়ালে, রাস্তায়, গাছের চারপাশে ও বাগানের ঝোপের পাশে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ সার দিয়ে জ্বালাতে হরি বোনেদের সাহায্য করল। প্রত্যেকটা প্রদীপে খুব সাবধানে সামান্য করে তেল ঢেলে দিচ্ছিল লীলা। বেলা ও কমল কাপড়ের সলতের একদিকটা তেলে ডুবিয়ে রাখছিল। আর হরি একটা মোমবাতির আগুনে সব সলতেগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপগুলো আগুনের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে জ্বলতে থাকল।

হরি তারপর বাজিভর্তি ঝুড়িটা নিয়ে গিয়ে নারকেল বাগানের মধ্যে একটা ঢিবির ওপর রাখল। সে একটা রকেট বাজিতে আগুন দিতেই সেটা আকাশে গিয়ে শব্দ করে ফাটতেই রঙবেরঙের আগুনের ফুলকি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বেলা ও কমল তাই দেখে আনন্দে চিৎকার করছিল। ওরা ছুটল হরির হাতে ধরা মোমবাতি থেকে তারাবাতি জ্বালাবে বলে। জ্বলন্ত তারাবাতি হাতে নিয়ে তারা নারকেলগাছের ভিতরে ভিতরে ছুটে বেড়াচ্ছিল সেগুলোকে ওপরে তুলে ধরে, তাতে অন্ধকারের মধ্যে আগুনের আঁকিবুকি তৈরি হচ্ছিল। লীলা এবার একটা তুবড়ি বোমায় নীচু হয়ে আগুন দিতেই সেটি ফেটে তা থেকে আগুনের ফুলকি উঠে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল একটা নারকেলগাছের সমান উঁচু হয়ে। বেলা ও কমল তাদের বারান্দার মেঝেতে সমান জায়গায় চরকি জ্বালাল, চরকিগুলো জ্বলতে জ্বলতেই ঘুরতে থাকল পাক খেয়ে, গা থেকে আগুনের সাদা ফুলকি ছড়াচ্ছিল চারপাশে। হরি যখন সেগুলোর ওপর দিয়ে লাফাচ্ছিল, আবার লাথি মারছিল যাতে অন্যদিকে চলে না যায় তখন লীলা ও তার মা হরিকে সাবধান হতে বলছিল। হরি তখন ঢিবির কাছে চলে গিয়ে আরো রকেট বোমা ছাড়ল। সেগুলো সোজা জ্বলতে জ্বলতে উঠে গিয়ে জোরে শব্দ করে ফেটে গিয়ে আগুনের তারা ছড়িয়ে দিচ্ছিল আকাশে।

ঝুড়ির সব বাজি পোড়ানো হয়ে গেলে বেলা ও কমল বলল, 'যাহ্ সব শেষ হয়ে গেল!' হরি তখন বলল, 'এবার চল, বীচে গিয়ে আগুন জ্বালাই।' বোনেরা মজা পেয়ে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। তারা অন্ধকারের মধ্যে বেলাভূমির দিকে

দৌড় লাগাল। হরি নারকেলগাছের শুকনো ডালে আগুন লাগিয়ে ওদের সঙ্গে চলল। লীলা বারান্দায় মা-বাবার সঙ্গে বসে থাকতে থাকতে বলল, 'আমরা এখান থেকেই দেখব — ওখানে বাতাসের মধ্যে মার যাওয়া ঠিক হবে না।'

হরি, বেলা ও কমল বালির ওপর নীচু হয়ে বসে নারকেলগাছের শুকনো ডালপাতা যত্ন করে সাজালো অনেক উঁচু করে। তারপর হরি তাতে আগুন জ্বালাল। ফট ফট শব্দ করে আগুন জ্বলে উঠলে ওরা পিছিয়ে এসে দাঁড়ায় — কিছুক্ষণের মধ্যে ডালপাতার গাদা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুনরায় রাতের অন্ধকার ওদের ঘিরে ধরে — আকাশ, বালি, সমুদ্র সব কালো মখমলের মত মনে হয়। অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে ওরা ঢেউয়ের সাদা ফেনার রেখাটিকে লক্ষ্য করতে পারল, ফেনাগুলো ফিসফিস করে যেন কথা বলছে তাদের সঙ্গে। ঢেউ ও বালির ওপর আগুনের অনুপ্রভা থেকে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়েছিল। অসংখ্য তারার আলোয় আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ছিল। তারারা নিঃশব্দে ওদের মাথার ওপরে জ্বলছিল।

শেষ পাতাটি পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হরি বলল, 'চল, ফিরে গিয়ে মার কাছে বসি।'

'মা নিশ্চয় দেওয়ালিতে গল্প শোনাবে,' বেলা বলল। তার মনে পড়ল, খুব ছোট থেকে তারা দেওয়ালিতে গল্প বলার প্রথা দেখে আসছে।

ওরা বাড়ি ফিরে বারান্দায় মার কাছে বসল। রঙীন কাগজে মোড়া লণ্ঠনের আলো জ্বলছে সেখানে। মার কাছে ওরা রামায়ণের গল্প শুনল। লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণ কী করে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, অযোধ্যার রাজপুত্র রাম কী করে সীতাকে রক্ষা করতে গেল, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিল, ফিরে এসে দেখেছিল গোটা অযোধ্যা শহর আলোয় সেজে অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।

'আর এই জন্যে দেওয়ালিতে আমরাও আমাদের বাড়িকে আলো দিয়ে সাজাই,' লীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। তার মনে পড়ে যায় এই কথাটা বলে তার মা প্রতিবার গল্প শেষ করে থাকে।

'হ্যাঁ', মা বলে, 'এই আলো টাকাপয়সার দেবী লক্ষ্মীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে বাড়িতে, তিনি আসবেন এখানে, অন্ধকারে ভুল করবেন না।'

কমল গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, 'জান মা, হরিদা আমাদের জন্যে অনেক টাকা এনেছে। সে হরির একটা হাত ধরে রেখেছিল। তার কথায় হরি গর্ব বোধ করল মনে মনে। 'তোদের সবাইকে যখন আমার পাশে দেখি, তখনই আমার নিজেকে ধনী মনে হয়', তাদের মা ধীর কণ্ঠে বলে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না আর। সমুদ্রের দিক থেকে ঢেউয়ের শব্দ ও নারকেলগাছের পাতায় বাতাসের শব্দ কানে আসছিল। প্রদীপের শিখা কাঁপছিল হাওয়ায়, আর আকাশে তারারা জ্বলজ্বল করছিল। একসময় তাদের বাবা কাশল, তারপর গলাটা পরিষ্কার করে প্রথম কথা বলল, 'শুধু আমাদের পিন্টো নেই।' শুনে

সবাই অবাক হয়ে নড়েচড়ে বসল। 'বেচারা পিন্টো।' সে বিড়বিড় করল, তারপর আবার চুপ করে গেল। কোন কথা না বললেও সবাই বুঝতে পারছিল সে আসলে নিজের অনুতাপের কথাই বোঝাতে চাইছিল। একদিক থেকে তো সে-ই পিন্টোর মৃত্যুর জন্যে দায়ী ছিল। এই প্রথম সে তার সমস্ত আচরণের জন্যে যেন দুঃখপ্রকাশ করছিল। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে নিঃশব্দে বসে থাকার পর লীলা উঠে দাঁড়াল। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে সে বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত করেই যেন বলল, 'চা করে দেব, না গরম দুধ খাবে?'

ওর বাবা মাথা নেড়ে না বলল। মাথা নাড়ল অন্যরাও, এই মুহূর্তে ওদের অন্য কিছুর দরকার নেই।

দেওয়ালির পরদিনই ছিল ওদের শুভ নববর্ষ। গ্রামের সব বাড়িতেই আমপাতা গেঁথে ঝোলানো হয়েছে। গাঁদা ফুলের মালাও লাগানো হয়েছে। দোকানে হালখাতার জন্যে নতুন খাতা কেনা হয়েছে। লক্ষ্মী পুজো হবে যাতে নতুন বছরটা তাদের ভাল যায়।

সকালবেলায় লীলা ও তার বোনেরা ব্যস্ত হয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করে টাটকা ফুলের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দিল ও নতুন আলপনা আঁকল। ওইদিন বেলার দিকে সমুদ্রের ধারে গরুর গাড়ির বার্ষিক দৌড় প্রতিযোগিতা হবার কথা। এই কারণে গ্রামের লোকের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা — তারা বলদের বাঁকানো শিঙে গোলাপী রং

মাখাচ্ছিল। আর টাঙ্গার গাড়োয়ানরা তাদের গাড়িগুলোকে জরির কাপড় ও কাগজের পতাকা দিয়ে সাজাচ্ছিল, ঘোড়াগুলোর গা মেজে ঘষে পরিষ্কার করে চকচকে করে দিচ্ছিল।

হরির শুধু কিছু করার ছিল না। সে সবার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বলল, 'আমার তো এখন কোন কাজ নেই, আমি বরং বাংলো বাড়িতে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'ঠিক আছে, তবে তাড়াতাড়ি ফিরিস,' মা বলল। সে বারান্দার মেঝেয় বসে বড় একটা আলপনা আঁকতে লীলাকে সাহায্য করছিল।

'তুমি যে বলেছিলে আমাদের তুমি বীচে দৌড় দেখাতে নিয়ে যাবে, হরিদা? ছোট বোনেরা খাল পেরিয়ে ওকে চলে যেতে দেখে চিৎকার করে বলল।

'জানি, জানি,' হরি পিছন ফিরে উত্তর দিল। 'আমি ঠিক সময়েই চলে আসব'।

'মন রিপোজ'-এ গিয়ে হরি দেখল, লীলা আগে এসে ঘরটর সব পরিষ্কার করে রেখে গেছে, লাল ও সাদা রঙের আলপনা এঁকে রেখেছে বারান্দার টালিতে, ছোট বোনদুটোও আমের পাতা গেঁথে দরজায় লাগিয়েছে। এখন কাউকে দেখা গেল না, বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে আছে। হরি এদিক ওদিক ঘুরে অবশেষে সাহেবকে জলার ধারে বসে থাকতে দেখল। সাহেব স্থির হয়ে বসেছিলেন ঠিক যেমন পাথরের ওপর বকটা চুপ করে বসে থাকে। তিনি বাইনাকুলার দিয়ে ওপারের নারকেল গাছের দিকে চেয়েছিলেন।

হরির পায়ের শব্দ শুনে মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে দেখলেন, কিন্তু কথা বললেন না। হরি একটু ইতস্তত করল, ব্যক্তিটিকে কোথায় দেখেছে সে তা নিয়ে ভাবতে লাগল। বোম্বাই শহরের স্মৃতি থেকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করল কোন ইঙ্গিত পায় কিনা, কেননা ভদ্রলোক বোম্বাই থেকে এসেছেন একথা সে বোনেদের কাছে শুনেছে। কিন্তু কোন কিছু সে মনে করতে পারলনা।

'আমি বোধহয় আপনাকে বিরক্ত করছি, আমি বরং পরে আসব।' দ্বিধাজড়িত গলায় সে বলল।

উত্তরে ভদ্রলোক পাশের মাটিতে হাত ঠুকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও? বসে পড় এখানে, তাহলে পাখিরা বিরক্ত হবে না।'

হরি বোনেদের কাছে জেনেছিল, সাহেব পাখি নিয়ে চর্চা করেন। কিন্তু তার কোন ধারণা ছিল না, এটা কীভাবে করা হয়। এখন সে নিশ্চয় জানতে পারবে — মিঃ পানওয়ালা তাকে বলেছিলেন, যখনই সুযোগ পাবে শিখে নেবে, কখনও থামবে না। এটা মনে পড়তেই তার মাথায় এল, মিঃ পানওয়ালার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের কেমন মিল আছে। এঁর অবশ্য টুপির নীচে সাদা চুল আছে, দাড়িও আছে। তবু দুজনেই কেমন যেন পাখির মত। এই ভাবনা থেকে হরির সাহসের সঞ্চার হল, যথাযথ সম্মান দেখিয়ে সে জিগ্যেস করল, 'আপনি কি পাখি নিয়ে চর্চা করছেন, স্যার?'

'আমি বাবুই পাখির বাসা বানানোর অভ্যাসগুলো স্টাডি করছি', বলে ভদ্রলোক পাখির বাসার দিকে হাত দেখালেন — বাসাগুলো নারকেলগাছ থেকে ঝুলছিল ও আস্তে আস্তে দুলছিল। 'আমি সারা বর্ষাকালটা ধরে এদের দেখছি, এখন দেখ, ওরা বাচ্চাগুলোকে বড় করছে।' উত্তেজনা লক্ষ্য করল হরি ওঁর কণ্ঠে। উনি এবার হরির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাবুই বাসার দিকে চোখ রাখলেন।

হরিও সেদিকে না তাকিয়ে পারল না, যদিও সে কখনও পাখিদের মনোযোগ দিয়ে দেখেনি। পাখিগুলো মাছরাঙাদের মত দেখতে, যদিও সুন্দর নয়, কিন্তু ছোট, বাদামী রঙের ও গায়ে দাগ আছে, চড়ুইয়ের মত দেখতে। কোন কোনটির মাথা অবশ্য হলদে। হরি বাধ্য হয়েই দেখছে। তার মনে হল, ছোট ছোট প্রাণীগুলো যে এই অদ্ভুত ধরনের বাসা বানিয়েছে জলের ওপরে যা কেউ ছুঁতে পারবে না বা তাদের বাচ্চাদের ক্ষতি করতে পারবে না, তা সত্যিই খুব চমৎকার। বাসাগুলো বানানো হয়েছে খড়কুটো দিয়ে, খুবই চমৎকার ক'রে — সেগুলো থেকে পাখিরা বেরিয়ে আসছিল, আবার ঢুকে যাচ্ছিল টিলিলিলি, টিলী-কিটি-টিলী-কিটী — শব্দ করতে করতে।

ভদ্রলোক হরিকে বোঝালেন, 'এই বাসা তৈরি করা এত কঠিন যে একটা পুরুষ পাখিকে পরিবার গঠনের আগেই এই বাসা তৈরির অভ্যাস করতে হয়। যদি কোন ভুল হয় এবং বাসাটা ঠিকমত তৈরি না হয়, তবে সেটা ছেড়ে অন্য আর একটা বানানোর চেষ্টা করে। বাসা যখন নিখুঁতভাবে তৈরি হয় তখনই সে সন্তুষ্ট হয়। বাসা সে অনেকগুলো তৈরি করে থাকে যাতে সে অনেকগুলো স্ত্রী পাখিকে সেখানে রাখতে পারে। স্ত্রী পাখিরা পুরুষ পাখিদের সঙ্গে তখনই মিলিত হবে যখন দেখবে যে ভাল বাসা বানানো হয়েছে। কী চালাক এরা, দেখেছ?'

হঠাৎ হরি একটা চমক খেল। সে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল। সে নিশ্চিত যে এই কণ্ঠস্বর সে আগে শুনেছে। সে মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে বিস্ময়ে চাইল, তারপর বুঝতে পারল ইনি কে। ইনি বোম্বাইয়ে কালো ঘোড়ার জমায়েতে বক্তৃতা করেছিলেন। ওদেরকে বলেছিলেন, বোম্বাইয়ের একজন লোক হয়েও আলিবাগের উপকূল অঞ্চল সম্পর্কে কেন তিনি চিন্তিত ছিলেন, তাঁর ভয় হয়েছিল যে পরিবর্তনের ফলে এলাকাটা নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি এখন এইখানে, থাল গ্রামে।

'স্যার', হরি হঠাৎ বলে ফেলল, 'স্যার', আমি বোম্বাইয়ে কালো ঘোড়ার সামনে আপনার বক্তৃতা শুনেছি। আমি তখন গ্রাম থেকে অন্য সবার সঙ্গে গেছিলাম।'

ভদ্রলোক তাঁর বাইনোকুলার নামিয়ে ওর দিকে তাকালেন। তাঁর মাথা একদিকে সামান্য কাত করা। 'ওহ্, তুমি ওদের মধ্যে ছিলে?' তিনি জিগ্যেস করলেন। হরির মনে হল তাঁকে সে পাখিদের মতই আগ্রহী করে তুলেছে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, এস বারান্দায় গিয়ে বসি, কথা বলা যাবে। এখানটা বেশ স্যাঁতসেঁতে — বেশিক্ষণ বসা যায় না।'

বারান্দায় বসে থাকলেও তিনি বাইনাকুলারটা ছাড়তে পারছিলেন না, মাঝে মাঝেই তিনি তাতে চোখ লাগিয়ে দেখছিলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করে উঠছিলেন। হরির মনে হল, থালে এত পাখি চারদিকে অথচ সে কোনদিন তাদের দেখেনি ভাল করে, ফলে কত কিছু সে জানতে পারেনি। ঠিক করল, এবার থেকে সে চোখ দিয়ে সবকিছু ভাল করে দেখবে। ভদ্রলোক তখন চোখ থেকে বাইনাকুলার নামিয়ে বললেন, 'তুমি তাহলে আলিবাগের চাষী, বোম্বাই গিয়েছিলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করতে, তাই না?'

'আজ্ঞে না, স্যার', আমার বাড়ি থালেই। আমি ওই ওখানে থাকি', হরি তাঁকে বলে। 'আমার বোনেরা আপনার রান্না করে ও বাসন ধোয়।'

'ওহ আচ্ছা, তাই বল।' ভদ্রলোক এবার বেশ জোরে কথা বললেন। ঠিক তখনই কাঁটাচামচের মত লেজযুক্ত একজোড়া পাখি উড়ে এসে বাতাসে ডিগবাজি খেল, তাদের সাদা ও কালো ডানা রোদে চকচক করে উঠল। ভদ্রলোক সেদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, তার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে।

'আমি মিছিলের সঙ্গে বোম্বাই গেছিলাম', হরি পুনরায় মনে করিয়ে দেয়। 'এখানে যাতে কারখানা না করতে পারে, তার চেষ্টা করেছিলাম।'

'আচ্ছা', বাইনাকুলারটা রেখে বেতের চেয়ারে তিনি গা ডুবিয়ে দিলেন। 'তো, যারা আন্দোলন করেছিল, তুমি তাদের একজন। তোমরা হেরে গেছ, জান। কোর্টে আমরা হেরে গেছি। পলিটিসিয়ানরাই জিতল, ওরা এখন জমি বিক্রি ও লাইসেন্স দেওয়ার নামে প্রচুর টাকা রোজগার করবে। থালের আর কিছু থাকবে না।' নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'সব নষ্ট হয়ে যাবে। সমুদ্রে বর্জ্য পদার্থ পড়ে সব মাছ মরে যাবে। ধানের জমির ওপর কারখানা, বাড়িঘর ও রাস্তা তৈরি হবে। আমার এই ছোট্ট বাবুই পাখিরা বাসা বানানোর জন্যে আর খড় পাবে না, বাচ্চাদের খাওয়ার জন্যে শস্যদানাও পাবে না। এদের উড়ে চলে যেতে হবে এখান থেকে। আর এক বছর ওদের দেখব কিনা সন্দেহ।'

তাঁকে এত ভগ্ন-হৃদয় মনে হল হরির যে সে জিগ্যেস করল, 'আপনি পাখিদের জন্যে এত চিন্তা করেন কেন, স্যার?'

'পাখিরাই পৃথিবীতে শেষ স্বাধীন প্রাণী। আর সবকিছু বন্দী হয়েছে, পোষ মেনেছে — বাঘ চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী হয়েছে, প্রাণী উদ্যানে গিয়ে সিংহকে চেয়ে দেখে সবাই, মানুষেরা দেশলাই বাক্সের মত ঘরে থাকে, জেলখানার মত কাজ করে কারখানায়। পাখিই একমাত্র স্বাধীন — যখন খুশি শূন্যে উড়ে যেতে পারে।' বলতে বলতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাঁর গলা যেন কেঁপে উঠল। 'আমার মনে হয় এই জন্যেই আমি পাখিদের ভালবাসি — ওদের স্বাধীনতার জন্যে। এই স্বাধীনতা আমাদের নেই। ওদের মত আমিও যদি এই সমস্ত কদর্যতা থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম। তোমার ইচ্ছা করেনা?' তিনি এবার হরিকে জিগ্যেস করলেন।

'কিন্তু আমরা তো ওদের মত উড়তে পারব না?' হরি ওঁকে মনে করিয়ে দিল। 'আমরা এই পৃথিবীতে থাকি, এটাকে তো ছেড়ে যেতে পারি না। আমাদের এখানে বাস করতেই হবে, যেভাবেই হোক।' হরি খুব আন্তরিক ভাবে কথাগুলো বলল।

ভদ্রলোক খুব করুণ চোখে হরির দিকে তাকালেন। 'ঠিক বলেছ, তুমি কি করবে? তোমাদের কি হবে? জানি না, আমি জানি না বন্ধু। কিচ্ছু জানি না। আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কি করবে তুমি?'

হরি ওঁর দিকে আরও একটু ঘেঁষে এল।

'আমি ভেবেছিলাম — আমি ভেবেছিলাম — আসলে এখন তো মাছধরা বা চাষবাস করার সময় আর নয়, এখানে সেসব কাজ আর করাও যাবে না। তাছাড়া আমি কারখানাতেও কাজ করতে চাই না। তাই ভেবেছিলাম আমি কিছু মুরগী কিনে আমার জমিতে খামার বানাব, গ্রামে ডিম বিক্রি করব। কারখানা তৈরি হলে যেসব লোকজন থালে আসবে, তাদের কাছে মুরগি বিক্রি করব। কিছু দিন চলে যাবে এমনি করে। পরে আমি একটা ঘড়ি মেরামতির দোকান খুলতে চাই, আমি কিছু কাজও শিখে এসেছি।'

'শিখেছ নাকি?' ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন। 'তুমি কি আমার এই ঘড়িটা সারাতে পারবে? আমি খালে পড়ে গিয়েছিলাম জানো, তখন থেকে এটা কাজ করছে না। তোমার কি মনে হয় এটা চলবে?' তিনি ঘড়িটাকে তাঁর জামার পকেট থেকে বের করে হরির হাতে দিলেন। হরিও খুব আগ্রহের সঙ্গে ওটা নিল। হরির বিশ্বাস হচ্ছিল না এই বিখ্যাত মানুষটি যিনি বোম্বাইয়ে বক্তৃতা করেছিলেন এবং এখন থালে এসেছেন পাখি চর্চা করতে, তিনি ওকে তার ঘড়ি সারাতে দেবেন।

ঘড়িটা নিয়ে সে মৃদু ভাবে ঝাঁকাল, তারপর তার কানের কাছে নিয়ে ধরল। 'স্যার, এর যন্ত্রের মধ্যে জল ঢুকেছে। এটাকে সহজেই শুকনো করে পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। বোম্বাইয়ে বর্ষার সময় এমন অনেক করেছি।'

হরি যখন কথা বলছিল, ভদ্রলোক তখন তার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যেন একটা পাখিকে তিনি দেখছেন মজার কোন কাজ করতে। তারপর তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন, 'মানিয়ে নাও, মানিয়ে নাও।'

'কী করব, স্যার?' হরি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করল।

'মানিয়ে নাও নিজেকে, যা তুমি করতে যাচ্ছ। পাখি ও প্রাণীরা যেমন বাঁচার জন্যে করছে। চড়ুই ও পায়রা যেমন শহরে বাস করার উপযোগী করে তুলেছে নিজেদের, মাঠে খাদ্যশস্য খুঁটে খাবার বদলে এখন মানুষের ফেলে দেওয়া খাবার ও আবর্জনা খুঁটে খেতে শিখেছে।

'আমি এটা কী করে করব, তা তো জানিনা, হরি অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে বলল।

'কিন্তু বাপু, তুমি তো এইমাত্র আমাকে বললে তুমি তা করতে যাচ্ছ। তুমি

তোমার এতদিনের কাজকর্মের পথ ছেড়ে থালের নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে নতুন কাজ করতে যাচ্ছ। তুমি নিশ্চয় টিকে থাকতে পারবে।'

হরি ভদ্রলোকের অর্ধেক কথারই অর্থ বুঝতে পারল না। কিন্তু তাঁর কথায় মনে পড়ল মিঃ পানওয়ালা যে কথাগুলো ওকে বলেছিলেন। 'চাকা ঘুরে যায়,' খুব আস্তে আস্তে এবার সে বলল, 'চাকা ঘোরে, বারবার ঘুরতে থাকে।' বলে সে সৈয়দ আলিকে বোঝাতে চায় তাঁর কথার অর্থ সে জানে। সে বুঝেছে কীভাবে পাখি ও মানুষ একত্রে এই ঘূর্ণায়মান চাকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আমরা যদি বুঝতে পারি তবে দেখব কীভাবে পাখিরা আমাদেরকে কত দরকারি জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছে। 'স্যার, আমি বুঝেছি,' সে চিৎকার করে বলে, কিন্তু তখনই ভদ্রলোক লাফিয়ে দ্রুত বারান্দার ধারে গেলেন এবং তাকে আর দেখা গেল না। হরি গিয়ে দেখল, তিনি বারান্দা থেকে নীচে পড়ে গেছেন জবাগাছের ঝোপের মধ্যে। হরি লাফিয়ে পড়ে তাঁকে তুলে উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করল, 'স্যার, আপনার লাগেনি তো? আপনি ঠিক আছেন?'

'না, কিছু হয়নি', অপ্রস্তুত হয়ে বললেন তিনি। হরি জামাকাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলতে তাকে সাহায্য করল, বাইনাকুলারটাও তুলে দিল। 'ভালই হয়েছে যে আমি তোমাকে আমার ঘড়িটা দিয়েছিলাম, না হলে ওটা ঠিক ভেঙে যেত, তিনি হেসে বললেন।

'এটা আমার কাছে যত্নে থাকবে', বলে হরি তার পকেটে হাত রাখল। 'আমি এটাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঠিক করব, সন্ধ্যানাগাদ আপনাকে ফেরৎ দিয়ে যাব। তাতে অসুবিধে হবে না তো স্যার?'

তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আনন্দে চিৎকার করে তিনি জলার দিকে এগিয়ে গেলেন — একটা বাবুই পাখিকে ঠোঁটে করে কিছু নিয়ে আসতে দেখছেন তিনি। হরির কথা এখন তার আর মনে নেই।

হরি অবশ্য কিছু মনে করল না। পক্ষীবিদ ভদ্রলোক তাকে মানসিক শক্তি জুগিয়েছেন, যা ওর খুবই দরকার ছিল এবং সেটা ও পেতে চেয়েছিল। এখন ও এগিয়ে যাবে।

অবশ্য প্রথমেই এখন সে তার বোনেদের সঙ্গে নিয়ে বীচে দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে যাবে।

সাদা বলদগুলোর শিঙকে গোলাপী ও গাঢ় লালে রঞ্জিত করা হয়েছিল। গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাদের বালির ওপর নিয়ে আসা হয়েছে। নতুন উজ্জ্বল পাগড়ি মাথায় দিয়ে গাড়োয়ানেরা বলদগুলোকে ছোটাবার জন্যে চাবুক ঘোরাচ্ছিল আর মুখ দিয়ে খুব জোরে জোরে শব্দ করছিল।

'বিজুর গাড়ি — বিজুর বলদ — বিজু জিতেছে' বীচের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনি উঠল। ডিঙি নৌকোগুলোর ওপর যারা বসে ছিল তাদের কানেও পৌঁছল।

বিজু ঝকঝকে নতুন সাদা ধুতি পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল, এত খুশি সে আগে হয়নি। তার স্ত্রী ও মেয়েও দেওয়ালির নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। লোকেরা চিৎকার করে বিজুকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। ওরা এতদিনে হয়ত বিজুর সব অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কথা ভুলতে পেরেছে। বিজু তো ডুবন্ত জেলেদের উদ্ধার করে আনতে সাহায্য করেছিল। সেদিনের সেই ভীষণ ঝড় সমস্ত গ্রামবাসীদের যেন একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে। তারা বুঝেছে, তারা একে অপরের প্রতি কতটা নির্ভরশীল, একজনের আর একজনকে কতটা পাশে দরকার। আজ যেন একে অপরের কাছে আসার ব্যাপারটাকেই তারা উদযাপন করছে।

গরুর গাড়ির পর টাঙ্গার পালা এল। টাঙ্গাগুলো হালকা, চলেও জোরে। চাকা জোরে ঘুরতে থাকে বালির ওপর, ঘোড়াগুলোও গলাকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে উড়ে যায়। তাদের কেশর ফুলে ফুলে ওঠে, আর গায়ের সাজে লাগানো চুমকিগুলো জ্বলজ্বল করে।

'দেখ, দেখ', বেলা ও কমল উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে।

'চেঁচাস না', হরি বলে। 'এই নে, মিষ্টি খা' বলে সে আলিবাগ থেকে আনা চিনির তৈরি মিষ্টি-খেলনার ঠোঙাটা ওদের দিকে এগিয়ে দেয়। ওরা কাড়াকাড়ি করে খায়, খুশি মনে পাশে বন্ধুদের দিকেও এগিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে ওদের জীবনটা খুবই আনন্দের হয়ে উঠেছিল।

দৌড় শেষ হতেই লোকজনের ভিড় কমে গেল। হরি তখনও দাঁড়িয়েছিল। সে রাস্তা ধরে একদল স্ত্রীলোককে আসতে দেখল। তাদের হাতের তালুর ওপর চ্যাপটা ঝুড়ি রাখা ছিল। ওরা বীচে হেঁটে এসে পাথরের ঢিবি তিনটের দিকে এগোল। হরি ওদের দেখল, ময়ূরের মত নীল ও সবুজ রঙের জলের মধ্যে তাদের গোড়ালি ডুবে আছে। ওরা পাথরের ওপর ফুল ও আবীর ছড়িয়ে সমুদ্রের উদ্দেশে প্রার্থনা করছে। হরি ওদের মধ্যে তার মাকেও দেখতে পেল।

'দেখ লীলা', সে বলল, 'তাকিয়ে দেখ!' □□

Printed at M/S Bharat Mudranalaya, Delhi